গোলাপ কেন কালো

বুদ্ধদেব বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রী ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রী প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা ৯

রচনাকাল : ১৯৬৭
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৭৪
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৩৭৫
অগস্ট ১৯৬৮
তৃতীয় মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৭৭
সেপ্টেম্বর ১৯৭০

'গোলাপ কেন কালো' ১৯৬৭ সালে 'অমৃত' সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। বইয়ে কিছু পরিবর্তন ও কয়েকটি নতুন অংশ যোগ করেছি।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮ — বু. ব.

গোলাপ কেন কালো

১

আসুন। আমার বাগান দেখলেন? সব গোলাপ ফোটেনি এখনো, সবে তো মে মাস পড়লো। আমি সাত রঙের গোলাপ করেছি: দু-রকম হলদে, দু-রকম গোলাপি, দু-রকম লাল। আর শাদা, অবশ্য। আমার হাতের মুঠোর মত বড়ো হয় এক-একটা। ফুলের মধ্যে গোলাপ আমার প্রিয়। কেন জানেন? ওটা বিদেশী, তবু এ-দেশের হ'য়ে গেছে। মোগলরা নিয়ে এলো ভারতে, ইরান থেকে দুনিয়ায় ছড়ালো। গোলাপ: কথাটাই অর্ধেক ফার্শি, অর্ধেক সংস্কৃত। যাকে বলে আন্তর্জাতিক মিলন, তারই একটা নিশেন যেন। আমি আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী।

না, না, আমার কোনো অসুবিধে নেই, কোনো কাজ নেই—আপনি বসুন, যতক্ষণ ইচ্ছে। আমার এই বাড়ি, বাগান অনেকেই দেখতে আসেন—উট-কামণ্ডের একটা দ্রষ্টব্য হ'য়ে গেছে এটা। ও-পাশের জাপানি বাগানটা দেখেছেন কি? আঁকাবাঁকা ঝিল, চেরি গাছে কুঁড়ি ধরেছে, দু-এক পশলা বৃষ্টি হ'লেই শালুক ফুটবে। অনেকে সূর্যাস্তের সময় বেড়াতে আসে সেখানে। আমি কাউকে বাধা দিই না, আমার এই দুটোমাত্র চোখ দিয়ে কত আর দেখবো; সুন্দর মানেই বহুভোগ্য—তা-ই নয়? আর আমার এখনো এটুকু দুর্বলতা আছে যে অন্যের মুখে প্রশংসা শুনলে ভালো লাগে। কিন্তু যে যা-ই বলুক, এতে অসাধারণত্ব কিছুই নেই, এ-রকম হাজার হাজার বাগান আছে পৃথিবীতে। আমি তো সাতের পরে অষ্টম রং যোগ করতে পারিনি। জানেন, একবার আমার খেয়াল চেপেছিলো অন্য রঙের গোলাপ করবো। নীল, বা বেগনি, বা কালো—কালোই বা কেন হবে না? জাপান থেকে, হল্যাণ্ড থেকে বিস্তর বই আনিয়েছিলুম। উত্তেজনায় ঘুমোতে পারি না রাত্রে। কাঁপছি, যেন একটা চোরাকুঠুরির চাবি আমার হাতে এসে যাচ্ছে। পৃথিবীতে কালো ফুল নেই কেন? ফুল, ফল, শস্য—যা-কিছু মাটি ফুঁড়ে বেরোয়, তাদের রং কেন রামধনুর সাতটির মধ্যেই বাঁধা প'ড়ে আছে? শাদা, যাতে সব রং

মিলে-মিশে আছে, ফুলেদের মধ্যে তাও পাওয়া যায়, কিন্তু কালো—যাতে সব রং লুপ্ত, তা কেন নেই? সত্যি কি নেই, না কি আমরা এখনো খুঁজে পাইনি? সে কি হবে না ভগবানের চেয়েও বড়ো, যার হাতে প্রথম ফুটবে কালো গোলাপ? সে যদি আমিই হই?…আপনি ভয় পাবেন না, আমি পাগল হ'য়ে যাইনি, যখন আমি নীল গোলাপের স্বপ্ন দেখছি তখনই আমি জানি ওটা হবার নয়। একরকমের খেলা আরকি নিজের সঙ্গে, সময় কাটানো—সামথিং ইন্টরেস্টিং টু ডু, ছাট'স অল।

মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে ইংরেজি বলছি। হ্যাঁ, আমি বাঙালি বইকি। ঢাকার বাঙাল। কিন্তু বহুকাল বাইরে-বাইরে আছি, বহুকাল বাংলা বলি না, বাংলা বই পড়ি না। মাঝে-মাঝে যদি ইংরেজি ব'লে ফেলি, ধ'রে নেবেন সেটা সুবিধের জন্য, অভ্যেসের দোষে। আসলে আমি কথাবার্তাই খুব কম বলি আজকাল। বলবার দরকারও হয় না—সপ্তাহে একবার আমার গোমস্তার সঙ্গে ছাড়া। একা থাকি, কোথাও যাই না; আমি বিপত্নীক, দুই ছেলেই বিলেতে।

আজ্ঞে? আমার বাড়ির নাম? 'বন্-অ্যর'—ফরাশি কথা ওটা, অর্থ হ'লো সুখ, আনন্দ। নামটা রেখেছিলো নেলি—মানে নলিনী, আমার স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত কোথায় আমাদের আস্তানা হবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতো আমাদের। প্রথমে ঠিক ছিলো মালাবার হিল্-এই থাকবো, নেলির বাবার কাছাকাছি, বাড়িটা তিনিই দিয়েছিলেন মেয়েকে। হঠাৎ একসময় রিভিয়েরার দিকে ঝুঁকেছিলাম। কিন্তু উটকামণ্ডে একবার বেড়াতে এসে নেলির খুব ভালো লেগে গেলো জায়গাটা। বাগানের নকশা, বাড়ির প্ল্যান—সে-ই করেছিলো সব। বাড়ি তৈরি হ'লো, নাম রাখা হ'লো 'আনন্দ'। কিন্তু দু-বছরের মধ্যে এক রহস্যময় অসুখে তিলে-তিলে শুকিয়ে সে ম'রে গেলো। আমার জন্য রেখে গেলো স্মৃতি, আর অফুরন্ত টাকা, তার স্ত্রীধন। গুজরাটি বাবা, মা কাশ্মীরি—লোকেরা যাকে রূপসী বলে, তা-ই। তার ভালোবেসেরও তুলনা ছিলো না। অনেক ভাগ্যে ও-রকম স্ত্রী পেয়েছিলুম। একটু চা ইচ্ছে করেন? নীলগিরি, না দার্জিলিং?

বলুন, কলকাতার খবর বলুন, বাংলাদেশের। অনেক দুঃখকষ্ট, অশান্তি—তা-ই না? মাঝে-মাঝে দেখি কাগজে। তা সারা ভারতে কোথায় শান্তি

আছে বলুন। কে কী চায় জানে না—যে-কোনো একটা ছুতো ক'রে হুলুস্থুল বাধাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে কোঁদল, কথায়-কথায় উপোশ, ট্রেন পোড়ানো, খুনোখুনি। তার ওপর ইংরেজি হঠাও, ফিরিয়ে আনো মধ্যযুগ, গ'ড়ে তোলো অচলায়তন হিন্দিস্থান। কী মনে হয় আপনার? ভারতবর্ষ কি টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাবে আবার? তারপর আবার কেউ বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসবে? আর সেই ইংরেজ, যাদের আমরা ঘটাপটা ক'রে দেশ থেকে তাড়ালুম, তারা সমুদ্রের ওপারে ব'সে কেমন হাসছে বলুন তো? তাদের বিরুদ্ধে যে-সব অস্ত্র আমরা চালিয়েছিলুম, সেগুলো দিয়েই পরস্পরকে আমরা জখম করছি এখন—পরস্পরকে, মানে নিজেদেরই। তামাশা—তা-ই না?

জানেন, আমিও একবার ভেবেছিলুম ইংরেজকে তাড়াতে পারলেই ভারতবর্ষ ভূস্বর্গ হবে। আমি তখন ঢাকায় এম. এ. পড়ছি। আপনিও ঢাকায়...? আ-চ্ছা। কবে? ও, আমিও তো তখনই। বক্সিবাজার চেনেন? অনাথ আশ্রম? সে কী! আপনিও? বক্সিবাজারে ছিলেন, অনাথ আশ্রমের কাছে? আমিও তা-ই। বক্সিবাজারে, অনাথ আশ্রমের কাছে। খুব সাধারণ, মধ্যবিত্ত, বাঙালি হিন্দু পরিবার—সেখানেই জন্মেছি, বড়ো হয়েছি, কিন্তু সেখানকার অনেক-কিছুই আমার বিশ্রী লাগে। বড্ড ছোটো মনে হয় চারদিকটাকে—বড্ড গরিব, দম-আটকানো। শুধু টাকা নেই ব'লে গরিব নয়, মনগুলিও পানাপুকুর। পড়ি ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস—মনে-মনে ভাবি এ-সব আশ্চর্য কাণ্ড কি তারাই করেছে, আমাদের দেশে যাদের পেশা হ'লো লুঠতরাজ? তারা জাঁদরেল ব'লে, না কি আমাদেরই কোনো মারাত্মক গলদের জন্য? জানেন, আমি 'ওদের মতো' হ'তে চেয়েছিলুম, স্বাধীন, বেপরোয়া, ক্ষমতাশালী। এই আমাদের পরিবারে-বাঁধা জীবন, যেখানে সুখদুঃখগুলি এইটুকু-টুকু, আশা পর্যন্ত বেশি দূর বাড়তে পারে না, সেই অবরোধ থেকে মুক্তি চেয়েছিলুম। আর তার একটা উপায়ও আমার হাতের কাছে এসেছিলো—মিতু বর্ধনের সঙ্গে আলাপ হ'লো যখন, আর্থার জোন্সের সঙ্গে দেখা হ'লো যখন। এই যে, আপনার চা।

আপনি কখনো দেখেছিলেন আর্থার জোন্সকে? না? অনেকেই তাকে চিনতো তখন ঢাকায়। ছোকরা, টাটকা-পাশ-করা আই. সি. এস.। বাংলা বলে, বাঙালিদের সঙ্গে মেশে, য়ুনিভার্সিটিতে আসে ডীবেট করতে, কোনো-কোনো বাড়িতেও যায়। গানের ভক্ত। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো মিতু

বর্ধনের বাড়িতে। আপনি নাম শুনেছেন? আপনার কাছে অমিতা বর্ধনের রেকর্ড আছে এখনো? তা শুনুন, আমি অনেক ঘাটের জল খেয়েছি, একটা কথা বলি। ও-সব পুরোনো স্মৃতি আঁকড়ে থাকাটা কিছু নয়। যেমন বাত, শোথ, পক্ষাঘাত, তেমনি একটা ব্যামো হ'লো স্মৃতি: অচল ক'রে দেয়। দেখুন না ভারতবর্ষের অবস্থা: সেই উপনিষদ, কালিদাস, তানসেন—এ-সবই আমরা জপছি এখনো। কিন্তু তার পরে? তারপরে যেটুকু ভালো তা কি ইংরেজেরই দৌলতে হয়নি?

মাপ করবেন, আমি চায়ে যোগ দিচ্ছি না আপনার সঙ্গে, আমি জিন খাচ্ছি। আপনি একটু··· ? না? আচ্ছা, আপরুচি খানাপিনা, এর ওপর কোনো কথা নেই। স্ত্রীলোক বিষয়েও সেই কথা—মাপ করবেন, স্ত্রী বলতে চেয়েছিলুম। প্রহিবিশন? তা মদ তো আর নীল গোলাপ নয় যে চাইলে পাওয়া যাবে না। আর আইন অন্যায় হ'লে সেটাকে মান্য করাই অন্যায়। একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি হিশেবেই বলছি। এককালে আমরা স্কুলে-কলেজে পিকেটিং করেছি, তারপর পোস্টাপিশে আগুন ধরিয়েছি, এখন আবার ট্রেন থামিয়ে দিচ্ছি যেখানে-সেখানে: এগুলো হ'লো অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, অন্যের অধিকার কেড়ে নেয়া—সে-তুলনায় মদ তো একটা ছোটো ব্যাপার, ছোটো, এবং নির্দোষ—শান্তিপূর্ণ, নিভৃত, ব্যক্তিগত—কারো কোনো ক্ষতি করা হচ্ছে না এতে, অন্য কারো কিছুই এসে যায় না। আপনি বি. এ. পরীক্ষা দিতে চলেছেন, আমি আপনার পায়ের তলায় শুয়ে পড়লুম; ট্রেনে চলেছেন মুমূর্ষু আত্মীয়কে শেষ দেখার জন্য, আমি দলবল জুটিয়ে আটকে দিলুম ট্রেন; আর, আপনার কোনো কাজে বা ইচ্ছেতে বাধা না-দিয়ে আমি শুধু ঘরে ব'সে মদ খেয়ে একটু সুখ পাচ্ছি—কোনটা বেআইনি আর কোনটা আইনমাফিক তা কি ব'লে দিতে হয় কাউকে? না—মদ বলুন, হেঁয়ালি-মতো কবিতা লেখা বলুন, সিনেমায় চুম্বন বলুন—ও-সব মামলা আখেরে কোনো হাইকোর্টে টিকবে না।···আজ্ঞে? আমার পেশা? চাকরিতে ছিলুম মশাই, সরকারি চাকরি। পুরোনো পাপী, ইংরেজ আমলের আই. সি. এস.। র‍্যাঙ্কিট্ ডাটা, আই. সি. এস., বার-অ্যাট-ল। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত, স্থাণু।···আচ্ছা তাহ'লে—চীয়র্স। আপনার চা ঠিক আছে তো?

আর্থার জোন্সের আগে আমি কোনো জ্যান্ত ইংরেজকে কাছাকাছি

দেখিনি। কোনো মরা ইংরেজকেও দেখিনি অবশ্য—যদিও টেররিস্টদের গুলিতে তারা দুমদাম মরছে তখন। আমার কাছে ইংরেজ ছিলো বইয়ে-পড়া, সিনেমায় দেখা মানুষ। আর মাঝে-মাঝে, ঝাপসাভাবে কলকাতায় দেখা। মস্ত শহরের মধ্যে একরত্তি চৌরঙ্গি-পার্ক-স্ট্রিট পাড়া; একটি উজ্জ্বল দ্বীপ, সুখ সম্ভোগ ঐশ্বর্য সব সেখানে। আমাদের নাগালের বাইরে। টকটকে লাল গর্দানওলা লম্বা বলিষ্ঠ পুরুষগুলো, তাদের বাহুলগ্ন পেখম-তোলা স্ত্রীলোকেরা—অদ্ভুত, অত্যন্ত দূর, জমকালো। যেন অন্য জীব, মানুষ ছাড়া অন্য কিছু, যেন এই ঈশ্বরের তৈরি সর্বজনীন বাতাসে তারা নিশ্বাস নেয় না। একদিকে এই: অন্যদিকে ইংরেজের লেখা যে-সব বই পড়ি—উল্টো এক ব্যাপার। ছেলেমানুষ ছিলুম, ঐ দুটোকে মেলাতে পারিনি। আমি মনে-মনে বানিয়ে নিয়েছি এক অসাধারণ ভালো ও মেধাবী ইংলণ্ড, যার পতাকা য়ুনিয়ন জ্যাক নয়, শেক্সপীয়র। যার জাহাজগুলো ভারতবর্ষ থেকে চা, পাট, তুলো, সোনা সরিয়ে নেয় না, ঘাটে-ঘাটে পৌঁছিয়ে দেয় শেলির কবিতা, ডিকেন্সের উপন্যাস। শেলি নিরিমিষ খেতেন, কীটস ছিলেন লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট, আর কী সুন্দর মুখশ্রী ছিলো দু-জনেরই, আর কী বেদনা তাঁদের কবিতায়, আমার বড্ড আপন জন মনে হয় তাঁদের। এও কি সম্ভব যে তাঁরাও ইংরেজ? তাদেরই স্বজাতি, যারা চৌরঙ্গিতে এমনভাবে চলে যেন আকাশের তারাগুলো পর্যন্ত তাদেরই হুকুমে ওঠে নামে? যাদের ফার্পো রেস্তোরাঁয় ধুতি প'রে কেউ ঢুকতে পায় না? আসামে চায়ের বাগানে যাদের দেখামাত্র 'বাবু'দের (হয়তো আমারই মেসো-পিসেকে) সাইকেল থেকে নেমে পড়তে হয়? আমার ইচ্ছে হ'তো ঐ গোমূর্খ চায়ের সাহেব পাটের সাহেবগুলোকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি যে তাদের দেশকে তারা যতটা জানে তার চেয়ে বেশি জানি আমি, যেহেতু শেলি কীটস ইত্যাদির সঙ্গে মাঝে-মাঝে আমার কথাবার্তা চলে।—কথাবার্তা? না—ঠিক তা নয়, কোনো বিনিময় নেই, সবই একতরফা। একটা ধারণা, আদর্শ, অর্থাৎ আমার নিজেরই তৈরি খেলনা—ঐ শেলি আর কীটস। আসলে হয়তো তেমনি ঝাপসা, অবাস্তব, যেমন চৌরঙ্গির জনবুলগুলো। কিন্তু আর্থার জোন্সকে দেখে আমি প্রথম বুঝলাম যে ইংরেজও আমাদের মতো মানুষ।

আপনি হাসছেন, কোন সালে জন্ম আপনার?…আরে, সে তো আমারই

বছর। আপনার কি মনে নেই তখনকার অবস্থা? আপনি কি সব ভুলে গেছেন? শুনুন, আমি যখন বড়ো হচ্ছিলুম তখনও ব্রিটিশ সিংহের দাঁত প'ড়ে যায়নি। তাছাড়া আমার বাড়ির আবহাওয়াটাও ভেবে দেখবেন। সকলেই সরকারি চাকুরে, ছোটো বা মাঝারি গোছের। আমার বাবা, কাকারা, আশে-পাশে অন্যান্য আত্মীয়, প্রায় সবাই। ঐ তাঁদের চিচিং-ফাঁক, জীবনের লক্ষ্য, আরম্ভ ও পরিণাম: সরকারি চাকরি। 'চাকরি যায় না, বছর-বছর মাইনে বাড়ে, পেন্সন আছে, আর সাহেবদের আণ্ডারে কাজ ক'রেও সুখ!' অন্য কোনো চাকরি, কোনো ব্যবসা, পেশা—যাতে কোনোরকম অনিশ্চয়তা আছে, বা একটু বেশি উদ্যম ও বুদ্ধি খাটাবার দরকার হয়—সেগুলিকে সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছেন এঁরা।—জঘন্য! আমার নাড়ি উল্টে আসে। আমি অনেকগুলো তরুণী আত্মীয়ার বিয়ে দেখেছি মশাই, অনেকবার 'মেয়ে দেখানো' দেখেছি। আমাদেরই বাড়িতে। জাত গোত্র বংশ ঠিকুজি, অত হাজার নগদ আর অত ভরি সোনা, কুলীন না বঙ্গজ না ভগ্নকুলীন, বিক্রমপুর না পাড়জোয়ার, ভরাকরের ঘোষেদের চাইতে আঠারোবাড়ির মিত্তিররা উঁচু না নিচু—এ-সব কথা অনেক শুনেছি ছেলেবেলায়। আমার আই. এ.-পাশ দিদি, ইডেন কলেজের ভালো ছাত্রী, তাকেও সেজে-গুজে আসতে হয়েছে কতগুলো অচেনা অজানা স্ত্রীলোক আর পুরুষের সামনে, যাদের কাঁড়ি-কাঁড়ি খাবার খাইয়েছেন আমার মা, আর বাবা হেঁ-হেঁ ক'রে হাত কচলে কথা বলেছেন। ঘেন্না আর কাকে বলে।

একটা ব্যক্তিগত সমস্যাও ছিলো আমার। 'আই. সি. এস. দে, আই. সি. এস. দাও—' বি. এ. পাশ করার পর থেকে এ-কথা শুনতে-শুনতে ঝালাপালা হ'য়ে যাচ্ছি। যেহেতু পরীক্ষায় উঁচু নম্বর পাওয়া আমার একটা বদভ্যাস, তাই ও ছাড়া কোনো আত্মীয়ের মুখে কথা নেই। ভেবে দেখুন—তাঁরা নিজেরা কেউ পেশকার, কেউ পোস্টমাস্টার, কেউ কেরানি; তাঁদের মধ্য থেকে কেউ একজন একটা আস্ত জেলার কর্তা হ'য়ে বসবে, এমনকি হাইকোর্টের জজও হ'তে পারে কোনো-একদিন—এটা কল্পনা করতেই তাঁদের শরীরে নাকি 'সাত হাতির বল আসে.' 'বুকের ছাতি সাতগুণ বেড়ে যায়।' যেন সেটা কোনো স্বর্গের সিঁড়ি, যার শেষ ধাপটি তাঁদের চোখে পর্যন্ত মালুম হয় না। আমি ভাবটা দেখাই যেন আচ্ছা, সবাই যখন বলছেন, কিন্তু মনে-মনে জানি দুটো কাজ আমি কখনোই

করবো না—সরকারি চাকরি, আর পাতানো বিয়ে।…তাহ'লে? নসিব, মশাই, নসিব: ভেবেছিলাম এক, তালেগোলে অন্য রকম হ'য়ে গেলো।

আপনি প্রথম সিনেমা কবে দেখেছিলেন? মনে নেই? আমার মনে আছে—আমি খুব ছোটো তখন, জর্মান যুদ্ধ চলছে, প্রথম যুদ্ধ। করোনেশন পার্কে বিনি পয়সায় দেখানো হ'লো। প্রথমে কতগুলো আবোলতাবোল কামান ট্যাঙ্ক জঙ্গি জাহাজ, মার্শাল ফশ, লর্ড কিচনারের গোঁফ—তারপর হঠাৎ কয়েকটা ভয়াবহ দৃশ্য। বাচ্চাদের শূন্যে ছুঁড়ে সঙিনে বেঁধাচ্ছে, ফুটফুটে মেয়েগুলোকে শেকলে বেঁধে সারা গায়ে চালিয়ে যাচ্ছে চাবুক—জর্মানদের কীর্তি অবশ্য। ভয়ে আমি শিউরে উঠেছিলাম, তবু জর্মানদের রাক্ষস ব'লেও ভাবতে পারিনি, কেননা বাড়িতে দেখি জর্মানদের কথা উঠলে গুরুজনদের মুখে হাসি আর ধরে না। 'এমডেন' যখন ফুটফাট বিলিতি জাহাজ ডোবাচ্ছে তখন প্রায় হরিলুট দেবার অবস্থা তাঁদের। 'ব্যাটারা নিপাত যাবে এবার!' 'বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে ইংরেজগুলোকে!' 'শক্ত পাল্লায় পড়েছো বাছাধন! আর জারিজুরি টিকলো না।'—কিন্তু এ-সব কথা ফিশফিশ ক'রে বলেন তাঁরা, ঘরের মধ্যে তক্তাপোশে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে। আর বাইরে? দিনের আলোয়, রাস্তায়, দূর থেকেও কোনো সাহেব বা সাহেবতুল্য বাঙালি, কোনো শাদা চামড়া বা উঁচুদরের সরকারি চাকুরে—এমন কাউকে চোখে পড়ামাত্র তাঁদের শিরদাঁড়া নিজে-নিজেই বেঁকে যায়, মুখ ফ্যাকাশে, কোথায় যাচ্ছিলেন তা ভুলে গিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়েন হয়তো। যখন ঐ লড়াই চলছে, যখন ঘরে-ঘরে ইংরেজের বাপান্ত করছে সবাই, তখনও দেখেছি অনেক বাড়িতে দিল্লি দরবারের ছবি, আর এক গুষ্টি ছানাপোনা সমেত রাজদণ্ড হাতে সস্ত্রীক পঞ্চম জর্জ। আমার ঠাকুমার ঠাকুরঘরে মহারানী ভিক্টরিয়ার একটি ছবিও ছিলো। আপনি হাসছেন? আমি বানিয়ে বলছি না—সত্যি। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি—'ওঁ' অক্ষরের মধ্যে লতিয়ে আছেন দু-জনে—গলায়-সাপ-জড়ানো মহাদেব, রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, লক্ষ্মীর সরা—এই সবের মধ্যে একটি 'ত্রিবর্ণ হাফটোনে ছাপা' ছবি—সেই মোটা, মৃত মহিলা, যিনি বহু দূরে এক ঠাণ্ডা দ্বীপে রাজত্ব করতেন, যাঁকে এক ফরাশি ভদ্রলোক বলেছিলেন 'হলদে-দাঁতওলা বুড়ি', তিনি। 'মহারানীর আমল'—আমার ঠাকুমার মতে সেটাই ছিলো স্বর্ণযুগ, রাম-রাজত্ব। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দিল্লি দরবারের

ছবিটা আমি সরাতে পেরেছিলুম বাড়ি থেকে, কিন্তু ঠাকুমা তাঁর ঠাকুরঘরের মহারানীকে সস্নেহে আঁকড়ে রইলেন—'আহা থাক না, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী!' কিন্তু, আমাকে ও জনমতকে খুশি করার জন্য, আর তিনি স্বভাবতই ভক্তিমতী ব'লে, ভিক্টরিয়ার পাশেই গান্ধীর একটি ছবি নতুন আমদানি করলেন। দেবতার সংখ্যা বেড়ে যায় তো ভালো, কিন্তু একটিকেও হারাতে তিনি নারাজ।

একটা মজার গল্প বলি, শুনুন। আমি একবার লাটসাহেবকে স্যালুট করেছিলাম। ঢাকায়, নবাবপুরের রাস্তায়। স্কুলে নিচের ক্লাশে পড়ি তখন। ঢাকায় এসেছেন লাটসাহেব, সদরঘাটে স্টিমার থেকে নেমে রমনার গভর্মেণ্ট হাউসে যাচ্ছেন—রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। ঘোড়ায়-চড়া চাপদাড়িওলা পাঠান সেপাই, মোটর-সাইকেলে গোরা সার্জেণ্ট, এই সবে ঘেরাও হ'য়ে মস্ত কালো মোটরগাড়িটা কাছে এলো। আমি এক ঝলক দেখলাম একটা টকটকে লাল মুখের আধখানা, খাড়া নাক, ফুলকো গাল, ঠোঁটের ওপর ছাইরঙা গোঁফ—সোজাসুজি দেখলে মনে হ'তো অন্য সব চোখে-না-পড়া মুখের চাইতে একটুও আলাদা নয়। কিন্তু—ঐ ভিড়ে আর রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে, পলকের জন্য আধখানামাত্র দেখতে পেয়ে, আমার কেমন যেন চোখ ঝলসে গেলো—গাড়িটা যখন কাছে এসে চ'লে যাচ্ছে, আমি হঠাৎ টান হয়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট করে ফেললাম। কেন করেছিলাম? অন্য কেউ করেনি, কেউ আমাকে ব'লে দেয়নি, আমার নিজের ভেতর থেকেই এলো ওটা। বাড়ি এসে লাফাতে-লাফাতে মা-বাবাকে বললাম; তাঁরা হাসলেন।

আজ্ঞে? আপনি বলছেন এটা নেহাৎ ছেলেমানুষি, এতে কিছুই প্রমাণ হয় না, গণ্য করার মতো কিছু নয় এটা? কিন্তু জানেন, যখন মিতু বর্ধনের বাড়িতে আসা-যাওয়া করছি, সেখানে আরো দু-একজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, যখন আমি নতুন ক'রে অনেক-কিছু ভাবছি, নতুন চোখে দেখতে পাচ্ছি যা-কিছু এতদিন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নিয়েছিলাম—তখন এই তুচ্ছ ঘটনাটাও আমার মনে পড়েছে মাঝে-মাঝে। হঠাৎ মনে হয়েছে, আমাদের জীবনে অপমান ছাড়া কিছু নেই। আমরা ভাতের সঙ্গে অপমান খাই, জলের সঙ্গে অপমান গিলি। সেই যে আমি লাটসাহেবকে স্যালুট করেছিলাম, তা কি

অবোধ শিশু ছিলাম ব'লে? না কি আমিই বিশেষভাবে খারাপ, পাপিষ্ঠ, যার জন্যে ঐ হীনতা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো? না কি এই রকমই আমরা, ছেলে বুড়ো মূর্খ শিক্ষিত সবাই, হাতে-কলমে না হোক, মনে-মনে স্যালুট চালাচ্ছি সব সময়? নয়তো আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে একটা পাঠ্য বই কেন 'কিম'—সেই কিপলিঙের লেখা, যার কাছে বাঙালিরা হ'লো 'বান্দর-লোগ' আর পেশোয়ার থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে শুধু জীবজন্তু সহিস মাহুত বৃটিশ টমি? এমনি অনেক ভাবনা তখন ছেঁকে ধরেছিলো আমাকে: আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম, অনেক কারণেই কষ্ট পাচ্ছিলাম। এক-এক সময় এও ভেবেছি যে ঐ যারা ইংরেজের বুকে গুলি বেঁধাচ্ছে, হয়তো এই অপমানেরই জবাব দিচ্ছে তারা। যোগ্য জবাব। কী-সব কাণ্ড তখন হচ্ছিলো সারা দেশে, তা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি? প্রথমে চাটগাঁয়, তারপর এই ঢাকাতেই। মিটফোর্ড হাসপাতালে। তারপর খোদ রাইটার্স বিল্ডিঙে, কলকাতায়। বলুন আপনি, যাদের হৃৎপিণ্ড সব সময় শুধু ধুকপুক করে, ধুকপুক, ধুকপুক, হঠাৎ তাদের বুকের মধ্যে কি ঘণ্টা কাঁসর দামামা শাঁক বেজে ওঠে না, যখন তাদের চোখের সামনে একটা দুর্দান্ত ইংরেজ মাটিতে প'ড়ে যায়—জর্মান যুদ্ধে নয়, এই ভেতো বাঙালির গুলিতে?

২

উটকামণ্ডে কেমন লাগছে আপনার? সুন্দর, না? খুব সবুজ, আর খুব ছড়ানো। নেলির পছন্দ হয়েছিলো এইজন্যেই। আমারও। বা হয়তো আমার পছন্দ ব'লেই নেলিরও চোখে ধ'রে গেলো। দার্জিলিং ভালো লাগে না আমার, বড্ড আঁটোসাঁটো, পাহাড়গুলো যেন পিষে মারবে, এত কাছে, আর আপনাদের ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন এক বিনিদ্র বিচারক।…আরে মশাই জজিয়তি করেছি তো বিশ বছর, বিচারকের চোখের সামনে অপরাধীর কেমন লাগে তা তো জানি। কিন্তু উটকামণ্ড বেশ খোলামেলা, বেশ সহজে নিশ্বাস নেয়া যায়।…কী বললেন? ইংলণ্ডের মতো? কিন্তু সেখানেও কাণ্ট্রিসাইড নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে—আপনি শেষ কবে গিয়েছিলেন? কখনো যাননি?—ও, তাও তো বটে। তবে, হ্যাঁ—যে-রকম শোনা যায়, পড়া যায়। হ্যাঁ, খানিকটা। হঠাৎ মনে হয় ওঅর্ডস্বার্থের কবিতার দৃশ্য—সবুজ পাহাড়ের গায়ে ভেড়া চরে, ড্যাফোডিলও ফোটে। কিন্তু এমন রোদ্দুর ইংলণ্ডে কোথায় পাবেন মশাই? দেখুন বাইরে তাকিয়ে, কী ঝকঝকে রোদ, দুপুরবেলা রাস্তায় হাঁটলে গরমও লাগে, কিন্তু ঘরে ঢুকলেই সুশীতল। বারো মাস ধরনটা প্রায় একই—না-গরম, না-ঠাণ্ডা। হৈ-হৈ মনসুন নেই, গুমোট হয় না কখনো। আমার মতে আইডিয়েল আবহাওয়া। আমি গরমকে যমের মতো ডরাই, বেশি ঠাণ্ডাও আমার অসহ্য। ঐ ঠাণ্ডার ভয়েই ইংলণ্ডে বাস করার কথা কখনো ভাবিনি। তাছাড়া, ভারতের আর যে-দোষই থাক, এখানে অন্তত চাকরবাকর পাওয়া যায় এখনো। চাকর ছাড়া কি বাঁচা যায়, বলুন!

নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন শহরটা যেন পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়? নানা দেশের ফুল, নানা ঋতুর ফল। যেন গ্যেটের শকুন্তলা, শোপেনহাওয়ারের উপনিষদ। একসঙ্গে কলা আর স্ট্রবেরি। আমলকি আর আপেল। ভাবতে পারেন সাত হাজার ফুট উঁচুতে কলাগাছ! তাছাড়া ছোটোখাটো সুবিধেও আছে দু-একটা। কারখানা নেই যে ধোঁয়া হবে, ধর্মঘটের মিছিল বেরোবে।

ব্যাবসা আপিশ বেশি নেই ব'লে ছা-পোষা কেরানিও অল্প। কাছাকাছি তিব্বত কি পাকিস্তান নেই যে রেফিউজী আসবে দলে-দলে। কিছু ইংরেজ এখানে বাড়ি কিনে থেকে গেছে, কিছু ধনী পরিবার যাওয়া-আসা করে মাদ্রাজ মাইসোর ব্যাঙ্গালোর থেকে। শান্ত, ভদ্র সব-কিছু। কী বললেন? মাদ্রাজের বামুন-অবামুন পলিটিক্স? তা মশাই, পৃথিবীটা তো আর স্বর্গরাজ্য নয়। তাছাড়া, আমার কী এসে যায়? আসাম থেকে বাঙালি খেদাক, টুকরো হ'য়ে যাক পাঞ্জাব, তামিল থেকে সংস্কৃত শব্দগুলোকে ঝেঁটিয়ে বের ক'রে দিক, বাঁদর, ইঁদুর, গোরু ইত্যাদি মা-বাবাদের বাঁচাবার জন্য মানুষগুলোকে না-খাইয়ে মারুক—আমার কী এসে যায়? আমি ভালো আছি। আমি সুখে আছি। আমার এই বারান্দায় ব'সে মনেই হয় না যে ভারতবর্ষ জনসংখ্যার চাপে ফেটে যাচ্ছে। মনেই হয় না হিমালয়ের উত্তরে ওৎ পেতে আছে চীনেরা। মনেই পড়ে না কাশ্মীর আর নেফা নিয়ে কী টালমাটাল চলছে। মনেই পড়ে না দিল্লির হেডলাইন, কলকাতার হৈ-হল্লা। রেডিও, খবর-কাগজ—এমনি দু-একটা বেদরকারি জিনিশ বাদ দিলে সহজেই ভেবে নেয়া যায় আমি ভারতবর্ষে নেই। আর ধরুন, চীনেরা যদি ঢুকেও পড়ে, তাহ'লেও এই দূর দক্ষিণে পৌঁছতে একটু দেরি হবে তো। আর ততদিনে আমি হয়তো আর ভারতে থাকবো না, জগতেও থাকবো না—জায়গাটা ভালো বাছিনি?

আপনি উঠতে চান? কেন, বসুন না খানিকক্ষণ। যতক্ষণ ইচ্ছে বসুন। বেড়াতে এসেছেন, কোনো তাড়া নেই তো। না, আমার কোনো কাজ নেই, কখনোই কোনো কাজ থাকে না। আমি কোথাও যাই না, কিছু করি না, একা থাকি। বারান্দাটি ভালো লাগছে আপনার? একটু ঘুরিয়ে নিন চেয়ারটা, ঐ দিকের দৃশ্যটা মন্দ না। ঢেউ-খেলানো সবুজ, দূরে সারি-সারি নীল পাহাড়। রোদ, আলো, আকাশ—গাছের শব্দ হাওয়ার শব্দকে আটকে রেখেছে কাচের জানলাগুলো—মনে হয় যেন পৃথিবীতে শান্তি আর উজ্জ্বলতা ছাড়া কিছু নেই। আর আমার বাগানের ফুলগুলো—তারাও বোকার মতো হাসছে সব সময়, জন্মাতে পেরেই খুশি তারা, কোনো নালিশ নেই। এক-এক সময় আমার ইচ্ছে করে কী, জানেন? একদিন একটা লাঠি হাতে নিয়ে বেরোই, পিটিয়ে-পিটিয়ে ছারখার ক'রে দিই বাগান, গাছগুলোকে উপড়ে

ফেলি, ফুলগুলোকে থেঁৎলে দিই পায়ের তলায়। ভারি মজার একটা খেলা হয়, তা-ই না?

আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ভারতবর্ষ সত্যি ভেঙে যাবে—যাচ্ছে, হয়তো আমরা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নতুন ক'রে অঙ্গ-বঙ্গ-গুজরাট-কর্ণাটে পরিণত হবো? অসম্ভব? কেন? ভারত বলতে আমরা যা বুঝেছিলাম তা তো আর নেই; দুটো দূর টুকরো নিয়ে আলাদা একটা মুলুক হ'য়ে গেলো—যা ছিলো অবিশ্বাস্য তা-ই হ'লো বাস্তব, তাহ'লে এর পর আরো ভাঙচুর হবার বাধা কী? কোনো বাধাই নেই—'ভারতবর্ষ' নামে একটা ধারণা ছাড়া। লোকেরা যাকে 'দেশ' বলে তা তো আসলে একটা ধারণা মাত্র, রহস্য, কবিকল্পনা, যাকে বলে 'মিস্টীক'—তা টিকে থাকে শুধু মানুষের বিশ্বাসের ওপর। ধরুন না, ঐ একটা এক রত্তি জায়গা বৃটেন, সেখানেও ধ'রে নিতে হয়েছে, বিশ্বাস করতে হয়েছে যে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড আর ওয়েলস মিলে একটাই দেশ। তেমনি, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদিরাও এককালে আমাদের জপিয়েছিলেন যে এক মহামানবের সাগরতীরের নাম ভারত। অবশ্য পেছনে ছিলো ইংরেজের শক্তি, জঙ্গি-জাহাজ, অস্ত্রশস্ত্র। শুধু তা-ই নয়—'বৃটিশ সাম্রাজ্য' নামক কল্পনাতেও ইংরেজের বিশ্বাস ছিলো প্রথমে—নয়তো কি আর ভারত-বর্মা-সিংহল সুদ্ধ এক রাজ্য ব'লে কল্পনা করা যায়? সেই বিশ্বাস যেদিন হারিয়ে ফেললো ইংরেজরা, সেদিনই তাদের পতন শুরু হ'লো। ওরা গেছে আপদ গেছে, কিন্তু আমি ভাবি, যে-ধারণার ওপর ইংরেজের নিশেন উড়েছিলো, রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছিলেন, তা কি আমাদের মনের কাছেও এখন অস্পষ্ট হ'য়ে যায়নি?

না মশাই, আমি স্বদেশীওলা ছিলুম না কোনোদিন। সমস্ত ছেলেবেলাটা ঢাকায় কাটিয়েও কোনো দাদার দলে ভিড়িনি, মহাত্মা গান্ধীর চ্যালা হ'য়ে খদ্দরও পরিনি কখনো। চেয়েছিলুম নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজের জোরে কিছু-একটা হ'তে, বড়ো কিছু হ'তে। আমি যে আমি, শুধু এতেই আমার পরিচয় হবে, কোনো দলে ভিড়েছি ব'লে নয়, কোনো গদিতে বসেছি ব'লে নয়। কিন্তু কেমন ক'রে? কী করবো আমি? কী করতে চাই জীবনে? কখনো ভাবি, বই লিখে নামজাদা হবো; কখনো ভাবি, কোনো জাহাজে যে-কোনো রকম চাকরি জুটিয়ে ভেসে পড়বো সমুদ্রে—জগৎটাকে দেখবো, জানবো। কনরাড পড়েছিলুম—ঘুমের আগে মশারির তলায় দূর বন্দরের গন্ধ

পাই মাঝে-মাঝে। সব ছেলেমানুষি ভাবনা আরকি। একটা বিশাল আশা ফুলে ওঠে বুকের মধ্যে ; পরমুহূর্তেই মনে হয় আমি কিছুই পারবো না, কিছুই হবে না আমাকে দিয়ে।

নিশ্চয়ই ভুলে যাননি, দেশের কী অবস্থা তখন? দুনিয়া-জোড়া ব্যাবসা-মন্দার ঢেউ এই বাণিজ্যহীন দূর দেশেও পৌঁচেছে ; ছাঁটাই, বেকার, হাহাকার, ত্রাহি-ত্রাহি রব চারদিকে। ঢাকায় মাঝে-মাঝে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। তার ওপর লবণ-আন্দোলন, গুলিগোলা, ডেটিন্যু। চাকরি আর ছুকরি—এই দুটি হ'লো আমার বয়সী ছেলেদের কথাবার্তার প্রধান বিষয়। ক্লাশের মেয়েরা, পাড়ার মেয়েরা—যে-সব ললনাকে অন্তত কিছুটা চোখে দেখা যায়, তাদের বিষয়ে খুদকুঁড়ো খবর পিঁপড়ের মতো চেটে নেয় তারা। কোনো পঁচাত্তর টাকার মাষ্টারির গন্ধে সেরা ছাত্রেরা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। কেউ-কেউ দিস্তে জুড়ে ষোড়শী প্রেয়সীর উদ্দেশে পদ্য লেখে। কেউ বলে, আহা, যদি অন্তত ডেটিন্যু ক'রে ধ'রে নিয়ে যায় তাহ'লে মাসোয়ারাটা পাবো তো! কেউ রোববার বিকেলে সেজে-গুজে ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে চোখ বুজে নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করে, মাঝে-মাঝে মিটিমিটি তাকায় সমবেতা ব্রাহ্মিকা ভগিনীদের দিকে, আর ঘাড় কাৎ ক'রে মুগ্ধ হ'য়ে শোনে, যখন লাল শালুর আড়াল থেকে নারীকণ্ঠে ব্রহ্মসংগীত নিঃসৃত হয়। কেউ, যদিও একুশ ছোঁয়-ছোঁয়, বাবার হুকুমে নির্দিষ্ট তারিখে চুল ছাঁটে, সন্ধের পরে বাড়ির বাইরে থাকে না। আবার কেউ বা সমবয়সীদের চরিত্ররক্ষার ভার নিয়েছে, কোনো ছেলে কোনো তরুণীর সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করছে এমনতর সন্দেহ হলেই দমাদ্দম মারধোর করে।··· কিছু বললেন? হ্যাঁ, তা তো বটেই—শুধু এ-ই নয়, আনন্দও ছিলো। উঠতি বয়সে আনন্দের কি অভাব? ঐ তো কয়েকটা বছর প্রকৃতির সহৃদয়তা ভোগ করি আমরা। ঐ তো কয়েকটা বছর পৃথিবীকে বন্ধু ব'লে মনে হয়, বোকাকে প্রতিভাবান, চালিয়াৎকে মহাপুরুষ। দেখছেন তো, কত বড়ো ফাঁকি ঐ আনন্দ। তা, হ্যাঁ—তখনকার মতো। ঠিক বলেছেন, জীবনে সবই তখনকার মতো। কতকগুলো মুহূর্ত, জোনাকির মতো, একটা অসংলগ্ন ক্লান্তিকর নাটক, এক দৃশ্যের সঙ্গে অন্যটার কোনো সম্পর্ক নেই। না কি আছে, কিন্তু সম্পর্কটা আমরা ধরতে পারি না? আপনি কখনো বের্গসঁ পড়েছিলেন? স্মৃতি? ঐ তো মশাই, ওখানে মতভেদ হ'লো আপনার সঙ্গে। আমি অতীতের

জঞ্জাল জমাই না; আমি হেনরি ফোর্ডের সঙ্গে একমত: 'History is bunk.'

হ্যাঁ, ভালোও কিছু ছিলো বইকি। চায়ের দোকানে আড্ডা, খামকা হো-হো হাসি, নদীর ধারে বেড়ানো, ঘাসের ওপর গোল হ'য়ে ব'সে চীনেবাদাম খাওয়া, বুড়োর-দাড়ি খাওয়া। আর ভ্যালেনটিনো, ভিল্মা ব্যাঙ্কি, পোলা নেগ্রি—হলিউডের বিশ্বমোহিনীরা, হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি! কিন্তু মাঝে-মাঝে অন্য এক জগতের জন্য ইচ্ছে জাগে আমার। বড়ো, উদার, খোলা হাওয়ার জগৎ—সেখানে আর 'মেয়ে দেখানো' হবে না, পাতানো বিয়ে বরপণ উঠে যাবে, সহপাঠিনীর চেহারা নিয়ে তেলতেলে ভাষায় চোর-চোর চর্চা করবে না ছেলেরা, এই বুড়িগঙ্গার ধারেই হাতে হাত ধ'রে জোড়ে-জোড়ে ঘুরে বেড়াবে যুবক-যুবতী। আরো অনেক কিছু বদলে যাবে: কেউ আর হাত দেখাবে না, ধন্না দেবে না সন্নেসির পায়ে, হন্নে হবে না চাকরির জন্য—আমরা কেউ-কেউ পর্যটক হ'য়ে চ'লে যাবো সাহারায়, কেউ কোনো সোনার খনি খুঁজে পাবো মানভূমে, কেউ ব্যাঙের ছাতার চাষ ক'রে কোটিপতি হবো, কেউ বা একলা একটা এরোপ্লেন নিয়ে উড়ে যাবো কলকাতা থেকে টোকিও—ছেলেরা, আর মেয়েরাও। আমার মনে হয় কোনো লুকোনো ম্যাজিক আছে, কেমিস্ট্রির কোনো অনাবিষ্কৃত ফর্মুলা—আমারই মাথা থেকে সেটা বেরোবে কোনোদিন, তখন আমিই সারা দেশে রোশনাই জ্বালবো। বুঝেছেন তো, আমি মনে-মনে অসুখী ছিলাম, যৌবনের বিলাস ঐ দুঃখ, নিজেকে নিজের চেয়েও বড়ো ব'লে ভাবছি ব'লে যন্ত্রণা—কিন্তু আমি যেন বাড়তে পারছি না এখানে, যেন যথেষ্ট আলো নেই, হাওয়া নেই।—কিন্তু এরই মধ্যে একটু বৈচিত্র্য দেখা দিলো যখন ফটিক-মামা পাঁচ বছর পরে বিলেত থেকে ফিরলেন। আর, তাঁর ফেরার খবর পেয়েই মা কাজলকে আনিয়ে নিলেন তাঁর কাছে। কাজল-মামি, ফটিক-মামার স্ত্রী।

আমার মা তাঁর বিয়ের আগেই মাতৃহীন হয়েছিলেন, একমাত্র ভাই ফটিক তখন বছর পাঁচেকের। মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমার দাদামশাই—গ্রামের পোস্টমাস্টার তিনি—দ্বিতীয় পত্নী সংগ্রহ ক'রে নিলেন; মা তাঁর নিজের সংসারে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েই ভাইকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। দশ বছরের ছোটো ভাই, মা নেই, দুরন্ত, ডনকুস্তি সাঁতার সাপ ধরায় ওস্তাদ, পড়াশুনোয়

মন নেই তেমন—আমার মা তাকে অস্বাভাবিক ভালোবাসেন, কোনো বঙ্গমহিলার পক্ষে যতটা স্বাভাবিক, মাতৃহীনতার জন্য তার চেয়েও বেশি। ফটিক-মামাকে দেখে কেউ বলতো না বাঙালি ছেলের স্বাস্থ্য বা বাহুবল নেই, কলেজের স্পোর্টস-এ অনেকগুলো প্রাইজ তাঁর বাঁধা, কিন্তু দু-বারের চেষ্টাতেও বি. এস-সি. পরীক্ষায় উৎরোতে পারলেন না তিনি। তৃতীয়বার চেষ্টা না-ক'রে হঠাৎ বিলেতে চ'লে গেলেন। ঠিক হঠাৎও নয়—ফটিক-মামারই জেদ চাপলো বিলেতে যাবেন। মা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন ফটিকের এই আব্দার মেটাতে। নিজেদের সামর্থ্য নেই, কিন্তু অন্য একটা উপায় আছে তো। আরে মশাই সেই পুরোনো কাসুন্দি আরকি : শ্বশুরের টাকা। আমার মা আর দাদামশাই একজোট হলেন এ-ব্যাপারে; যেতে চায় যাক, কিন্তু বিয়ে ক'রে যেতে হবে, নয়তো আবার একটা ধিঙ্গি মেম ধ'রে আনবে কোত্থেকে। টাকায় টাকা, নিশ্চিন্তিতে নিশ্চিন্তি। আমার বাবার একটু আপত্তি ছিলো—'আগে বরং এখান থেকে গ্র্যাজুয়েট হোক, তারপর—' কিন্তু বাবা একটু মৃদু মানুষ, মা তাঁকে এক দাবড়িতে থামিয়ে দিলেন। 'একবার যাক না বিলেতে, একটা মানুষের মতো মানুষ হ'য়ে ফিরে আসবে ফটিক।' 'বিলেত' : কী জাদুমন্ত্র কথাটায় ভেবে দেখুন! দেশের ছাই-চাপা আগুন নাকি বিলেতের বাতাসে দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠবে। আর বিয়ে—আর-*একটি* মোক্ষম বড়ি! স্ত্রী—অচেনা একটা মানুষ, সে রইলো ছ-হাজার মাইল দূরে, তবু নাকি তারই টানে 'স্বভাবচরিত্র' ঠিক থাকবে ছেলের। ধন্য আমাদের মাদার ইণ্ডিয়া।

দু-মাসের চেষ্টায় ফটিকের জন্য যথোপযুক্ত শ্বশুর জোটানো গেলো। জলপাইগুড়িতে লরির ব্যাবসা করেন ভদ্রলোক, চা-বাগানে শেয়ার আছে, যাকে বলে শাঁসালো। আর তাঁর কন্যাটি? তার মুখ-চোখ কেমন, চুল কত বড়ো, গড়নপেটন ভালো কিনা, গায়ের রং উত্তমশ্যাম না মধ্যমশ্যাম—এ-সব নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনার পরে আমাদের বাড়ির মহিলামহল তাকে গ্রহণযোগ্য ব'লে ঘোষণা করলেন। হাত উপুড় ক'রে টাকা ঢাললেন তার বাবা—ফটিক-মামার মতো উচ্চকুলীন জামাই পেতে হ'লে ওটুকু নাকি করতেই হয়। বিয়ের একমাস পরে ফটিক-মামা বম্বাই থেকে জাহাজ ধরলেন, সদ্যবিবাহিত মেয়েটি ফিরে গেলো জলপাইগুড়িতে পিত্রালয়ে।

মামা গিয়েছিলেন দু-বছরের জন্য—গ্লাসগোর কোন পলিটেকনিকে পড়তে

—কিন্তু পাঁচ বছর ধ'রে তিনি কী করলেন আমি ঠিক জানি না। একবার শুনলাম চাকরি নিয়ে জর্মানিতে গেছেন, পরে শুনলাম আমেরিকায়। মা হাঁটুর ওপর কাগজ রেখে চারপাতা-জোড়া চিঠি লেখেন মাঝে-মাঝে, জবাব আসে অনেক দেরিতে, দু-চার ছত্রে—'তোমরা ভেবো না আমি ভাল আছি। সুবিধে হ'লেই ফিরে আসবো।' দীর্ঘ বিরহ, দীর্ঘ পথ-চেয়ে-থাকা—তারপরে মামা যেদিন সত্যি ফিরলেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার মা-র পুনর্মিলনের দৃশ্যটা হ'লো যাকে বলে মর্মস্পর্শী। ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মা, তাঁর চোখের জল দরদর ক'রে পড়তে লাগলো; মামাও কাঁদছেন, চুমো খাচ্ছেন দিদির গালে, তাঁর কাঁধের ওপর মাথা এলিয়ে দিচ্ছেন। (একজন বিলেতফেরৎ শক্ত সমর্থ জোয়ান পুরুষকে ও-রকম কাঁদতে দেখে আমি একটু অবাক হলাম, কিন্তু পরে জেনেছিলাম ওটা শুধু পুলকাশ্রু নয়, অন্য একটা কারণও ছিলো।) দিদির সঙ্গে সম্ভাষণ শেষ ক'রে মামা অন্যদের দিকে তাকালেন। বাবাকে প্রণাম করলেন; 'রঞ্জু, কত লম্বা হ'য়ে গেছিস—দেখি কেমন জোর হয়েছে,' ব'লে আমার বাইসেপ্‌স্‌-এ এমন চাপ দিলেন যে আমার মুখ দিয়ে 'উঃ' বেরিয়ে গেলো। 'মিন্নু, একেবারে লেইডি হ'য়ে গেছিস যে!' ব'লে আমার বোনকে কোমরে ধ'রে উঁচু ক'রে তুলে ধরলেন শূন্যে। মা একগাল হেসে বললেন, 'ফটিকের দস্যিপনা দেখছি তেমনি আছে।' মামা হঠাৎ বললেন, 'দিদি, এই মেয়েটি কে?' আমার বোন হেসে উঠলো খিলখিল ক'রে, কাজল-মামি লাল হ'য়ে উঠে মাথা নিচু করলেন, আর মা বললেন, 'ও মা, ও-ই তো তোর বৌ, কাজল! তুই যা, ফটিক, বিছানায় একটু গড়িয়ে নে—আর কাজল, তুমি ছাখো তো ওর কী লাগবে না-লাগবে। রাত্রে কী খাবি, ফটিক? কী-রকম ইচ্ছে?' 'সব খাবো, দিদি, তুমি যা রাঁধবে তা-ই খাবো, তোমার হাতের রান্না খাবার জন্যেই ফিরলাম।' 'দেখছো তো, কী-রকম পেটুক,' কাজলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন আমার মা। 'তোমাকে এবার রান্নায় হাত পাকাতে হবে।' একটু চোখে পড়ার মতো সমারোহ ক'রে তিনি যুগলশয্যা পেতে দিলেন ভাইকে, কিন্তু মামা অর্ধেক রাত্রি কাটিয়ে দিলেন মা-র বিছানায় শুয়ে-ব'সে গল্পে-গুজবে।

ফটিক-মামাকে নিয়ে খুব খানিকটা মাতামাতি হ'লো সেবারে, আমার দাদামশাই এলেন, দিদি আর জামাইবাবু এলেন মৈমনসিং থেকে, আত্মীয়ের

ভিড় লেগে গেলো, আর মিহু জনে-জনে ব'লে বেড়াতে লাগলো যে মামা 'ঠিক সাহেবদের মতো দেখতে হয়েছেন, তাঁর স্যুটকেস খুললেই বিলিতি গন্ধ পাওয়া যায়।' মামাকে দেখে আমিও বেশ উত্তেজিত হলাম, কেননা আমার আত্মীয়-মহলে তিনিই একমাত্র ছিটকে বেরিয়েছেন সরকারি চাকরির বেড়াজাল থেকে, একমাত্র তাঁরই জীবনে ঘটেছে যাকে বলে অ্যাডভেঞ্চার, সেই কোন দূর আমেরিকাতেও গিয়েছেন, আর এখন বলছেন চাকরি নেবেন না, ব্যাবসা করবেন। আমি তাঁকে খুঁটে-খুঁটে জিগেস করি, তিনি প্যারিসে গিয়েছেন কিনা, ভেনিসে গিয়েছেন কিনা, ইংলণ্ডে থাকতে শেক্সপীয়রের কোন-কোন নাটক দেখেছিলেন, কিন্তু এ-সব প্রশ্নের যে-রকম উত্তর পাই তাতে আমার মন ভরে না; 'হ্যাঁ, লণ্ডনে থিয়েটার আছে অনেকগুলো,' 'প্যারিস খুব সুন্দর সত্যি,' 'রোমে গিয়ে যা বৃষ্টি পেয়েছিলুম!' —এই ধরনের কথাবার্তা, আমি যা শুনতে চাই, জানতে চাই, তার অনেক পেছনে প'ড়ে থাকে। তিনি ফ্র্যাঙ্কফর্টে ছিলেন শুনে আমি জিগেস না-ক'রে পারলুম না, 'নিশ্চয়ই গ্যেটের বাড়িটা দেখেছো সেখানে?' আর তক্ষুনি আমার মা ব'লে উঠলেন, 'তোর বইয়ের কথা রাখ তো, রঞ্জু—ফটিক এঞ্জিনিয়র মানুষ, ও-সবের কী জানে!' 'এঞ্জিনিয়র': কথাটা শোনামাত্র আমার মগজে অন্য কতগুলো বীজাণু জন্মালো; মামাকে আমি সেই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ফেললাম, যারা মাটির তলায় রেলগাড়ি চালায়, ব্রিজ দিয়ে বাঁধে এপার-ওপার মস্ত নদীকে, যাদের কেরামতিতে ফিল্মেও নাকি কথা বলছে আজকাল। আমার খারাপ লাগলো এ-কথা ভেবে যে ও-সব বিষয়ে আমি এতই অজ্ঞ যে মামাকে কোনো প্রশ্ন করার মতো যোগ্যতাও আমার নেই। আমাদের সঙ্গে মাসখানেক কাটিয়ে মামা চ'লে গেলেন কলকাতায়—ব্যাবসার জন্য সেখানেই থাকতে হবে তাঁকে; আমি ধ'রে নিলুম তাঁর ব্যাবসার সঙ্গে নদীর ওপরে ব্রিজ তৈরির কোনো সম্পর্ক থাকবে। মাঝে-মাঝে আসেন ঢাকায়, কয়েকদিন থেকে আবার চ'লে যান—এইভাবে বছরখানেক কাটলো। 'এবার কাজলকে নিয়ে যা, ফটিক' — মা-র এই আর্জির জবাবে মামা বলেন, 'দিদি, এখনো ঠিক সুবিধে হচ্ছে না—দিনকাল বড্ড খারাপ তো, আর ক-টা দিন যাক।' যে-দেশে 'বিলেতফেরৎ' হ'লেই কেউ-কেটা হবার দরজা খুলে যায়, সে-দেশে ফটিকের এখনো সুবিধে হচ্ছে না ব'লে বাবা যদি কখনো উদ্বেগ প্রকাশ করেন, মা সহাস্যে আশ্বাস দেন তাঁকে, 'তুমি ভেবো না তো। ত্রিগুণা-

নন্দ ব্রহ্মচারী ওর হাতে দেখে কী বলেছিলেন মনে নেই? ফটিক বস্তা-বস্তা টাকা আনবে।'

আমার মা-বাবার মতে আমি 'ছেলেমানুষ', কোনো পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলার আমার অধিকার নেই, তা আমি চাইও না বলতে—কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা না-বলা নৈরাশ্য আস্তে-আস্তে জ'মে ওঠে, যেহেতু মাসের পরে মাস ফটিক-মামা কাজল-মামিকে নিয়ে যাচ্ছেন না। আমি মনে-মনে ছবি দেখি: কলকাতায় স্বামী-স্ত্রীর সংসার, নির্ঝঞ্ঝাট, পরিচ্ছন্ন—ভবানীপুরের হেশাম রোডে একটা ছোট্ট গোলাপি রঙের একতলা বাড়ি ঠিক ক'রে রেখেছি তাঁদের জন্য, একবার আমি পথ চলতে-চলতে দেখেছিলাম সকাল দশটার রোদ্দুরে, 'টু-লেট' ঝুলছিলো, ভেবেছিলাম কী সুখী তারা, যারা এই বাড়িটায় থাকবে। আমি চেয়েছিলাম একটি সুখী দম্পতিকে দেখতে, বয়সে আমার বড়ো কিন্তু বুড়ো নয়, আমি মাঝে-মাঝে বেড়াতে যাবো তাদের কাছে, নেবো তাদের সুখের অংশ, একটু হয়তো উঁকি দিতে পারবো দাম্পত্য জীবনের রহস্যে। ফটিক-মামা ফেরার পরে এই রকম একটা রূপকথা আমি বুনেছিলাম তাঁকে আর কাজল-মামিকে ঘিরে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আমার এই স্বাভাবিক আর খুবই সংগত ইচ্ছেটা পূরণ করার জন্য মামার কোনো গরজ নেই; কেন নেই তাও আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমার মনে হয় মা ফটিক-মামাকে আরো পিড়াপিড়ি করলে পারেন, কিন্তু কেন তিনি তা করেন না, তার কারণটা আমি বোধহয় আঁচ করতে পারি। পাছে ফটিক ভাবে তিনি তার বৌয়ের ভার আর বইতে চাচ্ছেন না, এই ভাবনাটা কাজ করে তাঁর মনের তলায়। তাছাড়া, কাজলকে তার স্বামীর 'মনোমতো' করে তুলতে হবে তো। আমার মা-ই সেই দায়িত্ব নিয়েছেন, কেননা তাঁর মতে কাজলের বাবার টাকা আছে কিন্তু 'হালচাল' নেই, অনেকগুলো ছেলেপুলে নিয়ে কেমন 'হ্যালহেলে' সংসার তাঁর, গ্যাখো না মেয়েকে ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাশ করাননি—তিনি কি ইচ্ছে করলে পারতেন না এই পাঁচ বছরে কাজলকে পড়াশুনো করিয়ে, কার্সিয়ঙের কোনো কনভেণ্টে রেখে, 'তৈরি' করে তুলতে? না—ও-সব তাঁর মাথায় খেলে না। মা তাই সস্নেহ সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে ঘিরে রেখেছেন কাজলকে; তাকে কিনে দেন হালকা রঙের হালফ্যাশনের শাড়ি, কোন শাড়ির সঙ্গে কোন গয়না ঠিক মানায় তা বুঝিয়ে দেন, চুল বেঁধে দেন

নিত্যি-নতুন কায়দায়, রান্না শেখান, পরিপাটি ক'রে ঘর গুছিয়ে নেন তাকে দিয়ে, নিয়ে যান এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়াতে, আমাদের য়ুনিভার্সিটির নাটক দেখতে—চেষ্টা করেন চলনে-বলনে কাজলকে বেশ ঝকঝকে ক'রে তুলতে, এমনকি আমাকেও অনুযোগ করেন আমি কেন মামিকে ইংরেজি শেখাই না, অন্তত খানিকটা কনভার্সেশন। কিন্তু কাজলের যেন কিছুতেই মন নেই, আগ্রহ নেই; বাপের বাড়িতে এই পাঁচ বছর আবশ্যিক আলস্যে কাটিয়ে সে যেন জীবনের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে; খেয়ে ঘুমিয়ে কিছু না-ক'রে মোটা হ'য়ে গেছে একটু; হয়তো বা একটু ভোঁতা। তার মুখের ভাবটি কেমন ঝিমোনো, যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলো; তার হাসি তার ঠোঁটের রেখা ছাড়িয়ে সারা মুখে ছড়াতে পারে না; তার বড়ো-বড়ো চোখ দুটি যেন কুয়োর জলের মতো নিশ্চল। আস্তে চলে, আস্তে কথা বলে। মা যা-কিছু বলেন সবই করে সে; সাজে, বেড়াতে যায়, ঘরের কাজ করে; কিন্তু ঐ ঝাপসা, ঝিমোনো, উদাস ভাবটি কখনোই যেন কাটাতে পারে না। একদিন মা জানতে পারলেন কাজলের শরীর ভালো যাচ্ছে না; মাথা ধরে, ভালো ঘুম হয় না রাত্রে। ব্যস্ত হ'য়ে ডাক্তার ডাকলেন।

৩

কিছু মনে করবেন না, আমি আর-একটু জিন নিচ্ছি। আপনি? এবারেও না? এক ফোঁটা সিন্‌ৎসানো? কী বললেন—বেলা হ'লো? এমন আর বেলা কী—বারোটাও বাজেনি। আর বেলা হ'লেই বা কী এসে যাচ্ছে বলুন। কোনো কাজ তো নেই। আপনি এখানে বেড়াতে এসেছেন, আর আমি—আমি কিছুই করি না, কোথাও যাই না, একা থাকি। আপনাকে হোটেলে ফিরতে হবে? কেন বলুন তো? তা শুনুন, আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে যান না। প্লীজ। না, না, অসুবিধে কেন—কিচ্ছু অসুবিধে নেই। আমি সবই সুবিধে ক'রে নিয়েছি: একটা মানুষের জন্য দশটা চাকর, এই বাড়ি, বাগান, গোলাপফুল, অ্যালসেশান কুকুর। আর নেলির সম্পত্তি।...আপনি রাজি তাহ'লে? থ্যাঙ্কস। থ্যাঙ্কস এ লট। সত্যি খুব ভালো লাগবে আমার। আপনি ঢাকায় ছিলেন, আপনি আমারই বয়সী, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি সমজদার, দরদী। আসুন, কথা বলা যাক। আরাম ক'রে বসুন, বেশ হাত-পা ছড়িয়ে। পর্দাটা একটু টেনে দিই বরং, বাইরে রোদ্দুরটা কড়া হ'য়ে উঠছে। আচ্ছা, অন্য একটা জিনিশ দিই আপনাকে—চুমুক দিয়ে দেখুন, কেমন লাগে। ভালো না-লাগলে ফেলে দেবেন। অ্যানিস, মৌরিগন্ধী মদ।—এ-সব কোথায় পাই? আরে মশাই, জোগাড় ক'রে দেবার লোক আছে। অন্য একটা জিনিশও চাই আমার, রোজ রাত্রে। রাত্রে ভয় করে আমার, জানেন। দু-জোড়া অ্যালসেশান পুষি, বাঘের মতো দেখতে, সিংহের মতো গর্জন। সারাদিন খাঁচায় বন্ধ থাকে তারা, অন্ধকারে, সারাদিনে একবার খায়, রাত্রে ছেড়ে দিই। কোনো চোর ডাকাত খুনে গুণ্ডার সাধ্যি নেই আমাকে তাক করে। তবু—কুকুর তো জন্তু, তার আর আমার জগৎ তো এক নয়। রাত্রে আমার একা লাগে জানেন, বড্ড একা। তখন একজন মানুষ চাই আমি, একজন সঙ্গী—সঙ্গিনী। তার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোবো, তার বুকে মুখ চেপে ঘুমোবো। এক উষ্ণ শরীর, নিশ্বাসের তালে উঠছে পড়ছে,

জীবন্ত—তার স্পর্শে আমার ভয় কেটে যায়। ভাগ্যিশ স্ত্রীলোক আছে পৃথিবীতে। ভাগ্যিশ তারা সকলেই কুসংস্কারের ঢিপি নয়।—আপনি যেন চমকে উঠলেন কথাটা শুনে? আরে মশাই ওতে কী আছে, আমি তো জোর করছি না কারো ওপর। তারা স্বেচ্ছায় আসে, ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে চ'লে যায়। পরিষ্কার দেনা-পাওনা, ঝামেলা নেই। যেমন আমরা অসুখ করলে ডাক্তারে ওষুধে খরচ করি, এও তেমনি। কেউ-কেউ ঘুমোবার জন্য ওষুধ খায় রোজ—তেমনি আমার পক্ষে, এটা। না-হ'লে চলে না।…অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন এই বুড়ো বয়সে—? ঐ তো, আপনি দেখছি সবগুলো পুরোনো কুসংস্কার এখনো কাটাতে পারেননি। যৌবনে ব্রহ্মচর্য চলে, তখন জীবন এমন চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে যে দু-এক দফা বাদ পড়লেও কিছু এসে যায় না; কিন্তু বেলা যখন পড়ন্ত, যখন ভীষণ লম্বা রাতগুলো বুকের ওপর পাথরের মতো ভারি, তখন কী ক'রে নিশ্বাস নেয়া যায় বলুন, যদি না পাশে থাকে অন্য কোনো শরীর—প্রাণ নিয়ে, স্পর্শ নিয়ে, জন্তুর কোমলতা নিয়ে? আর তাছাড়া—একটা বহুকালের অভ্যেস আমার, হঠাৎ ছেড়েই বা দেবো কেন? অনেক অভ্যেস নিজেরাই ছেড়ে যায় আমাদের, যেগুলো বিশ্বস্তভাবে টিকে থাকে শেষ পর্যন্ত, আমাদের শরীরের মরণ-দশাকে পরোয়া না-ক'রে, সেগুলোর মতো সতীলক্ষ্মী আর কী আছে?—আজ্ঞে? দ্বিতীয়বার কেন বিয়ে করিনি? হাসালেন মশাই! শুনুন তাহ'লে, একটা সাফ কথা বলি আপনাকে। আমার মনে হয় এ-ই ভালো, এই নগদ টাকার সম্পর্ক, ঝাড়ঝাপটা, কোনো জের টানতে হয় না। যদি আমাদের জীবন হয় শুধু পর-পর মুহূর্ত, সারি-সারি জোনাকি, অসংবদ্ধ, অর্থহীন—তাহ'লে কি আজকের ব্যাপারে আগামী কালকে রঙিন বা কালো ক'রে তোলার কোনো মানে হয়? আপনি একমত নন? আপনি আইডিয়েলিস্ট? রোমান্টিক? কিন্তু আপনিই বলুন, এই যাকে আমরা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বলি, তারও পেছনে কি টাকা নেই? তোমার টাকা আমার হোক, আমার দেহ তোমার হোক: এই হ'লো আসল বিয়ের মন্ত্র। এরই ওপর দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরা। একটু রকমফেরও হয় কখনো-কখনো: আমার টাকা তোমার হোক, তোমার টাকা আমার হোক। যেমন আমার বেলায় হয়েছিলো। আরে মশাই, আই. সি. এস. চাকুরে না-হ'লে আম কি রতনদাস ব্রোকারের মেয়ের টিকি ছুঁতে পারতুম!

মস্ত কারবারি লোক, বম্বাইতে একডাকে চেনে সবাই। হ্যাঁ, প্রেমে পড়েছিলুম বইকি। কিন্তু প্রেমে পড়া সম্ভব হয়েছিলো। মালাবার হিল্‌-এর নলিনী ব্রোকারের সঙ্গে। মনে-মনে তৈরি ক'রে নিয়েছিলুম লোকেরা যাকে প্রেম বলে। তাকেও বোঝাতে পেরেছিলুম সে আমার প্রেমে পড়েছে। কয়েক দিন মেলামেশার পরেই। ইচ্ছে করলে কী না পারে মানুষ? আমাদের ইচ্ছে, আমাদের বুদ্ধি: সাংঘাতিক যন্ত্র সব। বিয়ে তো করবোই, তাহ'লে নেলিকেই করা যাক না। রূপ আছে দেখতে পাচ্ছি, বেশ নরম-তরম স্বভাব, একেবারে কোনো গুণ নেই তা হ'তে পারে না। অন্তত বাড়ির শোভা হবে, অঙ্গের ভূষণ হবে পার্টিতে। আর রতনদাসের টাকা। এর চেয়ে ভালো কোথায় পাবো? ক-টাই বা ধনীকন্যা আছে সারা দেশে। তাছাড়া ঘুরে-ঘুরে কোর্টশিপ করার সময় নেই আমার, চাকরিতে যোগ দিতে হবে শিগগিরই। বড়ো ক্লান্তিকর ব্যাপার, এই কোর্টশিপ। এখানে যাও, সেখানে যাও, মিটিমিটি হাসি, খুচরো কথা, উঠে দাঁড়াও, টান হ'য়ে বোসো, কোলের ওপর প্লেট নিয়ে শব্দ না-ক'রে ডালমুট খাও খুঁটে-খুঁটে—ন্যাকামি, সময় নষ্ট। আসলে সব বিয়েই পাতানো বিয়ে, বানানো বিয়ে। হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে একে, একেই ধ'রে ফেলা যাক। আর, বিয়ে করবো স্থির করামাত্র প্রেমের সমীরণ বইতে লাগলো আমার মনে। সহজেই আমার শিকার হ'লো নেলি।

কিন্তু একটা বিষয়ে আমার হিশেবে ভুল হয়েছিলো। বিয়ের পরে যত দিন যায়, তত দেখি নেলি আমাকে সত্যি ভালোবাসছে। ভাবটা যেন ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্‌। আমার হাসি পায়, মনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বিরক্তি চুলকোনির মতো গজিয়ে ওঠে। আমি যা-কিছু বলি তাতেই সে মুগ্ধ, সব বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত, আমাকে সুখী করার জন্য, খুশি করার জন্য ঘর সাজায়, দেহ সাজায়, নতুন-নতুন খাবার তৈরি করায় বাবুর্চিকে দিয়ে। আর অত রূপ আর ঐশ্বর্য নিয়েও অমন সরল, করুণ, অসহায় ভঙ্গি তার—সত্যি যেন লতার মতো পেঁচিয়ে থাকতে চায় আমাকে, আমার আশ্রয় ছাড়া একদিনও সে বাঁচবে না। আশ্চর্য উল্টোপাল্টা জিনিশ মানুষের মধ্যে থাকে মশাই। দেখুন না, এই নেলি—ছেলেবেলায় স্কুলে পড়েছে সুইৎসার্লাণ্ডে, কত রকম লোক দেখেছে বাচ্চা বয়স থেকে, তার বাবার বাড়ির এক-একটা পার্টিতে বম্বাইয়ের মাস্তান লোকেরা কেউ বাদ যায় না, কত ফ্যাশন জানে, কতগুলো

ভাষা বলতে পারে—অথচ তার মন, তার চিন্তা-ভাবনা, এগুলো এখনো ছেলেমানুষির স্তরে প'ড়ে আছে, তার ভালোত্বের ধরনটা যেন বাংলাদেশের গ্রাম্য বালিকার মতো, অনেক-কিছু জানে না ব'লেই সে সহজে সব বিশ্বাস করে। পরে আমি বুঝেছিলাম যে আমাদের অনেক ধনী পরিবারের এটাই ধরন, বাইরে যেমন চটকদার, ভেতরটা তেমনি সনাতনী। মালাবার হিল্-এ রতনদাসের বাড়িতে আছে অটোম্যাটিক লিফট, ঘরে-ঘরে টেলিফোন, কিন্তু মেয়েকে মানুষ করেছেন এমনভাবে যাতে কোনো নতুন চিন্তার ছোঁয়া না লাগে। নেলি ফরাশি জানে, অথচ মোপাসাঁর কোনো গল্প পড়েনি, আনাতোল ফ্রাঁসের পাতা ওল্টায়নি, এ-কথা শুনে প্রথমে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম বইয়ের জগতে ঘোরাঘুরি করার অভ্যেসটাই তার হয়নি কখনো। স্কুলে-পড়া লামারতিনের লাইন এখনো মনে আছে তার, দোদের গল্পও ভোলেনি; কিন্তু ঐটুকু যে ভূমিকা মাত্র, এক বিশাল জটিল মহাদেশের দিকে প্রথম পদক্ষেপ, তা সে জানে না, হয়তো ঐ নানা দেশের ধনীকন্যাদের জন্য স্থাপিত রোমান ক্যাথলিক স্কুলে কেউ তাকে তা ব'লেও দেয়নি। বাড়িতেও না। মফস্বলে থাকি আমরা, নেলির হাতে অনন্ত অবসর—সে তা কাটায় মাঝে-মাঝে টুংটাং পিয়ানো বাজিয়ে, মাঝে-মাঝে প্যাস্টেলে ছবি এঁকে, আর রাজ্যের ছবিওলা মেয়েলি পত্রিকার পাতা উল্টে। লণ্ডন থেকে, প্যারিস থেকে, ন্যুয়র্ক থেকে সে আনায় ও-সব ফ্যাশনের পত্রিকা, ঘরকন্নার পত্রিকা, বাগান করার পত্রিকা, রান্নার বই। একজন সুখী, ধনী, বিবাহিত মহিলার পক্ষে আদর্শ জীবন বলতে এটাই বোঝায়, এই শিক্ষাই তার মা-র কাছে সে পেয়েছে। একদিকে এই ফ্যাশনের জৌলুশ, বাথরুমে বিপুল সরঞ্জাম, ড্রেসিংটেবিলে অগুনতি শিশি-কৌটো, আর-একদিকে তার সরলতা, যাকে প্রায় অশিক্ষা বলা যায়, আমি তার স্বামী হয়েছি ব'লেই অন্ধ আস্থা আমার ওপর—যেন সত্যি সে আমাকে তার সমস্ত হৃদয় দান ক'রে ব'সে আছে, আমাকে আঁকড়ে আছে তার বালিকা-মনের সবটুকু ক্ষীণ ও দুরন্ত শক্তি দিয়ে। আমার দম আটকে আসে তার ভালোবাসায়; আমার মনে প'ড়ে যায় ঢাকার কথা, যখন কোনো রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেরি হ'লে, আমি দেখতাম মা লণ্ঠন জ্বেলে না-খেয়ে ব'সে আছেন জানলার ধারে, ঠাকুমা বিছানা ছেড়ে মালা জপছেন চৌকাঠের কাছে, বাবাও ঘুমোননি। আর

শুধু আমারই জন্য নয়—আমার দুই বোন, জামাইবাবু, ফটিক-মামা, কাজল-মামি, সকলের জন্যই এই ব্যাকুলতা তাঁদের, আমার মা যেন সহস্র দিকে সহস্র বাহু বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের বাঁচাবার জন্য; রোগ, জরা, দারিদ্র্য—তাঁর কাছে এ-সবের চেয়েও অনেক বেশি কষ্টের ছিলো কোনো প্রিয় মুখের অদর্শন, যে-কষ্ট, জীবনের সাধারণ নিয়ম অনুসারে, রোগের চেয়ে অনিবার্য, দারিদ্র্যের চেয়ে প্রতিকারহীন। আমি তখন থেকেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, কিন্তু নেলিকে তা কেমন ক'রে বোঝাই? তাই ব'লে এমন নয় যে আমি কখনো ভালোবাসতে চাইনি। চেয়েছিলাম, পারিনি। তাই আমার বিদ্রোহ।

আপনি যা ভাবছেন তা নয়, আমি কাজলের প্রেমে পড়িনি। বা হয়তো পড়েছিলাম। কোনো-এক সময়ে, কোনো-একদিন, কোনো-এক রাত্রে;—কিন্তু সেটা ছিলো অন্য এক উত্তপ্ত প্রেমপিণ্ড থেকে ছিটকে-পড়া উল্কা। বা হয়তো একের ঋণ অন্যের কাছে শোধ করেছিলুম—ঠিক জানি না। সেই পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার আমি তো আর নেই, কেমন ক'রে বলবো? ধ'রে নিন এই 'আমি' আসলে আমি নই, অন্য কেউ—এক যুবক, আপনার সঙ্গে একই বছরে যে জন্মেছিলো, ছিলো একই শহরে, একই পাড়ায়, একই সময়ে। কিন্তু আপনার দেখছি অনেক-কিছুই মনে নেই, আমি কি আপনাকে মনে করিয়ে দেবো? আপনি তো দেখেছিলেন কাজলকে; তার সুন্দর ঠোঁট, যার ফাঁক দিয়ে কথা বেশি বেরোতো না; তার বড়ো-বড়ো চোখ, যাতে নিষ্প্রাণ আস্তরণের তলায় লুকিয়ে ছিলো জল আর আগুন—তাও কি মনে নেই আপনার?···কী কাণ্ড দেখুন, কেমন ভুল হ'লো হঠাৎ, মুহূর্তের জন্য মনে হ'লো আপনি সবই জানেন, সকলকেই দেখেছিলেন—শুধু আর-একবার শুনতে চাচ্ছেন আমার মুখে। না—আমার মা যা ভেবে উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তা ঘটেনি; কাজলের গর্ভে পত্নীপ্রেমের নিদর্শনস্বরূপ সন্তান রেখে যাননি ফটিক-মামা; ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বললেন—স্নায়বিক গোলযোগ। অনেকগুলো ওষুধ লিখে দিলেন ডাক্তার, কিন্তু মা-বাবা দু-জনেই হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী, তাঁদের ধারণা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ বড্ড কড়া, আখেরে তাতে ক্ষতি হয় শরীরের, বা এক অসুখ সারাতে গিয়ে আর-একটার সৃষ্টি করে। তাছাড়া, যা দাম! ভেবে-চিন্তে অনাদি

বর্ধনকে ডাকলেন তাঁরা। অনাদি বর্ধন—আমার বাবার কোনো-এক রকম আত্মীয়—অন্তত তা-ই শুনেছি আমি—ছেলেবেলায় গ্রামে থাকতে কিছুটা নাকি চেনাশোনাও ছিলো তাঁদের। আত্মীয়তার রহস্য-উদ্‌ঘাটনে আমার বাবাকে বলা যায় একটি ছোটোখাটো আইনস্টাইন: মাঝে-মাঝেই এমন হয় যে কোনো অচেনা লোকের নাম আর অল্প একটু পরিচয় শোনামাত্র তিনি ব'লে দেন সে অমুকের মামাতো বোনের দেওর, বা তমুকের পিসেমশাইয়ের ভাইঝি। ও-বিষয়ে যেমন তীক্ষ্ণ তাঁর স্মরণশক্তি, তেমনি ক্লান্তিহীন তাঁর উৎসাহ, কোনো নাম ভোলেন না, কার ছেলের সঙ্গে কার মেয়ের বিয়ে হয়েছিলো, কে কোথায় থাকে, কী কর্ম করে, ছেলেপুলে ক-টি, কার ঠাকুর্দা কোন অসুখে মরেছিলেন—এই ধরনের তথ্যের একটি বিপুল ভাণ্ডার হ'লো তাঁর মস্তিষ্ক; অথচ শুনি তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ইতিহাসে ফেল করেন একবার, পরের বারে কান ঘেঁষে উৎরে যান। শুধু তা-ই নয়; যে-সব মানুষকে তিনি চোখে দ্যাখেননি কখনো, বা শুধু চোখেই দেখেছেন, বা বড়োজোর একদিন কোনো বিয়ে-বাড়িতে পাঁচ মিনিট কথা বলেছেন যাদের সঙ্গে, তাদের প্রতিও একটু মমতা অনুভব করেন আমার বাবা, তারা ধূসর, সুদূর, অস্পষ্টভাবে তাঁর আত্মীয় ব'লেই। কিন্তু অনাদি বর্ধনের সঙ্গে বাবার আত্মীয়তাটা বোধহয় চার-পাঁচ ডিগ্রি দূরে সরানো, তাছাড়া অন্য ব্যবধানও আছে। বাবার মতো চাকুরিজীবী নন অনাদিবাবু, একজন নামজাদা ডাক্তার, ঢাকার একমাত্র এম. বি. পাশ হোমিওপ্যাথ, ব্যস্ত মানুষ। ডাক্তারি পেশায় তাঁর কৃতিত্বের একটি প্রমাণ হ'লো তাঁর হলদে-আর-সবুজ রঙের এক-ঘোড়ায় টানা পাল্কি-গাড়িটা, একটাই ঘোড়া, কিন্তু জাতে উঁচু, টগবগে, ঢাকার ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়াগুলোর মতো মিরকুট্টে নয়। মস্ত কালো ঘোড়ার পেছনে হলদে-সবুজ গাড়িটা আমার মনে কিছুটা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে, কিন্তু বাবা বলেন, 'অনাদির চার-ঘোড়ায় টানা ব্রুহামে চ'ড়ে বেড়াবার কথা—অবস্থার ফেরে কী না হয়? ওলগঞ্জের ছ-আনি বাড়ির ছেলে, সে কিনা আজ হোমিওপ্যাথি ক'রে খাচ্ছে!' (ঐ 'ছ-আনি' কথাটার মানে বুঝতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো।) ছ-আনির জমিদারি চাল বাবা কিছুটা দেখেছিলেন তাঁর ছেলেবেলায়, সে নাকি এলাহি কাণ্ডকারখানা; কিন্তু গুপী বর্ধনের সাত ছেলের এগারো বৌয়ের একুশটি পুত্রের মধ্যে পত্নীদের

অকালমৃত্যুর হার মনে হয় কিছু উঁচু ছিলো ও-বাড়িতে। ভাগ-বাঁটোয়ারা হ'য়ে-হ'য়ে এখন সব ছত্রখান, তার ওপর অনাদির বাবা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল আর খামখেয়ালি ছিলেন ব'লে অনাদির ভাগে জুটলো শুধু ঝাড়লণ্ঠন, কিংখাবের পোশাক, কাশ্মীরি গালিচা, অনেকগুলো পিস্তল-বন্দুক, অনেকগুলো তানপুরা, সেতার, বাঁয়া-তবলা—এমনি সব আজেবাজে জিনিশ, এমনকি তার মা-র গয়নাগাঁটিও নাকি বেশির ভাগ বেহাত হ'য়ে গিয়েছিলো, বা তার বাবাই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমার বাবার এ-সব কথায় অনাদিবাবুর প্রতি একটু অবজ্ঞা ঝরে পড়ে (যদিও তাঁর উপার্জন হয়তো আমার বাবার তিন-ডবল বা চার-ডবল)—যেহেতু তিনি জমিদার-ঘরের ছেলে হ'য়েও খেটে খাচ্ছেন, এমনকি এম. বি. পাশ ক'রেও বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধি আর পঞ্চান্ন বছরে পেনশন দ্বারা মহিমান্বিত সরকারি চাকরিতে ঢুকে পড়ার মতো সুবুদ্ধি তাঁর হয়নি।

বাবার মুখে আরো শুনেছি যে ছেলেবেলা থেকেই অনাদিবাবু একটু একগুঁয়ে, পৈতৃক খামখেয়ালিপনা পুরোমাত্রায় ছিলো তাঁর, আর ছিলো গানের বাতিক, শিকারের শখ। সুন্দরবনে হরিণ, মালদতে বুনো হাঁস, পদ্মার চরে বক ডাহুক বটের—একবার নাকি বিরাট একটা কুমিরও মেরেছিলেন গুলি ক'রে, চামড়াটা তিনশো টাকায় বিক্রি হয়েছিলো। আর কোথাও কোনো গান-বাজনার গন্ধ পেলে তো সব কাজ ফেলে ছুটে যাওয়া চাই। এই সব খেয়ালের জন্য তাঁর ডাক্তারি পড়া খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলছিলো, সাত বছরের মুখে পাশ ক'রে বেরিয়ে এক ফার্মেসি খুলে বসলেন ঢাকায়, হঠাৎ চোখের নেশায় বিয়ে ক'রে ফেললেন এক সাধারণ গেরস্ত ঘরের কালো মেয়েকে। কিছুদিন চললো মন্দ না—ডাক্তারি, শীতকালে শিকার, মাঝে-মাঝে কোনো ওস্তাদের গান শোনার জন্য কলকাতায় ছোটা ; কিন্তু জর্মান যুদ্ধের সময় দেশে তাঁর মন টিকলো না ; ফার্মেসি আর উঠতি পসার ফেলে চ'লে গেলেন যুদ্ধের ডাক্তার হ'য়ে মেসোপটেমিয়ায়। ফিরে এসে 'ক্যাপ্টেন বর্ধন' নাম নিয়ে পসার আরো জমাতে পারতেন, কিন্তু আবার কী খেয়াল হ'লো—জলের দরে ফার্মেসিটা বেচে দিয়ে শুরু করলেন হোমিওপ্যাথি। এখন আবার গান্ধীভক্ত হয়েছেন, স্যুট-বুট ছেড়ে খদ্দরের ধুতি প'রে রোগী দেখতে বেরোন, শিকার করাও ছেড়ে দিয়েছেন বোধহয় সেটা 'অহিংসা'র বিরোধী ব'লে। মেয়ের গান নিয়েই এখন মশগুল।

অনাদিবাবুর সঙ্গে আমাদের বাড়ির মুখচেনা ছিলো কিন্তু যাওয়া-আসা ছিলো না ; ডাক্তার হিশেবেই কালেভদ্রে তাঁকে ডাকেন আমার বাবা, যখন অসুখটা মনে হয় গোলমেলে। সেই কবেকার পুরোনো সূত্রে বাবার কাছে ফী নেন না তিনি, সে-জন্যে তাঁকে ঘন-ঘন ডাকা সম্ভব হয় না। চার বছর আগে মিনুর প্যারাটাইফয়েড সারিয়েছিলেন, তারপর এই এলেন—কাজলের জন্য। এবারে কিন্তু রোগিণীকে বেশিক্ষণ পরীক্ষা করলেন না অনাদিবাবু, স্টেথিস্কোপ কানে তুলেই নামিয়ে রাখলেন। অনিদ্রা ইত্যাদি উপসর্গের কথা শুনলেন ধৈর্য ধ'রে, তারপর বেরিয়ে এসে বাবাকে বললেন, 'আপনার শালার বৌ? এঁর স্বামী কোথায়?…কলকাতায়? তা এঁকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিন, তাহ'লেই অসুখ সেরে যাবে।' আমার মা মুখে আধখানা ঘোমটা টেনে সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে বললেন, 'ফটিক আসবে শিগগিরই, বৌ নিয়ে যাবে। তা কোনো ওষুধপত্র—' 'ওষুধ চান? কী দরকার?…আচ্ছা, কাউকে পাঠিয়ে দেবেন বিকেলে।' যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে থামলেন অনাদি-বাবু। 'রণজিৎ না? বাঃ, চেহারাটা বেশ বাগিয়েছো তো—একেবারে নব্য-যুবক।' (আমার মা-র মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হ'লো, কেননা আমি 'রোগা টিনটিনে' ব'লে তাঁর আক্ষেপের অন্ত নেই।) 'শুনলাম ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছো ইংরেজি অনার্সে? বাঃ! শেক্সপীয়রের ক-টা নাটক পড়েছো?' তারপর আবার মা-বাবার দিকে পেছন ফিরে, তাঁর জন্য অপেক্ষমান রোগীদের ভুলে গিয়ে, আমার সঙ্গেই তিনি কথা চালালেন খানিকক্ষণ। যখন দেখলেন আমি গিবন পড়িনি, বার্ক পড়িনি, আর 'প্যারাডাইজ় লস্ট'-এর প্রথম পঁচিশ লাইনও আমার মুখস্থ নেই, তখন আজকালকার শিক্ষার ওপরেই তাঁর অশ্রদ্ধা জ'ন্মে গেলো। 'তোমরা তাহ'লে সব ফাঁকি দিয়ে পাশ করছো আজকাল—অ্যাঁ? আচ্ছা, এসো একদিন, কথা হবে।' বিকেলবেলা আমিই গেলাম কাজল-মামির ওষুধ আনতে ; যেন অনেক দিনের চেনা, এমনিভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন অনাদিবাবু, স্ত্রীর সঙ্গে, মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, আমাকে চা সন্দেশ খাওয়ালেন তাঁরা। তিন দিন পরে আবার আমাকে যেতে হ'লো ওষুধ আনতে, সেদিন অনাদিবাবু হালকাভাবে বললেন, 'রোববারে কয়েকজন আসছেন মিতুর গান শুনতে ; তুমি আসবে নাকি, রঞ্জু?' আমি গেলাম, গান শুনে চ'লে এলাম। এর দিন-পনেরো পর আমাদের বাড়িসুদ্ধু সকলের

নিমন্ত্রণ হ'লো মিতুর জন্মদিনে। ততদিনে, আমার মা-র ব্যাকুল চিঠি পেয়ে, ফটিক-মামাও এসে গেছেন—প্রায় পাঁচ মাস পরে এলেন তিনি এবারে। বেশি চিঠিপত্র লেখার অভ্যেস নেই তাঁর, তিনি ঠিক কী করছেন তা আমাদের কাছে অস্পষ্ট, এদিকে দেশে ফিরেছেন তাও এক বছর হ'তে চললো। প্রথমে শুনেছিলাম, তিনি লোহার কারখানা খুলেছেন হাওড়ায়, কিছুদিন পরে জানা গেলো ইলেকট্রিক বালব তৈরি করার জন্য শেয়ার বিক্রির চেষ্টায় আছেন। আমি, যে মনে-মনে ভাবছিলো ফটিক-মামা হয়তো পদ্মার ওপরে ব্রিজ বেঁধে দেবেন যাতে ঢাকায় ট্রেনে চেপে আট ঘণ্টা পরে কলকাতায় নামা যায়, সেই আমার মনটা বেশ দ'মে যাচ্ছিলো, ফটিকের কথা উঠলে বাবার কপালেও রেখা পড়তে দেখি মাঝে-মাঝে। কিন্তু মামাকে দেখামাত্র আমার মা অন্য কারণে আঁৎকে উঠলেন—'এ কী ফটিক, এ কী চেহারা হয়েছে তোর?' ততদিনে মামার বিলেতি চেকনাই ঝ'রে গেছে অবশ্য, কিন্তু দুর্গাপ্রতিমার অসুরের মতো তাঁর ঐ পেশীবহুল স্বাস্থ্যটি কোথায় যে টোল খেয়েছে তা অন্য কারো চোখে মালুম হ'লো না। মামা হেসে বললেন, 'দিদি, তুমি দেখছি সকলেরই অসুখ বাধাতে ভালবাসো। কই, কাজলকে তো দিব্যি মোটাসোটা দেখছি। আমারও কিছু হয়নি।' কিন্তু কাজলের অসুখের ভাবনা ততক্ষণে উবে গেছে মা-র মন থেকে (অনাদিবাবুর ওষুধে বোধহয় উপকারও হয়েছিল তার); ফটিক রোগা হ'য়ে গেছে, ফটিকের শরীর ভালো যাচ্ছে না—এ ছাড়া মা-র মুখে আর কথা নেই। এ-জন্যে অবশ্য আর ডাক্তার ডাকা হ'লো না; মা নিজেই ডাইগনসিস করলেন, প্রেস্ক্রিপশনও তাঁর। ও-সব চাকর-বাকরের রান্না খেলে শরীর টিকবে কী ক'রে? কলকাতায় কি ছাই খাঁটি দুধ পাওয়া যায়, না কি মাছই তেমন স্বচ্ছন্দ! অতএব বাবা বিপুল পরিমাণে বাজার ক'রে আনছেন (হয়তো ধার করতে হচ্ছে), ততোধিক বিপুল বেগে রান্না করছেন মা, আর মাঝে-মাঝে বলছেন, 'এই মাছ-পাতুরিটা কাজল করেছে। মুর্গি-রোস্ট কিন্তু কাজলের রান্না আজ। ঐ কাঁচা টকটা চেখে দেখিস ফটিক, কাজলের তৈরি।' আর কখনো বা নিরিবিলি সময়ে বলেন, 'ফটিক, কাজলকে এবার নিয়ে যাবি নাকি? কিচ্ছু ভাবিস না, আমি তোদের সঙ্গে যাবো, সংসার গুছিয়ে দিয়ে চ'লে আসবো। কেমন ফ্ল্যাট রে তোর? দু-খানা ঘর? তা ওর বেশি আর লাগবেই বা কিসে? পাঁচতলায়? বাঃ, অত উঁচুতে যখন নিশ্চয়ই খুব আলো-হাওয়া?

দেখছিস তো, কাজল চমৎকার রাঁধতে শিখেছে আজকাল; একটা ছোকরা চাকর কি ঠিকে ঝি রেখে নিস, দিব্যি চ'লে যাবে।' 'আঃ দিদি, থামো তো।' ব'লে ফটিক-মামা সাত-পদের মধ্যাহ্নভোজনের পরে দিবানিদ্রায় তলিয়ে যান। এইভাবে চলছে।

৪

আচ্ছা, আজকাল নাকি আর কইমাছ পাওয়া যায় না বাংলাদেশে—মানে, পশ্চিম বাংলায়? মাগুরও না? অ্যাঁ—ইলিশ পর্যন্ত স্বপ্ন হ'য়ে গেছে? হাসালেন আপনি।...তা ভালো, আমরা সব আলালের ঘরের দুলাল হ'য়ে ছিলুম তো, এবারে একটু শিক্ষা হ'লে ক্ষতি নেই। নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে খাওয়া নিয়ে কী-রকম হুলুস্থুল ছিলো ঢাকায়—যারা মোটামুটি মধ্যবিত্ত তাদের বাড়িতেও—কত ফেলাছড়া, সময় নষ্ট, হৈ-চৈ? এক-একটা ছোটোখাটো নেমন্তন্নেও শুধু পাতে যা প'ড়ে থাকতো তা ভেবে হয়তো সেই সব নিমন্ত্রণকর্তারই চোখে জল আসে আজ, বুড়ো বয়সে কোথাও কোনো গান্ধী-কলোনি বা সুভাষ-পল্লীর চালাঘরে ব'সে। ধরুন না আমার মামার অনারে ভোজের পাল্লা—ফটিকের 'শরীর সারাবার' জন্য যজ্ঞির অয়োজন। শুরু হ'লো উচ্ছে-আর-মৌরলামাছের তেতো চচ্চড়ি দিয়ে, তারপর ডালের সঙ্গে পটলভাজা আর মুড়মুড়ে কাচকি-মাছের ঝুড়ি, তারপর কুচকুচে কালো কইমাছ আবির্ভূত হলেন, টুকটুকে লালতেলের বিছানায় ফুলকপির বালিশের ওপর শোয়ানো—এক-একটা এত বড়ো যে কাঁসারিতে প্রায় ধরে না। আবার কোনোদিন হয়তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইলিশ: ভাজা, সর্ষেতে ভাপানো, কলাপাতায় পোড়া-পোড়া পাতুরি, কচি কুমড়োর সঙ্গে কালোজিরের ঝোল, ল্যাজা-মুড়োর সদ্গতি হ'লো কাঁচালঙ্কা-ছিটানো লেবুর রসের পাৎলা অম্বলে। কোনোদিন রুইমাছের মুড়ো দিয়ে রাঁধা মুগডাল, নারকোল-চিংড়ি, চিতলের পেটি। কোনোদিন ধনেপাতা আর ডালের বড়ির সুগন্ধে মাখা বিশাল পাবতা, কোনোদিন আদা-পেঁয়াজে খণ্ড-খণ্ড আলুর সঙ্গে মাংসালো মাগুর। আসছে লালবাগের মালাইওলা দই, কালাচাঁদের প্রাণহরা সন্দেশ, ছানার অমৃতি। সকালে চায়ের সঙ্গে মা থরে-থরে সাজান ডিম, টোস্ট-মাখন, তিন রকম জ্যাম, রসগোল্লা, ক্ষীরের মালপো; কোনোদিন বা ফুলকো লুচির সঙ্গে

চাক-চাক বেগুনভাজা আর কিসমিস-ছিটোনো মোহনভোগ ; আবার কোনো-দিন হয়তো কল্লু মিঞার খাস্তা বাখরখানি—যার সুগোল আকৃতির ওপরটি হ'লো ব্রাউন, হালকা, মুড়মুড়ে, আর তারপর যা স্তরে-স্তরে ক্রমশ হ'য়ে আসে মোলায়েম ও সারবান—আর সেই সঙ্গে স্নিগ্ধ পাস্তুয়া, আর নেহাৎ একটা 'কিছু-মিছু' হিশেবে চিনিতে রসানো চীনেবাদাম। তাছাড়া আমার ঠাকুমার নিরিমিষ রান্না—সে আবার অন্য এক জগৎ, মশাই, সেখানকার বাসিন্দারা ভারি বিনয়ী, ছেঁচকি ঘণ্ট শাক শুক্তো এই সব অনুজ্জ্বল নামে বিরাজ করে, কুমড়ো-বীচি লাউয়ের খোশার মতো ওঁচা জিনিশও সেখানে সম্মানিত। কিন্তু ঐ সব বিজ্ঞাপনহীন সৃষ্টি থেকে যা আস্বাদ বেরিয়ে আসে তা প্যারিসের সেরা রাঁধুনির কল্পনাতীত। যেমন রামধনুর সাতটাকে মিশিয়ে-মিশিয়ে অসংখ্য রং বের ক'রে আনেন চিত্রশিল্পীরা, তেমনি মাত্র তিনটে-চারটে মোটা আস্বাদের মধ্যেই জিভের জন্য বিপুল বৈচিত্র্য রচনা করেন আমার মা-ঠাকুমারা, সেই তাঁদের স্টুডিওতে, যার সরঞ্জাম অত্যন্ত মামুলি, আর পেছনে অর্থবলও নেই। কী ক'রে পারতেন? আপনি বলছেন ভালোবাসা? বঙ্গললনার বিখ্যাত স্নেহবৃত্তি? দুঃখিত, আপনার সঙ্গে একমত হ'তে পারছি না। খাটুনি, গাধা-খাটুনি—যে-উপায়ে যন্ত্রযুগের অনেক আগে মিশরী পিরামিড তৈরি হয়েছিলো, এও তা-ই। বলা যেতে পারে দাসপ্রথা। মেয়েদের দাসী ক'রে রাখলে অনেক বিষয়েই সুবিধে পুরুষের, তা তো বোঝেন। ভাবতে আমার এখন ভির্মি লাগে মশাই, মাথা ঘুরে যায়। আপনাকে বলবো কী—এত দেশে গিয়েছি, বিলাসিতাও ভোগ করেছি খানিকটা, কিন্তু খাওয়ার এমন ঘটাপটা আর কোথাও দেখিনি। কিন্তু কী অপব্যয় বলুন, কী অত্যাচার! ও-সব উঠে গেছে, আপদ গেছে।··· সত্যি কি উঠে গেছে একেবারে? আপনি জানেন, বাংলাদেশে কেউ কি আজকাল সর্ষে-ধনেপাতা-নারকোল মিশিয়ে কচুবাটা রাঁধতে জানে? শালুক ফুলের ডাটা দিয়ে খেঁসারি ডাল? কুচি-কুচি নিমপাতা-ভাজার সঙ্গে গিমার বড়া? কোনো বাড়িতে কাসুন্দি তৈরি হয়? তাহ'লে কি পুরোপুরি হারিয়ে গেলো এই ললিতকলা, জগতের সভ্যতায় বাঙালির বা বঙ্গনারীর এই বিশেষ অবদান?···আজ্ঞে? না, আমি বহুকাল বাংলার বাইরে, বহুকাল। একবার বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম, আর ফিরে যাইনি।

একেবারে যাইনি তা নয়, কিন্তু থাকিনি। ইচ্ছে ক'রেই থাকিনি, থাকতে ইচ্ছেও হয়নি। কিছু মনে করবেন না, আপনাদের সোনার বাংলায় আমার আর চিত্ত নেই। কর্তব্য সবই করেছি; পার্টিশনের পর বাবাকে বাড়ি কিনে দিয়েছি দমদমে, মাসে-মাসে টাকা পাঠিয়েছি, গিয়েছি মাঝে-মাঝে মা-বাবা-দিদির সঙ্গে দেখা করতে। ছোটো বোনকে ইকনমিক্স পড়তে লণ্ডনে পাঠিয়েছিলুম, এখন সে আমাদের এক এম্বাসির ফার্স্ট সেক্রেটারির স্ত্রী। যাকে বলে পরিবারকে টেনে তোলা, আমি তা করেছি বইকি। কিন্তু, সেই অনেক আগে—যেদিন চাঁদপাল ঘাট থেকে 'সিটি অব ক্যালকাটা' জাহাজ ধরেছিলুম, সেদিনই আমি মনে মনে বিদায় বলেছিলুম বাংলাদেশকে। ভালো করিনি? যাকে বলে সুবুদ্ধির কাজ? কলকাতার কী অবস্থা দেখছেন তো। যেন ম'রে যাচ্ছে শহরটা, বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাচ্ছে। না, ওটা কবিত্ব হ'লো—ডুবে যাচ্ছে নিজেরই নোংরায়, নর্দমায়, মাটির তলার বড়ো-বড়ো পাইপগুলো ফেটে গিয়ে একদিন ভাসিয়ে নেবে কলকাতাকে। আমি চাকরির জন্য বেছে নিয়েছিলুম সেণ্ট্রাল প্রভিন্স—মানে, মধ্যপ্রদেশ; তখনও বেশ নিরুপদ্রব ছিলো অঞ্চলটা। বৌ বেছে নিয়েছিলুম গুজরাটি। মেলামেশা ছিলো যাদের সঙ্গে তারা কেউ তামিল কেউ মরাঠী কেউ পঞ্জাবি, কেউ ইংরেজ—মানে সব 'ব্রাদার-অফিসার' আরকি, বা মিলিটারির হোমরাচোমরা—সেই সব লোক, যাদের চওড়া কাঁধে হেলান দিয়ে ভারতমাতা কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখছেন তো আমার জীবনটা কী-রকম আন্তঃপ্রাদেশিক (ঠিক হ'লো কি বাংলাটা?), কী-রকম আন্তর্জাতিক। তিন বছর পর-পর ফার্লো নিয়ে বিলেতে যাওয়া, রোম ভেনিস প্যারিস জেনিভায় বেড়ানো—চাকরিটা মন্দ ছিলো না তা মানতেই হবে।—আপনি হাসছেন? আপনার মনে প'ড়ে যাচ্ছে সরকারি চাকরির ওপর আমার ঘেন্না? ভাবছেন আমিও কেমন বোলচাল ভুলে খাঁচায় ঢুকে পড়েছিলুম? কী, জানেন—যেটা ঘেন্নার, ঠিক সেইটে করার মধ্যে বিশেষ একটা সুখ আছে—অদ্ভুত, অসাধারণ একটা স্বাদ—যেন নিজের ওপর দিয়ে একটা চমৎকার ঠাট্টা চালাচ্ছি—প্রহসন, যার দর্শক আমি, আবার অভিনেতাও আমি। যাকে বলে বেজায় রগড়, আমার পক্ষে চাকরিটা ছিলো একাধিক অর্থে তা-ই।

কখনো-কখনো কৌতুকটা অবশ্য একটু বেশি কড়া মনে হ'তো,

সরকারি কেষ্ট-বিষ্টুদের জীবন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলো কোথাও-কোথাও। চালাও গুলি নিরীহ লোকেদের ওপর, তারপর ভয়ে-ভয়ে থাকো কখন গুলিটা নিজেরই বুকে ফিরে আসে। জওহরলাল নেহরুর গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা লেখো।—বিশ্রী সব কাজ। আমি, মশাই, ও-সব হাঙ্গামার মধ্যে ছিলুম না কোনোদিন। জুডিশল লাইন বেছে নিয়েছিলুম। নিরাপদ মধ্যপ্রদেশে। জমিদারির মামলাও বেশি নেই সেখানে। জীবনখানা মন্দাক্রান্তা তালে কেটে যায়। শুধু একবার ভারি ফ্যাশাদে পড়েছিলুম এক খুনের আসামিকে নিয়ে। লোকটা নাকি তার বৌয়ের মাথায় লাঠি মেরেছিলো। বৌটাও এমন—এক বাড়িতে অক্কা। লোকটা ভয় পেয়ে পালিয়ে ছিলো জঙ্গলে, পুলিশ ধ'রে আনলো সেখান থেকে, চালান করলো। এইটুকু পুঁচকে একটা মানুষ, নিরক্ষর, দিন-মজুরি ক'রে পেট চালায়—রোজ এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ায় আর ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায় চারিদিকে, উকিলের জেরার উত্তরে যা বলে তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। লোকটা যেন বুঝতেই পারছে না কী হচ্ছে তাকে নিয়ে হঠাৎ—কেন তাকে আটকে রেখেছে, নিয়ে আসছে এই জমকালো দোতলা বাড়িটায়, আর কেনই বা এত সেপাই-সান্ত্রী লোকজন গুমগুম আওয়াজ, এ-সব কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। সে মনে রাখতে পারে না তার উকিলের পরামর্শ, জানে না যে এখানে তার জীবন নিয়ে খেলা হচ্ছে, এমন কথাও বললে না যে ঐ বাঁশের লাঠিটা তার নয়, তার বৌয়ের রক্তমাখা শাড়িটা দেখে হাঁউমাউ ক'রে কেঁদে উঠলো। নিশ্চয়ই সে মেরে ফেলতে চায়নি বৌটাকে, শুধু একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলো (যেমন আমরা অনেকেই চাই মাঝে-মাঝে)—নেহাৎ মূর্খ আর জংলি ব'লেই ওর চাইতে কোনো সুসভ্য উপায় খুঁজে পায়নি। বা এমনও হ'তে পারে যে হার্ট খারাপ ছিলো ওর বৌয়ের, হ'তে কি পারে না? কিন্তু ইংরেজের আইন, ব্যাপারটা পুরোপুরি কাল্‌পেবল হমিসাইড অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার, শতকরা একশো পরিমাণে প্রমাণ হ'য়ে যাচ্ছে—এ-অবস্থায় নিস্তার নেই কারো, যদি না অবশ্য হত্যাকারীটি হয় মাইকেল ও'ডায়ার বা এমনকি কোনো চা-বাগানের পিলে-ফাটানো সাহেব। আমি দেখছি জুরি ওকে অপরাধী ব'লে শাব্যস্ত করবেই, আর তখন—আমি কী করবো? লোকটা কি ফাঁসিকাঠে ঝুলে যাবে শেষ পর্যন্ত, আর ওর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা আমাকেই বের করতে হবে মুখ দিয়ে? না। না। না।

কিছুতেই না। কিছুতেই পারবো না আমি। আমার নিজেরই গলায় যেন ফাঁস লেগে যাচ্ছে, বাতাস নেই, সূর্য নিবে গেলো, অন্ধকার—আমাকে বাঁচাও! দেখছেন তো, আমার বিবেক কী সুকুমার, হৃদয়বৃত্তি কী কোমল। হ'লো কী জানেন? আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়লুম। হঠাৎ যেন একটা কান বন্ধ হ'য়ে গেলো। ভালো শুনতে পাই না। সিগারেট ধরাতে গিয়ে আঙুল কাঁপে। পিঠে একটা ব্যথা টের পাই সব সময়। স্বাস্থ্যের কারণে ছুটি নিতে হ'লো আমাকে। কাশ্মীরে গিয়ে শরীর সারলো। খুন অন্যায়, খুনিকে খুন করা তেমনি অন্যায়। আমি নির্বিরোধী। আমি অহিংস। হোক আইনের ওজুহাতে, যুদ্ধের ওজুহাতে—খুন কখনো ভালো হ'তে পারে না, এই হ'লো আমার মত। আমি ভালোকে ভালোবাসি, আমি ভালো হ'তে চাই।

কিন্তু মুশকিল কী জানেন? 'ভালো' বলতে সকলে এক জিনিশ বোঝে না। যেমন বুলবুল বলে, অবস্থাভেদে ভালোও আলাদা। বা তাকে তা-ই শেখানো হয়েছে, জপানো হয়েছে। আর অনাদিবাবুর মতে 'ভালো' মানে হ'লো সেই শেষ, পরম ফল, যার জন্য মানবসভ্যতা বহুকাল ধ'রে চেষ্টা করছে। আপনি কি অনাদিবাবুকে চিনতেন—মিতুর বাবা, খদ্দর-পরা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, অনাদি বর্ধন? আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি কখনো? ঐ এক অদ্ভুত মানুষ দেখেছিলুম, মশাই—অসাধারণ। লোকে তাঁকে বলে খামখেয়ালি, বাতিকগ্রস্ত, কিন্তু আমার তাঁকে মনে হ'লো জীবন্ত, উৎসাহী—সেই উৎসাহটা আশাতীতভাবে অনেকদিকে ছড়ানো : তাঁর মতো কথাবার্তা বলতে তখন পর্যন্ত অন্য কাউকে আমি শুনিনি। রুসো, টলস্টয়, থরো, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী—এই সব-কিছুর এক আশ্চর্য খিচুড়ি যেন রান্না হচ্ছে তাঁর মগজে; 'স্বাধীনতা'র অর্থ কী, স্বাস্থ্য কাকে বলে—এই ধরনের প্রশ্ন তাঁকে ভাবায়। তিনি বলেন, স্বাধীনতা মানে স্বাবলম্বিতা (শুধু ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ তাড়ানো নয়), আর স্বাবলম্বিতা আসলে একটি নৈতিক গুণ—অন্তত মানুষের পক্ষে। বনের পশুদের দেখতে মনে হয় স্বাবলম্বী, কিন্তু আসলে তারা প্রকৃতির আশ্রিত, প্রকৃতির দাস। মানুষকে অসহায় ক'রে পৃথিবীতে পাঠানো হয়, যেহেতু শুধু তারই আছে ইচ্ছাশক্তি, যা খাটিয়ে নিজেকে সে নিজের মনোমতো ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ভিতু আর দুর্বল; তাই প্রকৃতির শাসন থেকে অনেকখানি মুক্ত হ'য়েও সে অন্য শাসন চাপিয়ে দিয়েছে নিজের ওপর—

যার নাম গবর্মেন্ট, মনুসংহিতা, পীনাল কোড, ইত্যাদি। মানুষকে অর্জন করতে হবে সেই শক্তি, সেই সাহস, যাতে সে বোঝে যে স্বাবলম্বিতাই তার স্বাভাবিক অবস্থা, যাতে দিশি-বিদেশী যে-কোনোরকম সরকারের ওপর সর্বব্যাপারে নির্ভর করাটাকে তার মনে হয় আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর। প্রত্যেক মানুষ যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে, মাথার ওপরে বিরাট কোনো কর্তৃপক্ষ থাকবে না, তখন সকলেই এই সহজ কথাটা বুঝে নেবে যে একের স্বার্থ অন্যের সঙ্গে জড়িত, যে নিজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই অন্যের ক্ষতি করা চলে না। একমাত্র এই অবস্থাতেই মানুষ 'ভালো' হ'তে পারবে, 'সুখী' হ'তে পারবে—এই হ'লো অনাদিবাবুর ধারণা। 'যে ভালো সে সুখীও বটে—' অতএব অনাদিবাবুর আদর্শ জগতে মানুষে-মানুষে বিরোধ আর থাকবে না ('সকলেই সুখী হ'লে আর ঝগড়াঝাঁটির কারণ কী রইলো?') পরস্পরকে উৎপীড়ন করার বৃত্তিটাই তার ম'রে যাবে ধীরে-ধীরে—ধর্মোপদেশের ফলে নয়, ব্যবহারের অভাবে, যে-কারণে মানুষের ল্যাজ খ'সে পড়েছে, নখে আর ধার নেই, সেই একই কারণে। এই অবস্থায় পৌঁছতে হয়তো আরো বহুকাল লাগবে মানুষের—লক্ষ বছরও হ'তে পারে—কিন্তু মানুষ যদি ধ্বংস হ'তে না চায় তাহ'লে এ-ই তার ভবিষ্যৎ।

অনাদিবাবুর অন্য একটি ধারণা হ'লো যে মানুষ স্বভাবতই নীরোগ, আমরা যাকে 'অসুখ' বলি সেটা 'ইম্ব্যালান্স' মাত্র, ভারসাম্যে কোনো বিচ্যুতি—দুশ্চিন্তা, মনের কষ্ট, অনাহার, অতিভোজন, এমনি কোনো ঘটনাচক্রের ফলাফল। শরীর আমাদের সুস্থ রাখার জন্য অনবরত সচেষ্ট; কিন্তু সেই চেষ্টা পুরোপুরি সফল হ'তে পারে না, আমাদের মন যদি সাহায্য না করে। (মনোবল মানেই অটুট স্বাস্থ্য: এই ফর্মুলার উদাহরণ স্বরূপ তিনি অবশ্য বর্নার্ড শ' আর মহাত্মা গান্ধীর উল্লেখ করেন—আর বলেন, বৃদ্ধ গ্যেটে কেমন শুধু ইচ্ছার জোরে বেঁচে ছিলেন, যতদিন না দ্বিতীয় 'ফাউস্ট' শেষ হয়েছিলো, আর বৃদ্ধ টলস্টয়—যাঁর কামরিপুর কখনো নিবৃত্তি হয়নি, স্বাস্থ্য ছিলো পাথরের মতো অটুট—তিনি কেমন শান্ত ও সুন্দরভাবে ইচ্ছামৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, তীব্র শীতে, রেল-স্টেশনের বেঞ্চিতে গা এলিয়ে।) আসলে আমাদের মনই আমাদের শরীরটাকে চালায়, কিন্তু যেহেতু এখন পর্যন্ত ডাক্তারের চোখে শরীর হ'লো একটা সপ্রাণ জড়পদার্থ, যা কোনো বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হ'লেই রুগ্ন হয়, তাই স্বাস্থ্যের অনেক গূঢ়

তত্ত্ব মানুষ এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। তথাকথিত 'চিকিৎসা'র সঙ্গে গবর্মেণ্টের একটা তুলনাও টানেন অনাদিবাবু; মানুষ ভিতু ব'লেই, যেমন সাংসারিক ব্যাপারে সরকারের ওপর, তেমনি শরীরের ব্যাপারে চিকিৎসকের ওপর নির্ভর করে—রোগের প্রবণতা দূর ক'রে দেবার ক্ষমতা তার নিজেরই আছে, আর সেই ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলাই সত্যিকার 'চিকিৎসকে'র কাজ।

আপনি হাসছেন? খুব পুরোনো শোনাচ্ছে কথাগুলো? এলোমেলো, খাপছাড়া? নাঈভ? তা মশাই, কোন সময়ের কথা তা তো মনে রাখবেন। আর কোন দেশ, কোন পরিবেশ। ধরুন আমাদের য়ুনিভার্সিটির মাষ্টারমশাইরা: কোনো বিষয়ে কিছু জিগেস করলে উত্তর পাই, 'অমুক বইয়ের তমুক চ্যাপ্টারটা পড়ো।' এক-একটি খুপরির মধ্যে ব'সে আছেন এক-একজন: আর্টস, সায়েন্স, পলিটিক্স, ফিলজফি, সাহিত্য—আলাদা নাম, আলাদা খোপ, আর সেগুলোর যেন সৃষ্টি হয়েছিলো এইজন্যেই, যাতে মাষ্টারমশাইয়ের মাষ্টারি করার আর ছাত্রদের ডিগ্রিলাভের সুযোগ ঘটে। অনাদিবাবুর কথাবার্তা শুনেই আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিলো যে এই ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়গুলো পরস্পরসম্পৃক্ত, আর এগুলো আমাদের জীবনেরই অংশ, দৈনন্দিন বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যোগ আছে এদের। সব সময় তাঁর যুক্তি অবশ্য বুঝি না আমি, তাঁকে কখনো-কখনো মনে হয় স্ববিরোধী—কিন্তু তিনি অন্তত ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে ব'সে নেই, নড়াচড়া করেন, মনের মধ্যে একটা ছটফটানি আছে তাঁর। খানিকটা মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতো আমার মনে হয়েছিলো তাঁকে—তাঁর লামিনি স্ট্রিটের দোতলা বাড়ি বকুল-ভিলাকে, বাড়ির লোকেদের। তাঁদের চালচলন আমাদের চেনা-শোনা অন্য কোনো বাড়ির মতো নয় ঠিক—আমার বাবা যাকে বলেন 'কলকাত্তাই' আর ঠাকুমা বলেন 'সাহেব-সাহেব খেলা', অনেকটা সেই ভাবের। বাড়িতে আছে সোফা-সেটি দিয়ে সাজানো 'ড্রয়িংরুম,' ইলেকট্রিক আলো, সীলিঙে ঝোলানো পাখা পর্যন্ত চলে। লোকজনের যাওয়া-আসা চলে দু-বেলা—রোগী, রোগীর আত্মীয়েরা, আর যারা গীতসুধার জন্য পিপাসু। বাইরের হাওয়া সব সময় বইছে, বাইরের জগৎ স্বীকৃত। আমার ভালো লাগে অনাদিবাবু আমাদের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের 'আত্মীয়তা'র কোনো উল্লেখ করেন না, আমাকে গ্রহণ করেছেন আমারই জন্য, আর কথাবার্তা চালান এমন সুরে যেন আমি তাঁর সমবয়সী, সমকক্ষ।

স্পষ্টভাবে হোমিওপ্যাথি নিয়ে, বা তাঁর মেয়ের গান নিয়ে, অনাদিবাবু কিন্তু বেশী কথা বলেন না। বলেন না এইজন্য যে ও-দুটো বিষয় তাঁর কাছে স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণসাপেক্ষ নয়। অন্য সব ডাক্তাররা জবাব দেবার পর তিনি কবে কার উদরী সারিয়েছিলেন, কার কলেরা তাঁর একটি মাত্র ডোজে আরাম হয়েছিলো, বা কলকাতায় কোন-কোন নামজাদারা মিতুর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন, কে-কে তাকে চিঠি লেখেন লক্ষ্ণৌ বা পণ্ডিচেরি থেকে—এ-সব কথা তাঁর মুখে কখনোই শোনা যায় না তা নয়, কিন্তু তাঁর মুখে ও গলার আওয়াজে এমন একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব থাকে যেন, 'লণ্ডনে আবার গোল-টেবিল বৈঠক বসবে,' বা 'ব্রাডম্যান এবারে তিনটে সেঞ্চুরি করলো,' এই ধরনের কোনো খবর দিচ্ছেন শুধু। কেউ-কেউ অবশ্য এটুকুর জন্যেই আড়ালে তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করে, কিন্তু আমার কখনো মনে হয় না তিনি 'নিজের ঢাক নিজে পিটোতে' চান। যে-অতিসূক্ষ্ম ভেষজশিল্পের তিনি সেবক, যে-কর্ণসেব্য ললিত-কলার তিনি প্রেমিক, তাদেরই গৌরব বাড়ানো তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি যে মাঝে-মাঝে বাড়িতে অত লোক ডেকে মেয়ের গান শোনান, প্রচুর খাইয়ে আপ্যায়ন করেন, কাউকে গানের সমজদার পেলে বারে-বারে আসতে বলেন বাড়িতে, তার কারণ কোনো অন্ধ পিতৃস্নেহ বা বিজ্ঞাপনের ইচ্ছে নয়—আসলে তিনি চান অন্যদের সঙ্গে ব'সে গান শোনার সুখ ভোগ করতে, তাঁর এই বিশুদ্ধ আনন্দে অন্যদেরও অংশ দিতে চান। যেটা ভালো ও উপভোগ্য—হোক টাকা, হোক বিদ্যা, হোক কোনো শিল্পকলা—সেটা নিজের অধিকারে এলে অন্যদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নেবার ইচ্ছেটাকেই বলে সহৃদয়তা, আর অনাদিবাবুর এই গুণটি তাঁর রোগীদের কাছেও স্পষ্ট ছিলো। অনেককে তিনি ওষুধ দেন বিনামূল্যে, টানাটানির সংসারে ফী নেন না বা অর্ধেক নেন: তাঁর চিকিৎসায় লোকেরা যে সেরে উঠছে, আর মিতুর গান শুনে আনন্দ পাচ্ছে, এতে তিনি অনুভব করেন, তাঁর নিজের বা তাঁর কন্যার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়—মনস্বী হানেমান-এর বিজয়, রাগ-রাগিণীর অফুরন্ত আবেদন। অন্তত আমার তা-ই মনে হয়, কেননা আমি অনাদিবাবুর চরিত্রে কিছুই খারাপ দেখতে পাই না, হয়তো তা চাই না ব'লেই। তিনি যে মিতু বর্ধনের বাবা, এ-জন্যেও আমি তাঁকে ভালোবাসছি।

মেয়েকে গাইয়ে বানাতে গিয়ে কিছুটা লাঞ্ছনাও সইতে হয়েছিলো অনাদিবাবুকে। একজন ভদ্রঘরের মেয়ে—ওলগঞ্জের ছ-আনি বংশে যার জন্ম—

সে কিনা খ্যামটাউলির মতো মুসলমান ওস্তাদের কাছে গলা সাধবে, হার্মোনিয়ম বাজাবে, তবলার সঙ্গে তাল রেখে গান গাইবে এক হাট লোকের সামনে—এই ব্যাপারটা প্রথমে অনেকেই বরদাস্ত করতে পারেননি। মাঝে-মাঝে ঢিল পড়েছে বকুল-ভিলায়, কদর্য বা ক্রুদ্ধ ভাষায় বেনামি চিঠি এসেছে; আমাদেরই য়ুনিভার্সিটির ছাত্র শামসুদ্দীন একদিন রাত্রে বকুল-ভিলা থেকে ফেরার পথে প্রচণ্ড মার খেয়েছিলো। কিছু কুৎসাও রটেছিলো মিতু বর্ধনের নামে, অনাদিবাবুকে শুনতে হয়েছিলো শুভানুধ্যায়ীর অযাচিত সদুপদেশ—কিন্তু গান্ধীভক্ত হোমিওপ্যাথের মনে কিছুই আঁচড় কাটলো না, গান চলতে লাগলো সমানে। আস্তে-আস্তে শহরসুদ্ধ সবাই মেনে নিলে এই গাইয়ে মেয়েকে, ঘরে-ঘরে নাম পৌঁছলো তার, কলকাতায় তার রেকর্ড বেরোবার পর থেকে তাকে নিয়ে কিছুটা গর্বিতও হলেন ঢাকার কোনো-কোনো বিশিষ্ট নাগরিক। আজকাল নানা অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য ডাক পড়ে তার—আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে, নর্থব্রুক হল-এ সুভাষ বসুর সংবর্ধনায়, তার গান ছাড়া ঢাকার বাৎসরিক স্বদেশী মেলার উদ্বোধন হয় না। এই উনিশ বছরের মেয়েটি নিমন্ত্রিত হয় রমনার উঁচুদরের প্রোফেসর-পাড়ায়, হলদিয়ার চৌধুরী-বাড়িতে। আর মাঝে-মাঝে সন্ধেবেলায়, মিতু যখন তার ওস্তাদজী আর তবলচির সঙ্গে রেওয়াজ করে, তখন দু-চারটি যুবক দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচিল-তোলা বকুল-ভিলার বাইরে—মস্ত কম্পাউণ্ড পেরিয়ে ভেসে আসে সুর, মাজা গলায়, তানের ঢেউয়ে, যেন পাখির ঝাঁক ঘুরে-ঘুরে ওড়ে, যেন উছলে ঝ'রে পড়ে ফোয়ারা। কেউ তাকে বলে পাপিয়া, কেউ ইংরেজি ক'রে নাম দিয়েছে সোনালি-কণ্ঠী। কোনো ছেলে সাহস ক'রে ভেতরে ঢুকে পড়লে অনাদিবাবু খুশি হ'য়ে বলেন, 'তা এসো, বাইরে কেন, গান শুনবে তাতে আর কী আছে।' এমনি ক'রে একটি গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছে মিতুকে আর অনাদিবাবুকে ঘিরে, আর তাতে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে আর্থার জোন্স—মিতুর জন্মদিনের সন্ধ্যায় আমি তাকে প্রথম দেখলাম।

৫

জোন্সকে দেখে প্রথমে কেমন বিমূঢ় হ'য়ে গিয়েছিলাম আমি; তার কারণ তার সবুজ চোখ। একেবারে সবুজ, বেড়ালের চোখের মতোও নয়, পান্নার মতো, চোখের তরলতা যেন কঠিন হ'য়ে গেছে ঐ রঙের জন্য। আমার মনে হয়েছিলো অস্বাভাবিক, অমানুষিক, কোনো মনুষ্যাকৃতি শরীরের মধ্যে ও-রকম চোখ সত্যি ব'লে বিশ্বাস হয়নি; অস্বস্তি হচ্ছিলো তার দিকে তাকাতে। অথচ অন্য কোনো বিষয়ে জন-বুল্-বংশোদ্ভূত তাকে মনে হয় না; মাঝারি লম্বা, চুলের রং কালচের দিকে ব্রাউন, গায়ের রং ভয়াবহভাবে টকটকে লাল নয়, বোধগম্য ভাষার বদলে গাঁ-গাঁ আওয়াজ বেরোয় না তার গলা দিয়ে। বসার ঘর ভর্তি ছিলো লোকজনে; অনাদিবাবু আমাকে জোন্সের পাশে বসিয়ে দিলেন, জোন্স আলাপ শুরু করলো, পাৎলা ঠোঁটে হাসলো—আস্তে-আস্তে তার সবুজ চোখ সহনীয় মনে হ'লো আমার, অস্বস্তির ভাবটা কেটে গেলো, তাকে মনে হ'লো সুশ্রী, ব্যবহার ভারি ভদ্র, ভাবটা যেন লাজুকমতো। ভালো লাগলো তার নিচু, নরম কথা বলার ধরন, তাছাড়া এক-একটা ইংরেজি শব্দ সে যে-ভাবে উচ্চারণ করে তাতেও আমার কৌতূহল জেগে উঠলো। আমি সাহিত্যের ছাত্র শুনে সে আমাকে জিগেস করলে ইংরেজিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো জীবনী আছে কিনা, শরৎচন্দ্রের গল্প আমার কেমন লাগে, রবীন্দ্রনাথের নাটক বিষয়ে আমার মত কী। বাংলা ভাষা নিয়ে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলে দু-একটা। যেমন: 'তুমি তাকে এ-কথা বলবে,' আর 'তুমি তাকে এ-কথা বোলো'—এই দুটোতে তফাৎ কী। প্রশ্নটা শুনে আমি একটু অবাক হলাম (কেননা মাছের পক্ষে যেমন জল আমাদের পক্ষে মাতৃভাষা ঠিক তেমনি, তার অনেক অদ্ভুত আচরণ আমরা লক্ষ করি না); একটু ভাবতে হ'লো জবাব দেবার আগে। 'তফাৎ বোধহয় এই যে প্রথমটায় আদেশ বোঝায়, বা ভবিষ্যৎ বচনে কোনো সাধারণ উক্তি, আর পরেরটায় আছে অনুরোধের সুর।' 'দিনের ঠিক কোন সময়টাকে "ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর" বলে?' এটার জবাব দিতে বেশ বেগ

পেতে হ'লো আমাকে, আর তখনই আমি প্রথম বুঝলাম যে বাংলাভাষার এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে কানের মধ্য দিয়ে ঢুকে চোখে-দেখা ছবি হ'য়ে বেরিয়ে আসার : ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর, খাঁ-খাঁ নির্জন।

আমি জিগেস করলাম সে দেশে থাকতেই বাংলা শিখেছিলো কিনা। 'খানিকটা—চাকরির জন্যেই শিখতে হয়েছে—কিন্তু সে আর কতটুকু। এখন ভালো ক'রে শিখতে চাই, কিন্তু আপনাদের ভাষা বড়ো শক্ত।' 'আমাদের পক্ষে ইংরেজি যতটা তার চেয়ে বেশি নয়।' 'আপনাদের ভাষা শেখায় দক্ষতা আছে, আমাদের তা নেই। জগৎ ভ'রে আমাদের দুর্নাম সেজন্য।' তার এই কথাটা খুব পছন্দ হ'লো না আমার, মনে হ'লো আসল কথাটা সে এড়িয়ে যাচ্ছে। বললাম, 'কিন্তু আমরা তো ছেলেবেলা থেকে বাধ্য হই ইংরেজি শিখতে, সে-রকম কোনো দায় থাকলে আপনারাও কি পারতেন না?' 'তা সত্যি,' জোন্স হাসলো একটু। 'সেটাও একটা অসুবিধে আমাদের যে আপনারা অনেকেই ইংরেজি বলেন, এ-দেশের কোনো ভাষা না-শিখেও দিব্যি চ'লে যায় আমাদের। জানি, এ-জন্যে আমরাই দায়ী,' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তক্ষুনি জুড়ে দিলো সে, 'কিন্তু মোটের ওপর এটা লজ্জার কথাই যে হাজার-হাজার ইংরেজ ভারতবর্ষে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে, অথচ তাদের ভাষাজ্ঞান কয়েকটা হিন্দুস্থানি শব্দেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ-কথা কি সত্যি যে প্রথম বাংলা গদ্য বই একজন ইংরেজ মিশনারি লিখেছিলেন?' আমি জবাব দিলাম, 'তা ঠিক নয়, একজন বাঙালির বইও বেরোয় সেই একই বছরে, তাছাড়া আপনাদের কাছে যেমন "বাবু-ইংলিশ" আমাদের কাছে তেমনি মিশনারির বাংলা।' জোন্স প্রতিবাদ করলো তক্ষুনি, 'না, না, নিশ্চয়ই ভারতীয় ইংরেজি অনেক ভালো।' তার এই কথাটা একটু কপট শোনালো আমার কানে।

আমি কিপলিঙের কথা তুললাম। জোন্সের কি ভালো লাগে কিপলিংকে? আমার? জিগেস করাই বাহুল্য, কোনো ভারতীয়ের পক্ষে কি কিপলিং-ভক্ত হওয়া সম্ভব? একটু সচেতনভাবে বললাম কথাটা, জোন্সের সবুজ চোখে ঈষৎ যেন কৌতুক ফুটলো। 'কিপলিংকে ঠিক ভারতবিদ্বেষী বলা যায় না কিন্তু, লোকটা লেখেও মন্দ না—তবে বড্ড সেন্টিমেন্টল।' 'ভারতবিদ্বেষী নয়!' আমি উত্তেজিত হলাম, 'আপনার মনে আছে "গঙ্গা দীন" কবিতা?

সেই মহাপ্রাণ ভিস্তিওলা, নিজে মরার আগে এক বৃটিশ টমিকে জল দিয়েছিলো ব'লেই যে পুণ্যাত্মা? "For all 'is dirty hide, 'E was white, clear white inside।" ভারতবর্ষকে এমন অপমান আর কে করেছে!' জোন্স তক্ষুনি জবাব দিলো, 'আমি ওকেই সেন্টিমেণ্টল বলছি। কিন্তু কবিতার বক্তা কী-রকম স্থূল চরিত্রের অশিক্ষিত মানুষ, তাও মনে রাখবেন।' 'কিন্তু ভারতের প্রতি ঘৃণাটা আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না? "Ship me somewhere East of Suez where the best is like the worst—" ' আমি একটু থামতেই জোন্স পরের লাইনটা আওড়ালো, ' "Where there aren't no Ten Commandments and a man can raise a thirst!" আপনার মনে হয় এতে ভারতের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছে?' 'নিশ্চয়ই!' নিজের অজান্তেই আমার গলার আওয়াজ চ'ড়ে গেলো, 'আর কত স্পষ্ট ক'রে বলা যায় যে ভারতবর্ষ বর্বরের দেশ!' একটু চুপ ক'রে থেকে জোন্স বললে, 'বোধহয় ঠিকই বলছেন আপনি—' আন্তরিকভাবে, না ভদ্রতা ক'রে, ঠিক বুঝলাম না, 'তবে কী জানেন, একটা নস্টালজিয়া আছে, এক ধরনের রোমান্টিক ছবি এ-দেশের, এশিয়ার, যা আসলে চারশো বছর ধ'রে—বা আরো বেশি—মার্কো পোলোর পর থেকেই—চলতি ছিলো য়োরোপে, সেটাই শেষ ধরা পড়লো কিপলিঙের লেখায়। বাসি রোমান্টিসিজম, তার স্বর্গীয় সুবাস আর নেই, একটু ট'কে গেছে বলতে পারেন, তবে তারই মধ্য দিয়ে কিপলিং কিন্তু ভারতবর্ষকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন ইংলণ্ডের ঘরে-ঘরে। আমি ছেলেবেলায় তাঁর লেখা প'ড়েই প্রথম ভারতের দিকে ঝুঁকেছিলাম।' আমি সজোরে ব'লে উঠলাম, 'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কিপলিঙের ছবি কত মিথ্যে!' 'হ্যাঁ, অনেক ব্যাপারেই মিথ্যে, তবু—এই রোদ, এই আকাশ—' 'তা তো বটেই!' জোন্সকে কথা শেষ করতে দিলাম না আমি—'রোদ, আকাশ, গাছপালা, জীবজন্তু—সবই ভালো। কলকাতায় ব'সেই একজন বিশপ লিখেছিলেন না—' "Where every prospect pleases and only man is vile"?' একটু লাল হলো আর্থার জোন্স, আস্তে-আস্তে বললো, 'হ্যাঁ, আমি ভারতীয় হ'য়ে জন্মালে আমারও অসহ্য মনে হ'তো কিপলিংকে। তবে অন্য একটা দিকও আছে। ভেবে দেখুন লণ্ডনের ঠাণ্ডা, ধোঁয়া, কুয়াশা, বরফ—তারই মধ্যে কোনো ব্যাঙ্কের কেরানি, ফ্যাক্টরির মজুর, অশিক্ষিত, কুনো,

জগতের কোনো খবরই রাখে না—হঠাৎ ভারতবর্ষের আকাশ দেখে সে কী-রকম চমকে উঠবে তা তো বোঝেন। সেই চমকটা কিপলিং বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন তা কিন্তু মানতেই হবে। তাঁর দোষটা এই যে ভারতবর্ষকে স্বপ্ন ক'রে তুলতে গিয়ে তিনি বাস্তবকে বিকৃত করেছেন—তবু—আপনি হয়তো হাসবেন শুনে—সেই স্বপ্নটা আমাদের মনে নাড়া দিয়েছিলো।'

আমার আরো অনেক তর্ক ছিলো, কিন্তু জোন্সের শেষ কথাটা শুনে আমি একটু থমকালাম। ইংলণ্ডের 'অশিক্ষিত, কুনো' লোকদের কাছে ভারতবর্ষ যে একটা স্বপ্ন হ'য়ে উঠতে পারে, এই কথাটা নতুন শোনালো আমার কানে। আমিও মনে-মনে পোষণ করছি এক স্বপ্নের ইংলণ্ডকে, টুকরো-টুকরো সাহিত্যের স্মৃতি গেঁথে তৈরি করেছি এক অলৌকিক লণ্ডন—টেমজ্ নদী বললেই স্পেনসারের লাইন মনে পড়ে আমার, ফ্লীট স্ট্রিট বললেই জি. কে. চেস্টার্টনকে, হ্যাম্পস্টেড মানে কীটস, চেলসী মানে রোজেটি—এক-এক সময় এও মনে হয়েছে যে সেই দেশকে আমি এতদূর পর্যন্ত আপন ক'রে নিয়েছি যে কোনোমতে সেখানে একবার পৌঁছতে পারলে 'তাদেরই একজন' হ'য়ে যেতে পারবো। কিন্তু জোন্সের কথা শুনে আমার উপলব্ধি হ'লো যে আমার এই ইংলণ্ড তেমনি অলীক, যেমন কিপলিঙের ভারতবর্ষ। আমি আঁকড়ে ধরেছি ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে, যাতে ব্যাঙ্কের কেরানির, কারখানার মজুরের, কোটি-কোটি মানুষের কিছুই এসে যায় না—সেই যারা সেপাই হ'য়ে আমাদের দেশে আসে, অবাক হ'য়ে যায় আলো, আকাশ, আকাশ-ভরা ঝকঝকে তারা দেখে—ফিরে গিয়ে ঠাণ্ডা বরফে স্বপ্ন ছাখে আমাদের নারকোল গাছের। আমাদের এই জীবন—মলিন, গরিব, দম-আটকানো—সে-বিষয়ে কিছু জানে না তারা, যেমন আমি পারি না কোনো গোরা টমিকে গোরা টমি ছাড়া আর-কিছু ব'লে ভাবতে, পারি না তার স্ত্রী, সন্তান, সংসার কল্পনা করতে, আমার স্বরচিত ইংলণ্ডে তার জন্য এক ইঞ্চি জায়গাও আমি রাখিনি। আমার তখনও এতটা বোঝার মতো বুদ্ধি হয়নি যে সব স্বপ্নেরই নির্ভর হ'লো আংশিক সত্য; (সেখানেই ইতিহাসের সঙ্গে কবিতার তফাৎ); প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন ভারত, উজ্জয়িনী, রোম, রেনেসাঁসের ফ্লরেন্স—সবই তা-ই; স্বপ্নগুলো অনর্থক নয় তবু, তারা যে-সব ফুল ফোটায়, ফল ফলায় তাতেই তাদের মূল্য। কিন্তু ইংলণ্ডের ভারতবর্ষীয় স্বপ্নে বিস্তর ভেজাল ছিলো—সাম্রাজ্য, অর্থলোভ,

আমাদের সকলকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে চাওয়ার পাগলামি—আর তাই সেই ডিম ফুটে বেরোলো—গ্যেটের ইটালি বা শাতোব্রিয়ঁার আমেরিকা নয়, নেহাৎই একটি ছেলে-ভুলোনো 'জাঙ্গল্-বুক্' মাত্র, নেহাৎই একমুঠো সেপাই-ব্যারাকের ছড়া—যার কুচকাওয়াজি তালের ফাঁকে-ফাঁকে চুঁইয়ে পড়ছে খাকির গন্ধ, সেক্রেটারিয়েটের বালি-কাগজের গন্ধ, আর এক দূর দেশের অসংখ্য অদ্ভুত মানুষ আর আরো অদ্ভুত দেবদেবীর সামনে এক ধরনের মফস্বলি ইংরেজিয়ানা বজায় রাখার কসরৎ।

যেহেতু ছেলেবেলায় কিপলিঙের কবিতা আমার প্রিয় ছিলো, অনেক লাইন এখনো মুখস্থ আছে, সেইজন্যেই কিপলিঙের ওপর এখন আমার আক্রোশ একটু বেশি; মনে হ'লো সেই অজ্ঞান বয়সের বোকামির কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে, যদি এক্ষুনি জোন্সের কাছে প্রমাণ করতে পারি যে কবি হিশেবে কিপলিং অকিঞ্চিৎকর, এমনকি ইংরেজি সাহিত্যের একটি কলঙ্ক। মনে-মনে একটা প্রশ্ন তৈরি ক'রে বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়লো জানলার কাছ থেকে ফটিক-মামা হাত নেড়ে ডাকছেন আমাকে, চোখে চোখ পড়তেই আরো স্পষ্ট ইশারা করলেন। 'মাপ করবেন, একটু আসছি,' বলে উঠে গেলাম আমি, ফটিক-মামা আমাকে কাঁধের নিচে ধ'রে দূরে নিয়ে গেলেন। নিচু গলায় বললেন, 'এই তোর চমৎকার সুযোগ, রঞ্জু, জোন্সের কাছে সব তুকতাক জেনে নে।' আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'কিসের তুকতাক?' 'তুই আই. সি. এস. দিবি তো—ও-ছোকরা টাটকা পাশ ক'রে এসেছে, অনেক ভালো-ভালো টিপ্ দিতে পারবে তোকে।' 'আমি আই. সি. এস. দেবো কে বললো?' 'যদি নাও দিস্, তবু জোন্সের সঙ্গে আলাপ রাখা ভালো—কাজে লাগতে পারে।'—ব'লেই, আমাকে ফেলে, ফটিক-মামা হঠাৎ ছুটে গেলেন অনাদিবাবুর কাছে, বোধহয় কোনো বৈষয়িক আলাপ শুরু করলেন তাঁর সঙ্গে: 'শাই ক্যাপিটেল', 'শেয়ার', 'সিক্স পার্সেণ্ট', এই ধরনের কয়েকটা কথা আমার কানে এলো।

এতক্ষণ আমার খেয়ালই ছিলো না যে জোন্স একজন জলজ্যান্ত আই. সি. এস. চাকুরে, ঢাকার অ্যাডিশনেল ম্যাজিস্ট্রেট—অর্থাৎ, তাদেরই একজন, যাদের আমরা 'হর্তাকর্তা' ব'লে থাকি, মনে-মনে কখনো বিশ্বাস করি না, কিন্তু সুযোগ পেলেই প্রার্থী হ'য়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তার সঙ্গে আমার দেখা

হয়েছে এমন একটা পরিবেশে যে ও-সব মনে থাকার কথাও নয়। জোন্সের সঙ্গে আমার যে-বন্ধুতা কয়েক মিনিট আগে সম্ভবপর হ'য়ে উঠছিলো, সেটাতে হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গেলেন ফটিক-মামা। চারদিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'লো অতিথিদের মধ্যে অনেকেই জোন্সের উপস্থিতির জন্য আরাম পাচ্ছে না (যদিও হয়তো গৌরবান্বিত হচ্ছে মনে-মনে)—যেন ভুলতে পারছে না আজকের এই প্রীতিসম্মেলনে ঐ মানুষটা কী-রকম বিজাতীয়, অনাত্মীয়, অবান্তর। প্রতাপান্বিত বৃটিশ রাজ, দুর্গম ইংরেজি ভাষা, কিছু ভয়, কিছু ভক্তি, কিছু সন্দেহ—এই সব তাকে শত যোজন দূরে সরিয়ে রেখেছে। নিশ্চয়ই জোন্স নিজেও বোঝে যে আমাদের মধ্যে তার সত্যিকার কোনো জায়গা নেই, হবেও না কোনোদিন, যতদিন ইংরেজ রাজত্ব আছে এ-দেশে; তাহ'লে তাদের ঢাকা ক্লাবে না-গিয়ে, টেনিস গল্‌ফ বল্‌-নৃত্যে সময় না-কাটিয়ে, এখানে আসে কেন? শুধু গান ভালোবাসে ব'লে?

'এই যে রঞ্জু, কী ব্যাপার?' আমার পেছনে একটি মৃদু গলার আওয়াজ পেলাম; সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে দেখে পুলকিত হ'তে পারলাম না। অমূল্য, আমারই মতো য়ুনিভার্সিটির ছাত্র, এটুকু ছাড়া তার সঙ্গে কিছুই মিল নেই আমার। পুষ্ট গালে হাসির ভাঁজ ফেলে সে বলতে লাগলো, 'জানতাম না তো তুমি জোন্স সাহেবের ফ্রেণ্ড, একটা কাপ্তান লোক! বাপ্‌স্‌, কী-রকম ইংরেজি চালাচ্ছিলে এতক্ষণ! একেবারে ফায়ার!' আমার খুব লজ্জা করলো অমূল্যর কথা শুনে, কিন্তু তার ধরনধারন আমার অচেনা নয়, যেন তার কোনো কথাই আমার কানে ঢোকেনি এমনি স্বরে, ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'তোমার কী খবর? কেমন আছো?' 'আর আছি!' মুখভঙ্গি ক'রে ব'লে উঠলো অমূল্য, 'পিতার আদেশে ধনবিজ্ঞানে পাঠ নিচ্ছি, কিন্তু আচার্যগণের উপদেশ আমার মনে হচ্ছে যেন প্রপঞ্চের মতোই প্রহেলিকা। অথবা যেন মহাষ্টমীর দিনে ছাগশিশুর করুণ আর্তনাদ। বুঝেছো রঞ্জু, কোনোমতে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলে আর নগেন চাটুয্যের ব্যা-ব্যা শুনতো কোন শালা! কিন্তু কোথায় চাকরি? ছ্যাশে নাই যা পোলার চাই তা! দণ্ডকারণ্যে রামের মতো অবস্থা আমাদের "হা সীতা, হা সীতা" ব'লে বিলাপ করছি! সীতা মানেই চাকরি, বুঝেছো তো—ও-দুটো একই আসলে—হোক না বখা, ফাৎরা ছেলে, চাকরি পেলেই ছুকরি মেলে!' আমি বললাম, 'তোমার বেশ স্বভাবকবিত্ব আছে

দেখছি।' 'কী যে বলো! আমি তো আর তোমার মতো পোয়েট নই, ছড়াফড়া বানাই আরকি মাঝে মাঝে, আবার সুরও দিই সেগুলোতে। শুনবে একটা?' অমূল্য নিচু গলায় গুনগুন করলো :

'গেণ্ডারিয়ার ছেমরিগুলি আইল যেদিন বারিন্দায়
লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হৈল ঢোলগোবিন্দের বারিন্দায়।
ঢোলগোবিন্দের দশটা পোলা, লম্বা চোথা লাঙুল-ঝোলা,
চক্ষু মাইরা মাইয়াগুলির—

—থাক; বাকিটা পরে শোনাবো তোমাকে।' স্বরচিত অমুক্ত লাইনগুলি যেন জিভের ওপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে চেখে নিয়ে গিলে ফেললো সে, তারপর বললো, 'জানো, আমার আসল লাইন বোধহয় গান-বাজনা, খাঁ সাহেবের কাছে গলাও সাধছি, কিন্তু আমার গলা দানাদার নয়, খেয়াল হবে না আমাকে দিয়ে, ধরো এই মিতুর এক-একটা তান আমি কিছুতেই আনতে পারি না গলায়। মিতুর গান কেমন লাগে তোমার?' 'ভালো।' 'মাইরি—শুধু ভালো! সুপার্ব—ওয়াণ্ডারফুল—ডিভাইন—' পর-পর অনেকগুলো ইংরেজি বিশ্লেষণ আউড়ে গেলো অমূল্য—'আমি, জানো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান শুনতাম, তারপর বুক ঠুকে ঢুকে পড়লাম একদিন। মিতুর কাছে নওরোজের গান শিখছি এখন—তোমাদের সেই দিলদার নওরোজের কথা বলছি।' (কী-অর্থে দিলদার নওরোজ 'আমাদের' হলেন আমি তা বুঝলাম না।) 'ঠুংরি-গজল-ভজনের লাইনে চ'লে যাবো কিনা ভাবি মাঝে-মাঝে। কিন্তু আসল কথা, ভাত-ডাল আসবে কোত্থেকে? ঐ যে, ওস্তাদজী এলেন—আমি যাই।' আমার হাত ধ'রে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমাকে আরো দূরে নিয়ে এলো অমূল্য, একেবারে দেয়ালের কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিশফিশে গলায় বললো, 'শোনো রঞ্জু, আমার একটা উপকার করবে? জোন্সের কাছ থেকে একটা সুপারিশ এনে দেবে আমাকে? সাহেব এক ছত্তর লিখে দিলে আমাকে আর পায় কে? আমার তো আবার ইংরিজি বলতে গেলেই কাশি ওঠে—তুমি একটু বলো যদি আমার হ'য়ে। কেমন, বলবে তো? আর শোনো—' এবার আমার কব্জিটা শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরলো অমূল্য, কেমন একটু বাঁকা চোখে তাকালো আমার দিকে—'একটু সাবধানে কথা বোলো কিন্তু জোন্সের সঙ্গে, দেখছো দিব্যি ভালোমানুষ, কিন্তু আসলে সাংঘাতিক টিকটিকি! মনে রেখো

কথাটা। কেউ না একদিন বোমফট্টাশ ক'রে দেয় ওকে, তার আগে একটা সুপারিশ যদি বাগাতে পারি—আচ্ছা—পরে কথা হবে।' আমাকে মুক্তি দিয়ে অমূল্য ছুটে গেলো দরজার কাছে, ওস্তাদ ইব্রাহিম খাঁকে অভ্যর্থনা করতে, ঘরের মধ্যে নড়াচড়া শুরু হ'লো। অনাদিবাবু ঘুরে ঘুরে বলতে লাগলেন, 'আসুন আপনারা, আসুন সবাই—ওস্তাদজী—জোন্স—রঞ্জু, এখানে একা দাঁড়িয়ে কেন —চলো, চা তৈরি।'

—আমাদের লাঞ্চও প্রায় তৈরি মনে হচ্ছে, দূতী সমাগত। ইনি গায়ত্রী গ্রেগরি, আমার হাউসকীপার। ওয়াইন কোনটা দেবে? বলুন আপনি, আপনার কী পছন্দ? আপনার অভ্যেস নেই? আচ্ছা, একটু শাব্‌লি চেখে দেখুন, বিশুদ্ধ দ্রাক্ষারস, কোনো ক্ষতি হবে না। ঠিক আছে, গায়ত্রী, আমরা আসছি এক্ষুনি।…কী বললেন? গায়ত্রী গ্রেগরি নামটি বেশ সুন্দর? হ্যাঁ—সুন্দর নাম, মানুষটিও অসুন্দর নয়। কঙ্কানি মেয়ে, গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক ব্রাহ্মণ। নামের মধ্যেই দুই ধর্মের অনুপ্রাস। বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ। গায়ত্রী বিধবা, দ্বিতীয়বার জাত-ধর্ম মিলিয়ে পাত্র জোটানো গেলো না। আমার কাছে আছে, ভালোই আছে। চমৎকার সেবাপরায়ণা মেয়ে, আমিও ওর সব রকম প্রয়োজন মিটিয়ে চলি। ঐ লাঞ্চের ঘণ্টা। আসুন।

৬

এই ছবিটা? এটা নেলির হস্তশিল্প—আমার স্ত্রীর কথা বলছি।...ভালো? মশাই, আমি সে-রকম লোক নই যে আপনি আজ আমার বাড়িতে অতিথি ব'লেই আপনার মুখে স্তোক শুনতে চাইবো। খোলাখুলি কথা বলতে পারেন আমার সঙ্গে। আমাকে দেখে চলনসই গোছের রুচিবান লোক ব'লে মনে হচ্ছে, অথচ এই ছবি ঝুলিয়ে রেখেছি কেন খাবার ঘরে—এই তো আপনার মনের কথা? তা মশাই, নেলি মারা যাবার পরে একটু কষ্ট হ'লো ওর জন্য, ওর আঁকা গাদা-গাদা ছবি থেকে এই একটা বের ক'রে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখলুম। স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে। অন্যগুলো প'ড়ে আছে কোথাও, ধুলোর ধন ধুলোয় ফিরে যাচ্ছে।...না, উটকামণ্ড নয় জব্বলপুরের দৃশ্য এটা। সেখানকার বন-জঙ্গল ঝর্না ইত্যাদি দেখার ফলে নেলির স্কন্ধে চিত্র-সরস্বতী ভর করলেন। সকালে দুপুরে ছবি আঁকে ব'সে-ব'সে, কেউ-কেউ বেড়াতে এসে তারিফও করে। কিন্তু তাতে তৃপ্তি নেই নেলির, বার-বার আমার মত জানতে চায়। একটা নির্দোষ আমোদ ভেবে আমি অনেকদিন চুপচাপ ছিলুম, কিন্তু যখন দেখলুম নেলির প্রায় ধারণা হ'য়ে যাচ্ছে সে ছবি আঁকতে পারে, তখন একদিন বলতে বাধ্য হলাম, 'এ-সব দৃশ্য তো বাইরেই আছে, এগুলো আবার আঁকছো কেন?' 'মানে?' 'মানে হ'লো—তোমার ছবিতে পাহাড়টা পাহাড়ই, ঝর্নাটা ঝর্না, অন্য কিছু নয়, তুমি নতুন কিছু যোগ করোনি।' ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায়, বুঝতে পর্যন্ত পারে না কী বলছি—হাঃ! প্যাস্টেল ছেড়ে পিয়ানো ধরলো এর পরে, সামনে স্বরলিপি রেখে কসরৎ করে রোজ, একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের কাছে নতুন গৎ তুলে নেয় মাঝে-মাঝে—আমাকে আবার শোনাতেও চায়। ছবিটা তবু নীরব থাকে মশাই, চোখ দুটোকে সরিয়ে নিলেই মুশকিল আসান, কিন্তু কান দুটোর তো আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই—ঐ পিয়ানো বাস্তি ঝালাপালা ক'রে তুললো আমাকে। কোনো ভুল নেই বাজনায়, কোনো রসও নেই—অসহ্য। একদিন ঐ ফিরিঙ্গি মেয়েটির সামনেই নেলিকে বললুম, 'এখানে

বড্ড গোলমাল, আমি বরং ওপরে গিয়ে কোনো বই-টই পড়ি।' এমনি ক'রে ছুঁচোর কেত্তন থামালুম।

ও-রকম ক'রে তাকালেন কেন আমার দিকে? বলতে চান আমার কাজটা ঠিক স্বামীজনোচিত হয়নি? নেলিকে উৎসাহ দেয়া উচিত ছিলো আমার? কিন্তু আমি যে বড়ো দুর্ভাগা, মশাই—আমি নির্বোধ নই, হ'তে পারিনি কোনোদিন। অন্তত এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আমার ছিলো যে নেলির কোনো ট্যালেণ্ট নেই—না ছবিতে, না গান-বাজনায়, না অন্য কিছুতে। আর তা যার নেই তাকে তা বুঝিয়ে দেয়াই সৎকর্ম, সে আপনার বক্ষলগ্ন সহধর্মিণী হ'লেও। বা সেইজন্যেই, আরো বেশি সেইজন্যেই। সেটাই স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য, নিজের প্রতি, সমাজের প্রতি। নলিনী ব্রোকার যে আর-একজন মিতু বর্ধন নয়, তা বুঝতে কি আমার আধ মিনিটের বেশি সময় লেগেছিলো ভেবেছেন? তা হ'তেই বা যাবে কেন বলুন, আমি তা চাইওনি, ও-সব বাজে বাবুগিরি নেই আমার; কিন্তু নেলি ভাবে, ওর ও-সব গুণপনা দেখে আমি বুঝি ওকে আরো বেশি ভালোবাসবো। কী ছেলেমানুষ বলুন তো। কখনো ওকে সাবালক ক'রে তোলা গেলো না, খুকি হ'য়েই কাটিয়ে দিলো জীবনটা। তাছাড়া, মশাই, গুণপণাই যথেষ্ট নয়, ভাগ্যও চাই। ঐ মিতুর কথাই ধরুন না: কিছুর মধ্যে কিছু না, হঠাৎ কপ ক'রে ধ'রে হিজলি ক্যাম্পে চালান ক'রে দিলে। কোথায় গেলো তার গান, কোথায় বা ভক্তের দল।

কিন্তু সেই সন্ধ্যাটিতে ভবিষ্যৎ কোনো ছায়া ফ্যালেনি। ওয়াড়িতে, লার্মিনি স্ট্রিটের বকুল-ভিলায়, সেই ভাদ্র মাসের সন্ধ্যায়। আকাশ ছিলো সূর্যাস্তে রঙিন, কিন্তু আমার মনে যেন পা টিপে-টিপে কুমারী ঊষা উঠে আসছেন। এক নতুন জগতে ছাড়পত্র পেয়েছি, যেখানে আত্মীয় মানেই স্বজন নয়, আর কেউ আমাদের মাসিমার ভাসুর-পো না-হ'লেই 'পর' ব'লে গণ্য হয় না। যেখানে স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে সব সময় একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে নেই—সূক্ষ্ম, দুরতিক্রম্য দেয়াল। বসার ঘর পেরিয়ে পেছন দিকে একটা চওড়া খোলা বারান্দা, ছোটো-ছোটো টেবিলে ভাগ হ'য়ে চায়ের ব্যবস্থা সেখানে। সকলের পেছনে আমি যখন এলাম তখনও অমূল্যর কথাগুলো ঝিমঝিম করছে আমার মাথার মধ্যে, মুখটা যেন তেতো হ'য়ে আছে—কিন্তু বারান্দায় এসে দাঁড়ানোমাত্র আমার মনের অবস্থা বদলে গেলো। হঠাৎ মিতুকে দেখতে পেলাম আমার মুখোমুখি।

মিতুই প্রথম কথা বললো, 'এই যে আপনি।' ব'লেই থমকালো একটু, কেননা ও-রকম অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলার মতো চেনাশোনা তার সঙ্গে আমার হয়নি এখনো, এই তো সবে তৃতীয়বার দেখা। 'আপনি এদিকে আসুন, এই কোণের টেবিলটায়। আমি আপনাকেই—' হয়তো বলতে চেয়েছিলো, 'আপনাকেই খুঁজছিলাম,' কিন্তু এক সেকেণ্ড থেমে বদলে দিলো কথাটা, 'আমি আপনাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম।' 'কী, বলুন?' '"মহুয়া" বইটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছি, কিন্তু কাজল-মামির হাত দিয়ে কেন?' আধ ঘণ্টা আগে জোন্সের কাছে যে-বাগ্মিতার পরিচয় দিচ্ছিলাম তা সে-মুহূর্তে ত্যাগ করলো আমাকে; আমার মনে প'ড়ে গেলো এই নিমন্ত্রণে আসার আগে আমি কত সময় নষ্ট করেছি, কত দুশ্চিন্তা ভোগ করেছি, যার ফলাফল—বেশি কিছু নয়, শুধু ঐ 'মহুয়া' বইটা। অনাদিবাবু আমাদের বাড়িতে ফী নেন না, হয়তো তারই প্রতিদানস্বরূপ আমার মা কিনেছিলেন মিতুর জন্য একখানা জামদানি শাড়ি, কাজল কিনেছিলো ওয়াটারম্যান কলম, আর আমার মনে হ'লো আমারও কিছু উপহার দেয়া উচিত, কেননা আমার আলাদা উপার্জন আছে, স্কলার্শিপ পাই। কিন্তু ইসলামপুর থেকে নবাবপুর পর্যন্ত সব ক-টা বড়ো-বড়ো মনোহারি দোকানে ঘুরে-ঘুরে আমি কিছুই খুঁজে পেলাম না, যা মিতুর যোগ্য। তাছাড়া জিনিশটাও এমন হওয়া চাই যাকে বলা যেতে পারে নৈর্ব্যক্তিক, গায়ে-পড়া নয়, গা-ঘেঁষা নয়, যাতে প্রকাশ পায়—কোনোরকম 'ভাব করার' ইচ্ছে নয়, শুধু সাধারণ সৌজন্য। আট-কোনা শিশিতে ফরাশি সেণ্ট, যার ভেতরে টলটল করছে সবজে-হলুদ আভা-জাগানো এমন এক বর্ণহীন তরল পদার্থ, যার প্রতিটি বিন্দুতে স্বপ্নের প্রস্রবণ লুকিয়ে আছে; বাক্সবন্দি হেলিওট্রোপ রঙের বিলেতি চিঠির কাগজ, সূক্ষ্ম পাটির মতো বোনা, ধারে-ধারে সরু সোনালি রেখার ঝিকিমিকি, খামগুলোর মধ্যে লুকোনো আছে কালচে-লাল জবা-রঙের ঝলক—যা দেখামাত্র চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে কিন্তু লেখার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না—এই ধরনের শৌখিন দ্রব্য একই কারণে বাদ দিতে হ'লো। অগত্যা সেই গতানুগতিক বই কিনতেই বাধ্য হলুম, সেই সনাতন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। কিন্তু তারপর আর-এক চিন্তা আক্রমণ করলো আমাকে: কী ক'রে দেবো বইটা মিতুর হাতে? কী বলবো? 'একটা ছোট্ট উপহার এনেছি—' 'এই কবিতার বইটা—' 'আপনার জন্যে একটা—' নাঃ! প্রত্যেকটাই বোকা

শোনাচ্ছে, আর এমন কী ব্যাপার যে ঘটা ক'রে ঘোষণা করতে হবে? বইটা আছেও হয়তো মিতুর, হয়তো আমার পক্ষে আলাদা কোনো উপহার দেয়াটাই অশোভন। শেষ মুহূর্তে কাজল-মামিকে বললুম, 'এটা তোমার কলমের সঙ্গে দিয়ে দিয়ো।'

আপনি হাসছেন? বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমি লাজুক ছিলুম তখন—মেয়েদের ব্যাপারে বড্ড লাজুক, মনে-মনে এখনো আছি। না, শুধু আমার বয়স বা সময়ের জন্য নয়, ঢাকা শহরের বাঁধাবাঁধি আবহাওয়ার জন্যও নয়—আমার স্বভাবই ঐ। আমি চিন্তাশীল, আমি দ্বিধান্বিত; জগতের সঙ্গে আমার ব্যবহারে তাই স্বাচ্ছন্দ্য নেই।...অবাক হচ্ছেন? তা শুনুন, আমি চেষ্টা ক'রে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছিলুম, মনের জোরে, প্রায় গায়ের জোরে—উপড়ে দিয়েছিলুম ঐ সব লতাপাতা যা গাছটাকে বেড়ে উঠতে দেয় না, বুঝেছিলুম যে শক্ত একটা মুখোশ না আঁটলে কৃতী হ'তে পারবো না জীবনে। আমার চাকরি, আমার বিয়ে, নেলির স্ত্রীধন, এই বাড়ি, বাগান, যা-কিছু দেখছেন, সবই আমার মুখোশ।

কিন্তু সেদিন কোনো ঢাকনা ছিলো না আমার, খোলশ ছিলো না, আমার দুর্গ গ'ড়ে ওঠেনি তখনও, জগতের সব বৃষ্টি রোদ বাতাসের সামনে একেবারে খোলা প'ড়ে আছি, অসহায়। আমাকে কাজল-মামির সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়ে দিয়ে মিতু চ'লে গেলো। বারান্দার পরে পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা বাগান—'সাজানো বাগান' নয়, কয়েকটা পুরোনো আম-কাঁঠাল গাছ, কিছু ফুলের চারা, বর্ষায় ঘাস লম্বা হয়েছে। মেঘ ছিলো পশ্চিমের আকাশে—লাল, সোনালি, গোলাপি, হলদে, আর সেই মেঘেরই ফাঁকে-ফাঁকে এক ঠাণ্ডা নরম গভীর নীল ফুটে উঠছে এখানে-ওখানে; আমি দেখছি সেই মেঘ আর আকাশ, কিন্তু মাঝে-মাঝে, আকাশ আর আমার চোখের মধ্যে, সমুদ্রের তলা থেকে কোনো আশ্চর্য প্রাণীর মতো, ভেসে উঠছে এক তরুণীর মূর্তি, স'রে-স'রে যাচ্ছে এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে, সবুজ শাড়ি, হলদে ব্লাউজ, যেন আকাশের আর বাগানের রঙের সঙ্গে মেলানো, পাতার ফাঁকে ঝিরিঝিরি হাওয়ার মতো হালকা। হঠাৎ কাজল-মামিকে বলতে শুনলাম, 'মিতুকে সুন্দর দেখাচ্ছে—না?' আমার চোখ স'রে এলো কাজলের দিকে, তার ঠোঁটের কোণে ঝাপসা একটু হাসি দেখলাম।

নরম গলায়, ঘুমেল স্বরে কাজল আবার বললো, 'তোমার উপহার মিতুকে দিয়েছি আমি। হাতে নিয়ে তক্ষুনি উল্টেপাল্টে দেখলো বইটা, তারপর বললো, "অদ্ভুত, লিখে দেয়নি তো।" সত্যি—লিখে দাওনি কেন?' আমি একটু লাল হলাম বোধহয়, লজ্জা চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লাম, 'এই বাগানটুকু বেশ লাগছে আমার।' তারপর, কাজল-মামির সঙ্গে আলাপ করার জন্যই আবার বললাম, 'কলকাতায় ফটিক-মামার ফ্ল্যাটে নাকি ঘরের সঙ্গেই ছাত আছে? তুমি গিয়ে টবে বাগান করতে পারবে।' 'তুমি কি আমাকে বাগান-বিশারদ ঠাওরালে?' 'না, তা নয়—আর তাছাড়া ঐ চারতলায় ঠিক বোধহয় সুবিধেও হবে না তোমার। জানো, আমি মনে-মনে অন্য একটা বাড়ি ঠিক ক'রে রেখেছি তোমাদের জন্য।' 'আমাদের জন্য? মানে?' আমি সেই হেশাম রোডের টু-লেট-ঝোলানো একতলা বাড়িটার কথা বললাম, একদিন হাঁটতে-হাঁটতে দৈবাৎ যেটা চোখে পড়েছিলো আমার, বেলা দশটার ঝকঝকে রোদ্দুরে। ভেবেছিলাম, কাজল হাসবে আমার ছেলেমানুষিতে, কিন্তু তার মুখে কোনো রেখা পড়লো না। আর তখন আমি ঠিক তা-ই বললাম, যা কাজলের কাছে কখনো বলা উচিত ছিলো না, যা আমি ফটিক-মামাকে বা আমার মা-কেও বলিনি কখনো, শুধু নিজের মনে অনেকবার ভেবেছি। 'আচ্ছা, বলো তো, ফটিক-মামা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন তাঁর কাছে? তোমরা কলকাতায় থাকলে চমৎকার হয়, আমি মাঝে-মাঝে—' আমার কথা শেষ হ'লো না, কাজল-মামির চোখে ফুলকি জ্ব'লে উঠলো হঠাৎ, একটি গভীর রং ছড়িয়ে পড়লো তাঁর সারা মুখে। আর সেই মুহূর্তে কাজলকে আমি আবিষ্কার করলাম।

আমার কাছে তখন জগতের স্ত্রীলোকেরা দুই অংশে বিভক্ত: 'মেয়ে' ও 'ভদ্রমহিলা'। 'মেয়ে' তারাই, যারা আমার কাছাকাছি বয়সী (সাধারণত দু-পাঁচ বছরের ছোটো), আর 'ভদ্রমহিলা'দের সরিয়ে রেখেছি আমার মায়ের দলে—তাঁরা আলাদা একটা সম্প্রদায়। 'মেয়েরা' আমার মনোযোগের যোগ্য (তাদের কোনো-একটিকে আমি বিয়েও করতে পারি কোনো-একদিন), কিন্তু অন্যদের সঙ্গে (আমার প্রাপ্য সেবাটুকু ছাড়া) কোনো সম্পর্ক নেই আমার। এই ধারণার জন্য আমি চেহারা দেখে মহিলাদের বয়স ঠিক বুঝতে পারি না, বিবাহিত হ'লেই আমার কৌতূহলের সীমানার বাইরে ঠেলে দিই

তাদের, আর কেউ যদি 'কাকিমা', 'মাসিমা', 'মামিমা' ব'লে আখ্যাত হ
তাহ'লে তার দিকে ঠিক তাকিয়েও দেখি না, বা তাকালেও দেখতে পাই—
বাস্তব মানুষটাকে নয়, 'কাকিমা' বা 'মামিমা' নামাঙ্কিত একটা চিহ্নকে
তাছাড়া আমি কাজলকে এতদিন দেখেছি শুধু বাড়িতে, সেই বক্সিবাজারের
অত্যন্ত চেনা দেয়াল ক-খানার মধ্যে—সেখানে সে ফটিক-মামার স্ত্রী, আমার
মা-র অনুগত ছায়া, মা-কে আর মামাকে বাদ দিয়ে তার যেন অস্তিত্বই নেই
যদিও প্রায় এক বছর ধ'রে কাজল আমাদের পরিবারভুক্ত, আমার মনে পড়ে ন
তার সঙ্গে আজকের আগে আলাদা ক'রে গল্প করেছি কখনো, সে যে
আমার গেঞ্জি কেচে দেয়, আমার নিজেরই দোষে হারিয়ে-যাওয়া বই কিংবা
জুতোর পাটি খুঁজে বের করে, তারও বিশেষ মূল্য দিইনি আমি, ধ'রে নিয়েছিলুম
এ-সবই তার কাজ, এইভাবেই দিন কাটাবে সে যতদিন না ফটিক-মামা তাকে
কলকাতায় নিয়ে যান। সে কলকাতায় সংসার পাতলে আমার সুবিধে
হবে, বাড়ির বাইরে আর-একটা বাড়ি হবে—আমার মনে এটাই ছিলো বড়ো
কথা, কাজলের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা ও পরিচয়। আমি তাকে জেনেছি এক সেবা-
পরায়ণ, সুবিধাজনক আত্মীয়া হিশেবে—যে কখনো ভোলে না যে আমি চায়ে
মাত্র এক চামচে চিনি খাই, বিকেলে আমাদের চায়ের আসরে যে জনে-জনে
এগিয়ে দেয় তারই তৈরি শিঙাড়া বা পাঁচ রকম কেক-বিস্কুট, যে আমাকে মনে
করিয়ে দেয় (যেহেতু চা খেতে-খেতে বই পড়তে আমি ভালোবাসি) যে
শিঙাড়া ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, বা কেকটা এসেছে আমারই প্রিয় আবেদ-এর
দোকান থেকে—সংক্ষেপে, আমার আরামে যে নানাভাবে জোগান দেয়,
কিন্তু আমার জীবনে যে স্থান পায় না। কিন্তু সে-মুহূর্তে, বকুল-ভিলার
বারান্দায় যখন মেঘের রং মিলিয়ে যাবার আগে গাঢ় হ'য়ে উঠছে আর
সন্ধেবেলার বাতাস যেন হলদে-সবুজ আঙুরের মতো গোল হ'য়ে উঠে কাঁপছে
আমার চোখের সামনে, তখন আমি 'মামিমা'টা বাদ দিয়ে তাকে শুধু 'কাজল'
ব'লে ভাবলাম, আর তখনই দেখতে পেলাম সে বয়সে খুব বড়ো নয় আমার
চাইতে, আর তার মুখে বসানো আছে একজোড়া কালো, তরল, গভীর চোখ,
যা ফোলা-ফোলা পাতার তলায় সম্পূর্ণ খুলে গিয়ে, ঘুমের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে,
আমার দিকে এক ঝলক বিদ্যুৎ ছুঁড়ে দিলো।

টেবিলে-টেবিলে চা আর খাবার যখন পরিবেষণ করা হচ্ছে তখন একটা

চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠলো, শোনা গেলো অনেকের গলায় ফিশফিশে গুঞ্জন—'বিভাবতী—বিভাবতী দত্ত।' তাকিয়ে দেখি, একজন সুশ্রী খদ্দর-পরা মহিলা দরজার ধারে দাঁড়িয়েছেন, মিতুর মা-বাবা এগিয়ে গেছেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে, অনেক চোখ তাঁর দিকে ফেরানো। সকলের উদ্দেশে হাত তুলে নমস্কার করলেন মহিলাটি, তারপর মিতুকে বললেন, 'আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না, তোমার গান শোনাও আজ আমার ভাগ্যে নেই, তোমাকে শুধু একবার দেখতে এলাম এই শুভদিনে।' মিতু আনন্দে লাল হ'লো, অনাদিবাবু বললেন, 'আপনি এখানে বসবেন আসুন। মিস্টার জোন্সের সঙ্গে চরকা নিয়ে তর্ক হচ্ছিলো আমার, আপনার মতটা জানতে চাই।' 'যদি অপরাধ না নেন, আমি বরং মিতুর সঙ্গে একটু গল্প করি—আমাকে এক্ষুনি চ'লে যেতে হবে।' মহিলাটির সঙ্গে একটি মেয়েও এসেছে, দু-জনকে আমাদেরই টেবিলে নিয়ে এলো মিতু, আলাপ করিয়ে দিলো। 'আমার বন্ধু, বুলবুল চৌধুরী, স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম আমরা। আর এঁকে নিশ্চয়ই চিনিস, বুলবুল?' 'ঠিক চিনি বলা যায় না, মুখ চিনি।' ব'লে বুলবুল ঈষৎ মাথা নোয়ালো আমার দিকে। 'আর ইনি আমাদের কাজল-মামি।' কথাটা শুনে আমার আবার মনে হ'লো যে মিতু ভুলে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে তার আলাপ কত নতুন। 'বসুন, বিভা-দি, বুলবুল, বোস। রণজিৎ, আপনি বিভা-দিকে চেনেন তো?' আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি বরং ওদিকটায় গিয়ে বসি।' বুলবুল নামের মেয়েটি তক্ষুনি ব'লে উঠলো, 'কেন, এটা মহিলাদের জন্য রিজার্ভড নয় আশা করি? মিতু, তুই একটা চেয়ার টেনে আন না এখানে।' এমনি ক'রে চারজন মহিলার মধ্যে ব'সে আমাকে চা খেতে হ'লো সেদিন।

বিভাবতী দত্ত: নামটা আমার মগজের মধ্যে ঘোরাঘুরি ক'রে বেড়াতে লাগলো, কিন্তু বিশ্রাম পেলো প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে, যখন 'মহিলা-বিদ্যালয়', আর 'স্বদেশী মেলা', এই কথা দুটো আমার কানে এলো। আমার অবাক লাগলো যে নামটা শোনামাত্র আমি বুঝতে পারিনি যে ইনিই সেই বিভাবতী দত্ত, ঢাকা শহরে মিতু বর্ধনের চেয়েও অনেক বেশি বিখ্যাত যিনি, যিনি প্রায় একটা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছেন। বুঝতে পারিনি, তার কারণ আমার মন তখন ব্যাপৃত ছিলো একটা নতুন দেশের পথঘাট চিনে নেবার চেষ্টায়, যে-দেশে আমি একটু আগে অতিথির মতো ঢুকেছি, কিন্তু যার বাসিন্দা

হওয়া হয়তো বা অসম্ভব নয় আমার পক্ষে। আর-এক কারণ: বিভাবতীর খ্যাতির সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল ছিলো না, অন্তত আমার চোখে ছিলো না। ঢাকা য়ুনিভার্সিটির একজন প্রথমতম মহিলা এম. এ.; বিয়ে করেননি। তাঁরই স্থাপিত মহিলা-বিদ্যালয়, স্বদেশী মেলা, 'মুক্তধারা' পত্রিকা, এই সব নিয়ে দেশের কাজে উৎসর্গিত তাঁর জীবন। ঢাকায় তিনিই বোধহয় একমাত্র মহিলা যিনি বেরিয়ে এসেছেন পুরোপুরি অন্তঃপুর থেকে, আর তিরিশের কাছাকাছি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থেকেও এড়িয়ে গেছেন লোকনিন্দা;—ঢাকার মতো শহরে, যেখানে মেয়েদের নামে কুৎসা রটানো লোকেদের একটি প্রধান ব্যসন, সেখানেও বিভাবতীর বিষয়ে কোনো ছায়াচ্ছন্ন উক্তি অত্যন্ত অস্পষ্টভাবেও কেউ করেনি কোনোদিন। আমি তাই ধ'রে নিয়েছিলুম তাঁর ব্যক্তিত্বে একটা দূরত্ব থাকবে—রুক্ষ চুল, তীক্ষ্ণ চোখ, শরীরটি ছিপছিপে, প্রায় শীর্ণ, এক কথায়, একজন 'ইণ্টেলেকচুয়েল' মহিলা ব'লে তাঁকে কল্পনা করেছিলুম। কিন্তু আমার এই মানসমূর্তিকে সরিয়ে দিয়ে সে-জায়গায় আস্তে-আস্তে অন্য একজনকে বসাতে আমি বাধ্য হলাম—যাঁর চেহারাটি নারীত্বমণ্ডিত, গোল ধাঁচের মুখ, একটু ভারি শরীর, যাঁকে কাজলের পাশে দেখে আমার মনে হচ্ছিলো যেন কাজলেরই এমন কোনো দিদি যিনি দৈবাৎ কোনো পূর্বপুরুষের ফর্শা রং পেয়েছেন। শাদা খদ্দরের শাড়ি-জামা তাঁর পরনে, কিন্তু এতেই বেশ সুসজ্জিত দেখাচ্ছে তাঁকে—যেন তাঁর মুখের স্বাভাবিক লাবণ্য যে-কোনোরকম সাজগোজ বা তার অভাবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে নিজেকে। আমার কল্পনায় তখন তিরিশ বছর বয়স যদিও প্রায় প্রাচীনতার শামিল, তবু বিভাবতীর মধ্যে আমি সেই সব লক্ষণই দেখতে পেলাম যা এতদিন শুধু আমারই কাছাকাছি বয়সী মেয়েদের মধ্যে আবদ্ধ ব'লে ভেবেছি আমি। 'মেয়ে' ও 'মহিলা'র মধ্যে যে-ভেদরেখা আমি বানিয়ে নিয়েছিলাম, যা একটু আগে টলিয়ে দিয়েছিলো কাজল, এবার তা চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেলো।

৭

আজ্ঞে?···না, আমি বেশি কিছু খাই না, যেটুকু দরকার নিয়ে নিচ্ছি, আপনি আমার জন্য ভাববেন না। চিবোতে ক্লান্ত লাগে আমার, আমি লিকুইড ডায়েটেরই বেশি পক্ষপাতী। হ্যাঁ, সকাল থেকেই। নেশা? আরে মশাই, নেশা যদি অত শস্তা জিনিশ হ'তো তাহ'লে মানুষের সুখী হবার বাধা ছিলো কী? হয় না, কিছুই হয় না, কিছুতেই কিছু হয় না। দু-এক মিনিটের ব্যাপার শুধু, বুদ্বুদ, ফুলকি জ্ব'লে উঠে নিবে যায়। হয়তো কখনো রক্ত একটু চনচন ক'রে ওঠে, মন থেকে ভয় চ'লে যায়, মনে হয় এবার ঘুমোতে পারবো। কিন্তু না, যখনই মনে-মনে ভাবি এবার আমি ঘুমিয়ে পড়ছি তখনই ঘুম ছুটে যায় চোখ থেকে। ঘুমের জন্য তাই অন্য দাওয়াই খুঁজে নিতে হয়, জোটাতে হয় নানা জায়গা থেকে, হাতের পাঁচ গায়ত্রী গ্রেগরি। তা এমন কী খারাপ আমার জীবনটা, বলুন। বেশ তো কেটে যাচ্ছে। আছি নিজের মনে, কারো সাতে-পাঁচে নেই, কেউ বলতে পারবে না আমি তার ক্ষতি করেছি। তাছাড়া, একটু বীরত্বও আমি দাবি করতে পারি হয়তো;—আসলে আমার কিছুই ভালো লাগে না, না মদ না মেয়েমানুষ না গোলাপ ফুল, কিন্তু ভান করছি, নিজের কাছেই ভান করছি, যেন ভালো লাগছে। ভান ছাড়া কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে?

কিন্তু আপনার সব ঠিক আছে তো? কাঁকড়ার স্যুপটা ভালো লাগলো? কন্যাকুমারিকার কাঁকড়া, এ-অঞ্চলে এর রসজ্ঞ ব্যক্তি বেশি নেই অবশ্য—প্রতাপান্বিত ভেজিটেরিয়ান সব। ওরা মুর্গি দিয়ে স্প্যানিশ রাইস রেঁধেছে দেখছি, বুদ্ধি ক'রে তবু ভাত করেছে যা হোক। আপনাকে মাছের-ঝোল-ভাত খাওয়াতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু ও-সব তো আর গোয়ান রাঁধুনির হাত দিয়ে বেরোয় না। যেমন স্কটল্যাণ্ডের জল আর ঠাণ্ডা ছাড়া সত্যিকার হুইস্কি হয় না, তেমনি সত্যিকার বাঙালি রান্নার জন্যেও চাই বাংলার স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া, বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার নারী। ওটা একটা ম্যাজিকের

মতো ব্যাপার, মশাই, কিমিয়ার মতো, কোনো কুক্‌-বুকে লেখা যাবে না কখনো, কোনো এক রহস্যময় 'এক্স' আছে ওর মধ্যে যাকে আমরা বলি 'হাতের তার', সেটুকু বাদ পড়লেই সব পণ্ড হ'লো। ভেজাল আমার দু-চক্ষের বিষ, আমি দিশি খানার লোভে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া ক্লাবে ঢুকি না, সাহেবদের মুখে 'কারি' কথাটা শুনলে আমার ব্রহ্মতালু জ'লে যায়। তামিল থেকে ঐ কথাটাকে তুলে নিয়ে ইংরেজরা কী জুলুম চালাচ্ছে ভেবে দেখুন—শুক্তোও 'কারি', চচ্চড়িও 'কারি', মুড়িঘণ্টও 'কারি'! বিসমিল্লা!

তা জানেন, নেলির কেমন একটা করুণ আস্থা ছিলো তার কুকবুকগুলোতে। রান্না নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো দরকারই নেই তার, বাবুর্চি বাঁধা-ধরা যা রাঁধে দিব্যি খেয়ে নেয়া যাচ্ছে, কিন্তু নেলির ভাবটা যেন সুখে-থাকতে-ভূতে-কিলোয় গোছের। বই দেখে-দেখে নিত্যি নতুন রেসিপি লিখে দেয় বাবুর্চিকে, কিন্তু জমকালো ফরাশি নামগুলোর তলায় স্বাদে-সোয়াদে তফাৎটা ঠিক টের পাওয়া যায় না। আমি আপত্তি করি না তবু—বেশ তো, নেলির এই যখন এক শখ চেপেছে, ক্ষতি কী? কিন্তু মুশকিল এই যে নেলি তারিফ শুনতে চায় আমার মুখে—যেমন তার ছবি আঁকায়, পিয়ানো বাজানোয়, তেমনি—যেন গুণপনার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই, বিশেষ কোনো-একজন মানুষের প্রশংসা পাওয়াতেই তার সার্থকতা। হাসি পায় আমার, মেজাজ বিগড়ে যায়, যখন নেলি খেতে ব'সে জিজ্ঞেস করে ভালো হয়েছে কিনা, এমনভাবে তাকায় যেন সম্পাদককে কোনো লেখা পড়তে দিয়ে তরুণ লেখক দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে। শেষটায় একদিন না-ব'লে পারলুম না, 'বাংলায় বলে যেচে মান, কেঁদে সোহাগ। তেমনি হ'লো বই প'ড়ে রান্না।'

সহজ হয়নি অবশ্য ঐ বাংলা বচনটার ইংরেজি তর্জমা ক'রে ওকে বোঝানো। তা মিনিট পাঁচেক চেষ্টা ক'রে নেলির মাথায় সেঁধিয়ে দিয়েছিলুম রসিকতাটা। না, বাংলা আমি শেখাইনি ওকে, আমিও ওর গুজরাটি শিখিনি—কী দরকার? কী হবে ও-সব গেঁয়ো ভাষা শিখে—কী আছে ও-সবে? ইংরেজি আছে আমাদের, জগতের ভাষা, তা-ই যথেষ্ট। ইংরেজি ভাষার জন্যেই তবু মাঝে-মাঝে ভারতবর্ষ নামে একটা ব্যাপার অনুভব করা যায়, উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণের সঙ্গে তামিল চেট্টির কথাবার্তা চলে, বিয়ে হ'তে পারে বাঙালির সঙ্গে গুজরাটির। শুধু কি ভাষা? যাকে আমার ঠাকুমা

বলতেন 'সাহেব-সাহেব খেলা', সেটাই হ'লো আসল মিলনমন্ত্র। নয়তো দেখুন বামুন-শুদ্দুর, আমিষ-নিরিমিষ, ছোঁবো কি ছোঁবো না, খাবো কি খাবো না—ঝামেলা কত! এ-সবের ওপরে উঠতে পারে শুধু তারাই, যারা মনে-মনে ও আচারে-ব্যবহারে আধা-সাহেব ব'নে গেছে—ঠিক না? আমি নেলিকে বরং উৎসাহ দিয়েছিলুম জর্মান শিখতে, ওর মরচে-পড়া ইটালিয়ানটা ঝালিয়ে নিতে—দেশভ্রমণের সময় খুব কাজে লাগে ওগুলো, দু-চারখানা পড়ার যোগ্য বইও আছে, যদি কেউ পড়তে চায়। তাছাড়া আমি চাইওনি নেলিকে 'বাঙালি ক'রে তুলতে', আমি বাংলাদেশকে আমার মন থেকে কেটে দিয়েছিলুম; আমি ভারতীয়, আমি আন্তর্জাতিক, আমি জগতের বাসিন্দা।

নেলি আবার আর-এক ফ্যাশাদ বাধিয়েছিলো যখন তার সাজগোজের ব্যাপারেও আমাকে বিশেষজ্ঞ ব'লে ধ'রে নিলে। 'বলো তো এটা মানাচ্ছে আমাকে? এই শাড়ি, এই চোলি, এই গয়না? এই পিঙ্কের সঙ্গে সিলভার-গ্রে? এই সানফ্লাওয়ারের সঙ্গে মিডনাইট-ব্ল্যাক? এই ইণ্ডিয়ান রেডের সঙ্গে এমরাল্ড-গ্রীন?' নির্ভুলভাবে রংগুলোর পারিভাষিক নাম বলে সে—বোধহয় ছবি আঁকায় তার শিক্ষা বা কুশিক্ষার ফল ওটা—যদিও আমি চোখেই দেখতে পাচ্ছি সে কী পরেছে, আর আমার চোখে কেমন লাগছে তা-ই সে জানতে চায়। 'বাঃ! চমৎকার! খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।' বা মাঝে-মাঝে—নেহাৎ তাকে খুশি করার জন্য—'চোলিটা একটু হালকা রঙের হ'লে ভালো হয় না?' 'মুক্তো বোধহয় মানাবে এর সঙ্গে।' আমি এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলুম মশাই, যে কখনো, কোনো পার্টিতে বেরোবার আগে, তাকে দিয়ে খামকা তিনবার সাজগোজ বদলাই—বেচারা ঘেমে যায়, টাল-টাল শাড়ি নামাতে হয় আলমারি থেকে, আমি একটা ছোট্ট কৌতুক উপভোগ করি নিজের সঙ্গে, একটা ছোট্ট প্রতিশোধের রিহার্সেল চালাই।

তা ব'লে ভাববেন না যে মেয়েদের রূপ, বেশভূষা, এ-সবের মর্ম আমি বুঝি না। নেলিকে আমি যে মনোনীতা করেছিলুম তার একটা কারণ রূপ বইকি। ঠিক সেই ধরনের রূপ, যা বাংলাদেশে কখনো দেখা যায় না, কিন্তু এখনো উত্তরভারতে যা আর্য জাতির স্মৃতিকে চাক্ষুষ ক'রে তোলে মাঝে-মাঝে। যেন মহাভারত থেকে কুন্তী বা দ্রৌপদী উঠে এলেন, হঠাৎ দেখে এমনি মনে হয়

নলিনী ব্রোকারকে। ‘কাশ্মীরি ঘোটকীর মতো’—আপনার মনে আছে সুদেষ্ণার মুখে দ্রৌপদীর বর্ণনা?—তার সঙ্গে মিলিয়ে নিন। কিন্তু হায়, আমার তো আর তখন একুশ বছর বয়স নেই, তিন বছর বিলেতে কাটিয়ে ঝানু হয়েছি, নিজেকে তৈরি ক'রে তুলেছি অন্যভাবে—ছেঁটে দিয়েছি সেই সব দুর্বলতা, বোকামি, যা আমাকে ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলো কোনো-এক সময়ে। অতএব আয়তলোচনা ক্ষীণমধ্যমা বরবর্ণিনী নলিনীর সাধ্য কী যে আমার মাথা ঘুরিয়ে দেবে? অনেক আগেই নারীকে আমি আবিষ্কার করেছিলুম, লার্মিনি স্ট্রিটের বকুল-ভিলায় ভাদ্রমাসের এক সন্ধেবেলা। পেয়েছিলুম নারীত্বের সেই স্বাদ, সৌরভ, যা এই শাব্‌লির মতোই স্নিগ্ধ, উদ্বায়ী, বা মদও নয়, মদের যে-নিশ্বাসটুকু ইয়েটসের মতে প্রেতেরা পান ক'রে থাকে, সেই নিশ্বাস। যদি সেখানেই থেমে যেতাম, সেই নিশ্বাসে ও সৌরভে, তাহ'লে আমার জীবনটা আজ অন্য রকম হ'তো—ভালো হ'তো না, বড়োজোর কোনো য়ুনিভার্সিটির প্রোফেসর হ'য়ে এতদিনে কষ্টেসৃষ্টে একটি বাড়ি তুলতাম সেই বিরাট বস্তি-নগরে, যার নাম কলকাতা। ভাগ্যে আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলো ঐ মেয়েরা, যাদের সঙ্গে সেদিন আমি চায়ের টেবিলে জুটে গিয়েছিলাম।

জানেন, সেই সন্ধ্যায় আমি যেন এক নতুন চোখ পেয়েছিলুম। আমার পক্ষে অনভ্যস্ত ঐ নারীসান্নিধ্যের জন্য, আর হয়তো বাইরের ঐ আঙুর-রঙের আভার জন্যেও। মেয়েদের চেহারা ও বেশভূষার যে-সব খুঁটিনাটি আমি আগে কখনো লক্ষ করিনি, সেগুলি—কবিতায় কোনো আশাতীত মিল বা রবীন্দ্রনাথের চমকপ্রদ ‘রডোডেনড্রন’ শব্দটার মতোই—আমার চোখে পড়ছে এখন, এমনকি প্রায় সেইরকমই মূল্যবান ব'লে মনে হচ্ছে। মিতুর কালো চুলের ফাঁকে টুকটুকে লাল ফুল—যা মাঝে-মাঝে ঝাপসাভাবে ন'ড়ে উঠছে; কাজলের গলার নিচে বুকের অনাবৃত অংশটিতে চাঁদের মতো সোনার নেকলেস; বিভাবতীর সুগোল কব্জিতে একটিমাত্র চিকরি-কাটা রুলি; বুলবুলের কালো ফ্রেমের চশমার পেছনে ছোটো তীক্ষ্ণ কাঠবিড়ালি-চোখ—তাদের মাথার গড়ন, গালের ডৌল, ঠোঁটের রেখা, অর্থাৎ, মেয়েদের সাজসজ্জা ও দেহের ভঙ্গি—তার ভাবার্থ যেন এই প্রথম ধরা পড়লো আমার মনে। ‘নারী’ নামক যে-আক্ষরিক ধারণাটাকে নিয়ে আমি এতদিন খেলা করেছি মনে-মনে, তা যেন ছিলো পাঠ্যবইয়ের ভূগোল; কিন্তু আজ স্কুলের ছাত্র পর্যটক

হ'য়ে ভৌগোলিক বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়েছে—দেখছে নিজের চোখে হ্রদ পাহাড় গহ্বর যোজক অন্তরীপ, দেখছে এক অফুরন্ত বৈচিত্র্য, এক বিপুল সম্ভাবনা, ম্যাপের বইয়ে যার গুজব পর্যন্ত শোনা যায়নি। দৈবাৎ—বা হয়তো মিতুর ইচ্ছে অনুসারেই—যে-টেবিলটিতে বসতে পেয়েছিলুম, সেখানেই আমার সমস্ত মনোযোগ সংহত হ'লো; অন্যান্য টেবিলে যাঁরা আছেন আর যা-কিছু হচ্ছে—অনাদিবাবু আর জোন্সের চরকা-বিষয়ক তর্ক, মিতুর ওস্তাদজীর বাজখাঁই গলায় উর্দু-ঘেঁষা বাংলা, ফটিক-মামা, অমূল্য, অন্যান্য অতিথিরা, সবাই যেন অস্পষ্ট হ'য়ে গেলো তখনকার মতো; এক আশ্চর্য নতুন অনুভূতির তলায় চাপা পড়ল দৈনন্দিন বাস্তব—প্রেক্ষাগৃহে যখন আলো নিবে যায় আর রঙ্গমঞ্চে পর্দা ওঠে, তখন আশে-পাশে যাঁরা মনোহারিণী আছেন তাঁদের অস্তিত্ব আমরা যেমন ভুলে যাই, তেমনি। যেন শুধু এই টেবিলেই কিছু ঘটছে, যাকে প্রায় নাটক বলা যায়, আর—সবচেয়ে যা আশ্চর্য, সেই নাটকে আমাকেও একটি ভূমিকা দেয়া হচ্ছে যেন, আমি যেন অন্যদের দেখতে-দেখতেই আমার নিজের পার্ট শিখে নিচ্ছি।

পুজোর ছুটির মধ্যে স্বদেশী মেলা হবে এবার, তা-ই নিয়ে কথা বলছিলেন বিভাবতী। মিতু বুলবুল দু-জনেই ছাত্রী ছিলো তাঁর, আর বুলবুল মনে হ'লো রীতিমতো একজন সহকর্মিণী এখন, কিন্তু নতুন-চেনা কাজলকেও কথাবার্তার অন্তর্ভূত ক'রে নিলেন তিনি; কাজল সহজেই রাজি হ'লো কিছু শেলাইয়ের কাজ ক'রে দিতে, মেলায় বিক্রির জন্য। নতুন স্টল কী-কী খোলা যায়, কোন-কোন কোরাসের গান শিখিয়ে দেবে মিতু, কোন-কোনটা সোলো গাইবে, এই সব নিয়ে কথা চলছে তখন, বিভাবতী এক ফাঁকে আমার দিকে তাকালেন। 'আমরা তোমার কোনো সাহায্য কি পেতে পারি, রণজিৎ?' তিনি, বিখ্যাত বিভাবতী দত্ত, আমার সঙ্গে ও-রকম অনুরোধের সুরে কথা বলছেন, এতে আমার এমন অপ্রস্তুত লাগলো যে তক্ষুনি আমার মুখে কোনো জবাব জোগালো না। বুলবুল কথা থামিয়ে আমার দিকে তাকালো, আমি চেষ্টা ক'রে বললাম, 'বলুন, আমি কী করতে পারি?' বিভাবতী আমাকে একটা চার্ট তৈরি ক'রে দিতে বললেন, ভারতের ইতিহাস বিষয়ে, বৈদিক যুগ থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত সব প্রধান তথ্য আর তারিখ থাকবে তাতে। 'পারবে না?' 'চেষ্টা করতে পারি।' 'আর-একটা জিনিশ চাই তোমার

কাছে—"মুক্তধারা"র জন্য একটা লেখা।' 'আমি? আমি কী লিখবো?' 'কী লিখবে তাও ব'লে দিচ্ছি'—এবার কিছুটা আদেশের সুর বিভাবতীর—'"রবীন্দ্রনাথের গোরা চরিত্র।" গোরাকে উনি কেন আইরিশ করলেন, এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা। আমি জানি তুমি কবিতা লেখো, কিন্তু আমার প্রবন্ধই দরকার।' এবারে আমি সম্পূর্ণ অভিভূত হলাম, কেননা আমার যে-ক'টা কবিতা (সংখ্যায় শোচনীয়রূপে অল্প) কলকাতার ছোটো-ছোটো কাগজে এ-পর্যন্ত বেরিয়েছে, তাও যে বিভাবতী দত্তর মতো একজন ব্যস্ত ও নামজাদা লোকের চোখে পড়তে পারে তা আমার কল্পনাতীত ছিলো। আমার বিব্রত ভাবটা চাপা দেবার জন্য আমি একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললাম, 'আচ্ছা—একটা কথা জিগেস করতে পারি কি? আপনাদের মেলায় জিনিশপত্রের দাম এত বেশি হয় কেন? চার পয়সার রুমাল চার আনা?' 'কারা তৈরি করছে সেটা দেখবে না?' ব'লে কাজল একটু হাসলো আমার দিকে তাকিয়ে, আর বুলবুল ব'লে উঠলো, 'বাঃ, টাকা তোলার জন্যই তো মেলা।' কিন্তু, কেন টাকা তোলার প্রয়োজন, সেটা আমার কাছে রহস্য থেকে গেলো, বিভাবতী অন্য কথা পাড়লেন।

'আচ্ছা, দিলদার নওরোজ নাকি ঢাকায় আসছেন, মিতু কিছু জানো?' 'আমিও তা-ই শুনেছি।' 'তাঁর কোনো চিঠিপত্র পাওনি শিগগির?' 'দুটো নতুন গান পাঠিয়েছেন—স্বরলিপি সুদ্ধু।' বুলবুল জিগেস করলো, 'আজ গাইবি ও-দুটো?' 'আজ কী ক'রে গাইবো, আমি তো স্বরলিপি থেকে ঠিক-ঠিক সুর তুলতে পারি না,' সরলভাবে, আমার মনে হ'লো মধুরভাবে নিজের এই অক্ষমতাটুকু স্বীকার করলো মিতু। 'কলকাতায় গেলে দিল-দার কাছেই শিখে নেবো।' 'আশ্চর্য মানুষ!' বললেন বিভাবতী, 'আমার সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিলো কেষ্টনগরে—একই কনফারেন্সে গিয়েছিলুম আমরা। যেমন হাসি, তেমনি গান, তেমনি আনন্দ। একেবারে প্রাণের ফোয়ারা।' 'হ্যাঁ,' মিতু সোৎসাহে মাথা নাড়লো, 'দিল-দা যেখানেই যান উনি একাই একশো। আর কী-রকম চা ভালোবাসেন! আর গান একবার শুরু হ'লো তো অন্য কিছু খেয়াল থাকে না। মাঝে-মাঝে চা আর পান-জর্দা পেলেই হ'লো—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়।' 'দেখতেও অসাধারণ,' ব'লে উঠলো বুলবুল। 'বাবরি চুল মাঝখান দিয়ে সিঁথি-করা, বড়ো-বড়ো টলটলে চোখ, চোখের কোণ

ছুটি লালচে, হলদে বা গেরুয়া রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি আর চাদর পরেন—ফুর্তিতে মাতোয়ারা সব সময়, এদিকে জেলে যাচ্ছেন, অনশন করছেন, গান দিয়ে মাতিয়ে দিচ্ছেন সারা দেশ।—অসাধারণ!' 'দিল-দাকে দেখতে হয় যখন হার্মোনিয়মের সামনে ব'সে গান লেখেন,' আমার দিকে ঝাপসাভাবে একটু তাকিয়ে মিতু বলতে লাগলো, 'খাতা আর কলম থাকে সামনে, বাজাতে-বাজাতে এক লাইন গেয়ে ওঠেন, খাতায় লেখেন, "আহা-হা" ব'লে ভাঙা-ভাঙা গলায় নিজেই হেসে ওঠেন চেঁচিয়ে, তারপর আর-একটা লাইন—এমনি ক'রে দেখতে-দেখতে পুরো গানটি লেখা হ'য়ে যায়, তারপর গেয়ে শোনান সকলকে—চোখ থেকে হাসি যেন উপচে পড়ে, ঝাঁকড়া চুল ঢেউয়ের মতো দুলে ওঠে—এক আশ্চর্য ব্যাপার।' আমার মনে হ'লো নওরোজ যেন অশরীরীভাবে এখানে উপস্থিত, তিনিই দখল ক'রে নিয়েছেন এই মহিলাদের, যাঁদের সঙ্গে আমি ব্যর্থ বাস্তবে ব'সে চা খাচ্ছি। একটু পরে বিভাবতী বললেন, 'আমি ভাবছিলাম, মিতু, আমাদের মেলার উদ্বোধনের জন্য নওরোজকে এবার আমন্ত্রণ জানাবো।' 'বেশ তো! খুব ভালো হয়!' 'শুনেছি ওঁকে ধরা খুব শক্ত?' 'তা তো জানি না, তবে ঢাকায় একবার আসার ওঁর ইচ্ছে আছে তা জানি।' 'তাহ'লে, মিতু, তুমি একবার লিখে দেখবে নাকি?' মিতু বিনীতভাবে জবাব দিলো, 'আপনি বলেন তো লিখতে পারি।' 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—উনি মোটামুটি রাজি থাকলে আমি স্কুলের পক্ষ থেকে সব ব্যবস্থা করবো, ওঁর সুবিধেমতো তারিখও বদলাতে পারি।—রণজিৎ, তোমার সঙ্গে নওরোজের আলাপ নেই?' বিভাবতী এমন সুরে কথাটা জিগেস করলেন যেন আমার ছুটো-চারটে পদ্য ছাপা হয়েছে ব'লেই আমি নওরোজের বন্ধু হবারও যোগ্য। ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, 'না, না, আমার সঙ্গে আলাপ থাকবে কী ক'রে?' মিতু আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার কিন্তু মনে হয় উনি আপনার নাম জানেন।' 'সে কী!' 'সে-সব পরে বলবো, কিন্তু উনি এলে নিশ্চয়ই আলাপ করবেন—খুব ভালো লাগবে আপনার।'

আমার অনুভূতি হ'লো আমাকে হঠাৎ কেউ এক তুঙ্গ পাহাড়ের চূড়ায় ছুঁড়ে দিয়েছে, এখানে বাতাস এত হালকা যে সহজে নিশ্বাস নিতে পারছি না। শেলির মতো ছবিতে দেখা মুখ নয়, কালিদাসের মতো কিংবদন্তী নয়, আমারই দেশের আমারই সময়ের কবি, যাঁকে চোখে দেখা, কানে শোনা যায়, যাঁর

সঙ্গে—এইমাত্র জানলাম—কোনো সময়ে আমার চেনাশোনাও হ'তে পারে। সেই দিলদার নওরোজ—একদল সুস্থ সবল ফুর্তিবাজ শিশুর মতো যাঁর কবিতা আর গান এখন খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশে—মিতুর পক্ষে তিনি কাছের মানুষ, তাকে তিনি নিজের গান শেখান, তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্র চলে তার, কত সহজে মিতু তাঁর বিষয়ে বলে—'আপনি বলেন তো লিখতে পারি,' 'আলাপ করলে ভালো লাগবে আপনার!' কিন্তু সেই পাহাড়ের চূড়ায় একটি ছোট কাঁটাও বিঁধলো আমাকে—ঈর্ষা, যেহেতু মিতুর কাছে এই কবি ঘরোয়া 'দিল-দা'তে পরিণত হয়েছেন, আর যেহেতু তিনি গান দিয়ে জয় ক'রে নিয়েছেন শুধু মিতুকে নয়, বুলবুলকেও, বিভাবতীকেও; গান—যা কবিতার অত কাছাকাছি, অথচ কবিতার চেয়ে ঢের বেশি ঋজু, সরল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সত্যি-সত্যি যা কানের মধ্য দিয়ে তক্ষুনি মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছয়—যখন কবিতা তার চিন্তার ভারে বুদ্ধির ভারে ভাষার শাসনে অনেক পেছনে প'ড়ে থাকে—সেই সুরশিল্পকেই ঈর্ষা হ'লো আমার। আমার মনে এই কথাটা ঝিলিক দিলো যে আমি যে-রকম কবিতা লিখতে চাই তা যদি লিখেও উঠতে পারি কোনোদিন, তাহ'লেও তা মহিলাদের সে-রকম প্রিয় হবে না, বা কারোরই হবে না খুব সম্ভব—যে-রকম প্রিয় এ-মুহূর্তে আমার প্রতিবেশিনীদের কাছে নওরোজের গান। কিন্তু সেইজন্যেই আমার বুকের ভেতরটা টগবগ ক'রে উঠলো নওরোজ বিষয়ে আরো অনেক-কিছু জানার জন্য—সত্যি কি তাঁকে চা, পান, হার্মোনিয়ম আর খাতা-পেন্সিল দিয়ে বসিয়ে দিলেই একঘর লোকের মধ্যে, হাসি গল্প বাহবার ফাঁকে-ফাঁকে, গান রচনা করতে পারেন তিনি? সত্যি কি মোহনবাগানের খেলা দেখে ফিরে, দার্জিলিঙের ট্রেন ধরার আগে, মাঝের পনেরো কিংবা কুড়ি মিনিট সময়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন একবার? সত্যি কি 'কল্লোল'-এর সম্পাদক, অনেক চেষ্টাতেও লেখা আদায় করতে না-পেরে, নওরোজকে তাঁরই আপিশ-ঘরে তালা বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন, আর ঐ রকম বন্দী অবস্থাতেই নওরোজ লিখে উঠেছিলেন তাঁর বোলবোলাও 'জয়ধ্বনি'—যে-কবিতা পড়ামাত্র পুরোটি আমার প্রায় কণ্ঠস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো? এই অসাধারণ, সচ্ছল, ফোয়ারার মতো কবি, গল্প শুনে যাঁকে মনে হয় আমার একেবারে উল্টো স্বভাবের মানুষ, মিতু বর্ধনকে মীডিয়ম ক'রে তাঁর কাছাকাছি পৌঁছবার ইচ্ছায় আমি অস্থির হ'য়ে উঠলাম, মনে হ'লো

মিতুর মুখে আরো অনেক কথা শুনতে পেলে আমি নওরোজের কবিত্বশক্তির গোপন উৎসের সন্ধান পাবো। কিন্তু তক্ষুনি ছোট্ট একটা ঘটনা কবি ও কবিতা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিলো আমাকে। বকুল-ভিলায় ইলেকট্রিক আলো জ্ব'লে উঠলো।

আমাদের বাড়িতে সন্ধের পর কেরোসিন-লণ্ঠন জ্বলে, বড়ো-বড়ো ছায়া লাফিয়ে ওঠে দেওয়ালে, কাঁপে হাওয়ায়, ঘরের মধ্যেও অনেকখানি রাত্রিকে নিয়ে আমরা বাস করি; সন্ধেবেলার মুমূর্ষু আলোর সঙ্গে লণ্ঠন-জ্বলা মুহূর্তটির কোনো তীব্র তফাৎ থাকে না। কিন্তু আকস্মিক বৈদ্যুতিক আলোয় বারান্দার দৃশ্যটি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো। আকাশ, মেঘ, আর গাছপালা নিয়ে যে বায়বীয় দৃশ্যপট ঝুলছিলো এতক্ষণ, তা সরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট ফুটে উঠলো শক্ত ইঁটের তৈরি চুনকাম-করা দেয়াল, চেয়ার-টেবিলের ঘন আকৃতি, টেবল-ক্লথে চায়ের দাগ; আমার প্রতিবেশিনী মহিলারাও বদলে গেলেন। নতুন আলোয় নতুন ছায়াতে আমি সজ্জিত দেখলাম তাঁদের; চা খাচ্ছেন তাঁরা, খেতে-খেতে গল্প করছেন; তাঁদের হাত, আঙুল, গ্রীবার নড়াচড়ার ফলে কখনো আমার চোখে বিঁধছে কাজলের নেকলেসের লাল আর সবুজ পাথরগুলো, কখনো এক ঝলক গাঢ়-বাদামি আভা বেরিয়ে আসছে বুলবুলের চশমার ফ্রেম থেকে, আর হঠাৎ কোনো-একটি ভঙ্গির ফলে বিভাবতীর গলায় সেই তিনটি বিখ্যাত রেখা আমি দেখতে পেলাম—সংস্কৃতে যাকে বলে 'ত্রিবলী', আমি এতদিন যাকে কাল্পনিক ব'লে ভেবেছিলাম।

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত গাইয়ে মেয়েটির অন্য এক চেহারা আমার চোখে ছিলো, আগের দিনের গানের আসর থেকে সেই ছবিটি আমি তুলে নিয়েছিলাম। হার্মোনিয়মের সামনে যে-ভাবে সে হাঁটু মুড়ে বসে, গাইবার সময় ঠোঁটের যে-সব ভঙ্গি হয়, দাঁতের যে-আভাস দেখা যায়, হার্মোনিয়মের শাদা-কালো চাবির ওপর যে-ভাবে তার সরু-সরু আঙুলগুলি খেলা করে—সেইগুলো জানা ছিলো আমার। কিন্তু আজ এসে অন্য এক মিতুকে দেখছি। সেদিন যখন মেরুন রঙের শাড়ি প'রে গান গাইছিলো, তখন কেমন গম্ভীর ভাব ছিলো তার মুখে, কেমন সহজে মেনে নিয়েছিলো জোড়া-জোড়া চোখের দৃষ্টিভরা প্রশংসা; একটু আগে সূর্যাস্তের আলোয় তাকে দেখেছিলাম, যেন সামুদ্রিক গাছপালায় জড়ানো কোনো জলকন্যা, কিন্তু

এখন তার সবুজ শাড়িটা ময়ূরের মতো নীল দেখাচ্ছে, একটু টেনে-টেনে নিশ্বাস নিয়ে সে কথা বলছে, ছোট্ট ক'রে সন্দেশ ভেঙে থেমে আছে বুলবুলের কথা শোনার জন্য—তার গানের গৌরব ভুলে গিয়ে এখন যেন প্রায় বালিকা হ'য়ে গেছে সে, কোনো উন্মুখ ফুল, এখনো ভীরু, সব পাপড়ি খোলেনি। আর এদিকে কাজল, যে এই চারজনের মধ্যে সবচেয়ে গৌরবহীন, যে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পাশ করেনি, বিয়ের পরে পাঁচ বছর বাপের বাড়িতে ঘুমিয়েছে, যার বিষয়ে আমার আগ্রহের একমাত্র কারণ শুধু এটুকুই ছিলো যে ফটিক-মামা তাকে কলকাতায় নিয়ে গেলে আমার চমৎকার একটা থাকার জায়গা হবে সেখানে—সেই কাজল হঠাৎ 'বড়ো হ'য়ে' উঠলো যেন, ভরপুর, শুধু মেয়ে ব'লেই অন্যদের সমকক্ষ ও প্রতিযোগী। এও এক বিস্ময় আমার পক্ষে। আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনের মধ্যে দিলদার নওরোজও বদলে গেলেন—বা বলা যায় স'রে গেলেন আমার মন থেকে দূরে; এখন আর আমি ঈর্ষা করছি না তাঁকে, তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও উৎস বিষয়েও কৌতূহল হারিয়েছি; কেননা তাঁর সুন্দর চোখ, ঢেউ খেলানো চুল, রঙিন চাদর, মন-মাতানো হাসি, আনন্দ, গান, এমনকি তাঁর অসামান্য কবিত্বশক্তি, এমনকি আমার নিজের কবিতা লেখার ক্ষীণ চেষ্টা—এই সব-কিছুর চাইতে অনেক বড়ো, জরুরি, অনেক বেশি অভিনিবেশ ও গবেষণার যোগ্য আমার কাছে এই ইলেকট্রিক-আলো-জ্বলা মুহূর্তটি, যা আমার কাছে প্রত্যক্ষ কিন্তু নওরোজের কাছে নয়, আর সেই আলোয়-দেখা এই চারটি মহিলা, তাঁদের বসন, তাঁদের ভূষণ, তাঁদের দেহের আঁকাবাঁকা রেখার চাঞ্চল্য, যা প্রতিটি ভঙ্গির সঙ্গে আমাকে যেন স্পর্শ ক'রে যাচ্ছে। আর চায়ের পরে মিতু যখন নওরোজের গান গাইলে, তখন সব প্রতিযোগিতাবোধ ভুলে গিয়ে, নওরোজকে ভালোবাসলুম আমি, যেহেতু তাঁরই গানের মধ্য দিয়ে মিতুকে যেন আরো একটু কাছে পাচ্ছি আমি—অন্তত আমার তা-ই মনে হ'লো তখন।

মিতুকে ?…না, মিতু তখনও চেহারা নিয়ে স্পষ্ট হয়নি, শুধু আকাঙ্ক্ষার ঢেউ উঠছে আমার মনে, কোনো অস্পষ্ট নামহীনার জন্য আকাঙ্ক্ষা। ছেলেমানুষ ছিলুম, ভগবানের দয়ায় আমরা সকলেই একটা ছেলেমানুষ থাকি। তা জানেন, সে-রাতে বাড়ি ফিরে আমি অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারিনি, আমার অন্ধকারকে নাড়া দিচ্ছিলো কয়েকটি মুখ, মেয়েদের মুখ, ভিন্ন-ভিন্ন, কিন্তু

স্থির নয়, যেন একটা নাগরদোলা আস্তে-আস্তে ঘুরছে আমার মগজে। ঘুরছে নাগরদোলা, সঙ্গে-সঙ্গে ঝ'রে পড়ছে সুর, আকাশ-জোড়া সূক্ষ্ম কোনো গান— মিতুর গলায়, মিতুর চেয়েও হাজার গুণ সুকণ্ঠী কোনো কিন্নরীর তান হয়তো, নওরোজের চেয়েও হাজার গুণ প্রতিভাশালী কোনো কবির নিঃসরণ—মিশে যায় গানের মধ্যে ছবি, ছবির মধ্যে গান, মিশে যায় এক মুখ অন্যটির মধ্যে, ধার ক'রে নেয় পরস্পরের অবয়ব—কারো নাকের দু-পাশে দেখতে পাচ্ছি অন্য কারো চোখ, কোনো ঠোঁটে অন্য কারো হাসি, কারো মাথার পেছনে অন্য কারো খোঁপা—যেন আমার জীবনবৃক্ষে হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি নারী মুঞ্জরিত হ'লো, অনেক ব'লেই আমার নাগালের বাইরে। আমি চেষ্টা করলাম কোনো-একজনকে বেছে নিতে, ধ'রে ফেলতে, আমার চোখের মধ্যে পুরোপুরি ভ'রে ফেলতে, কিন্তু আমরা যেমন জলে গা ডুবিয়েও হাতের মুঠোয় জল ধরতে পারি না, তেমনি সেই 'এক' যেন অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাকে চোখে বেঁধার চেষ্টা করতে গিয়েই আমি তাকে হারিয়ে ফেলছি। তারপর আধো-ঘুমের মধ্যে আমার মনে হ'লো যে হয়তো এক বিশ্বনারীত্ব আছে কোথাও—বস্তুহীন, বর্ণনাতীত—যার আভাসমাত্র ধরা পড়ে মাঝে-মাঝে, কখনো একজনের, কখনো অন্যজনের মুখে—তাও সব সময় সকলের চোখে নয়, বিশেষ-কোনো মুহূর্তে বিশেষ এক দর্শকের চোখে—কিন্তু দাঁড়ায় না, তক্ষুনি মিলিয়ে যায়। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন মুহূর্ত ও এমন অবস্থা সম্ভব, যখন সেই বিশ্বনারীত্বের নির্যাস বা সারাংশকে আমরা সংহত করতে পারি একটিমাত্র নারীর মধ্যে, হয়তো তাকে আমাদেরই জীবনের অংশ ক'রেও নিতে পারি? আর তখনই অন্য একটা ভাবনা ঠেলে উঠলো আমার প্রায় ঘুমিয়ে-পড়া অন্ধকার থেকে: আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে যে-অতৃপ্তি, যে-ব্যর্থতাবোধ, সেই কষ্টকে অন্য এক সরল ভাষায় তর্জমা ক'রে নিতে পারলাম—মনে হ'লো, আমার এই ক্ষুদ্র ভীরু মলিন পরিবেশ, এই অশিক্ষা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজ, আমাদের দাস-মনোভাব আর ইংরেজের ঔদ্ধত্য—সব সত্ত্বেও হয়তো সহজে নিশ্বাস নেয়া যায়, এমনকি হয়তো সুখী হওয়াও সম্ভব, যদি পাই একটি বন্ধু—বান্ধবী—সঙ্গিনী, একটি মেয়ে যাকে আমি মনের কথা বলতে পারবো, আমার কথা যে শুনবে মন দিয়ে, বুঝবে আমি কী বলতে চাচ্ছি।

৮

আস্থন, এই ঘরটায় ব'সে কফি খাওয়া যাক। এটা আমার 'স্টাডি', তা-ই হবার কথা ছিলো অন্তত, কেননা আমি এক সময়ে রটিয়েছিলুম আমি একটা অভূতপূর্ব আত্মজীবনী লিখছি, সেই মহৎ পরিশ্রমের জন্য ছোটো ঘরই আমার দরকার, আর তা-ই শুনে নেলি কোনো বিশালতর বালজাকের আন্দাজে সরঞ্জাম দিয়ে আমাকে সাজিয়ে দিয়েছিলো এই ঘরটা। এমনিতেও ছোটো ঘর ভালো লাগে আমার, অনেক বেশি নিরাপদ মনে হয়। আমার একটা কষ্ট এই যে প্রকাণ্ড সব বাংলোতে জীবন কাটাতে হয়েছে, পুরোনো দিনের ইংরেজের তৈরি বাংলো, প্রকাণ্ড ঘর, উঁচু সীলিং, বিশাল জানলা, দূরে-দূরে দেয়াল, বিরাট কম্পাউণ্ড। সব জায়গায় ইলেকট্রিসিটি পাইনি, দেয়াল-জোড়া ভুতুড়ে ছায়া, জন্তুর কঙ্কালের মতো কড়িকাঠগুলো ফাঁস বেঁধে ঝুলে পড়ার পক্ষে আইডিয়েল। রাত্রে হাওয়ার শব্দ, বাইরে পাহাড়ের মতো অন্ধকার। তারপর—এই বাড়ি, নেলির প্ল্যান, নেলির রচনা—মালাবার হিল-এ রতনদাসের প্রাসাদে গ'ড়ে উঠেছিলো তার মন— সে খাবার-ঘর তৈরি করালে যাতে একসঙ্গে পঞ্চাশজনকে বসিয়ে খাওয়ানো যায়, ড্রয়িংরুমের আসবাবপত্র আনালে লণ্ডন থেকে, আমার জন্যে বর্মি সেগুন কাঠের প্যানেল-দেয়া লাইব্রেরি-ঘর—ইত্যাদি, ইত্যাদি, এই একটা ব্যাপারে নেলির উৎসাহ উথলে উঠেছিলো একেবারে, হাঙ্গামাও কম করেনি। 'বন্‌-অ্যর', আনন্দ—এখন একটা দুঃসহ ভার আমার মনের ওপর, কোনো কাজে লাগে না, সুখভোগের বিপুল উপকরণ নিয়ে শূন্য প'ড়ে আছে। আমি ঐ পুব-খোলা বারান্দায় ব'সে সকালবেলাটা কাটিয়ে দিই, বিকেলে চ'লে আসি এই ছোটো ঘরটায়—এটার পশ্চিম খোলা, দিনের শেষতম মুহূর্ত পর্যন্ত রোদ পাই এখানে—সূর্যের অনুসরণ করি বলতে পারেন, আমি রোদ চাই, আমি আলো চাই, অন্ধকারে আমার ভয় করে। কিন্তু এই ঘরে দেয়ালগুলি ঘনিষ্ঠ, এই ঘরের ধুলোময়লা আমার সান্ত্বনা।

বুঝতেই পারছেন, নেলি যে-ভাবে ঘরটা সাজিয়ে দিয়েছিলো, তার সঙ্গে

কিছুই মেলে না এখন। আমি এটাকে সাজিয়ে নিয়েছি নিজের ধরনে, বা না-সাজিয়ে নিয়েছি। দেখছেন তো মেঝেতে বই, টেবিলে কাগজপত্র ছড়ানো (বেদরকারি, কিন্তু ফেলে দিতে আমার আলস্য), আর ঐ সোফার কুশানটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, কারো মাথার চাপে টোল খেয়ে আছে এখনো, খুঁজলে হয়তো লম্বা কালো চুলও পাওয়া যাবে দু-একটা। এই ঘরটা চাকরদের এক্তিয়ারের বাইরে, যেমন আছে তেমনি প'ড়ে থাকে, আমি দিনে-দিনে দেখি কেমন জ'মে উঠছে অজেয় ধুলো, আদিম আবর্জনা—এই জগতের ও জীবনের স্বাভাবিক অবস্থাটাকে যেন চোখে দেখতে পাই। মাঝে-মাঝে ঘরটার চেহারা ফেরে শ্রীমতী গায়ত্রীর স্বকরস্পর্শে, কিন্তু গায়ত্রীকেও আমার রোগের ছোঁয়াচ দিয়েছি আমি, তারও এই অগোছালো ভাবটা ভালো লাগছে আজকাল, আস্তে-আস্তে সেও এই আদিসত্যটা উপলব্ধি করছে যে গা ছেড়ে দেবার মতো আরাম আর নেই। জীবন মানেই প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ—নিজের সঙ্গে, বাইরের সঙ্গে, অবস্থার সঙ্গে—এমন কোন মানুষ আছে যে মুক্তি চায় না তা থেকে, চিন্তা থেকে মুক্তি, স্বপ্ন থেকে মুক্তি—জড়ের মতো নিশ্চেষ্টতার সেই আরাম যা আমার বহুকালের আকাঙ্ক্ষা, জীবনের শ্রেষ্ঠ উপার্জন? কী কষ্টের ছিলো আমার পক্ষে আমার চাকরি—দুর্দান্ত আঁটোসাঁটো ব্যাপার, বাপের বয়সী লোকদের মুখে 'স্যর স্যর' শুনে চুল পাকার অনেক আগেই হাড় পেকেছে, আঙুল নাড়ামাত্র ছুটে এসেছে লাল কোমরবন্ধ্-আঁটা মহিমান্বিত চাপরাশি। বিচারকের মুখোশ আমার মুখে, চোখে যেন পলক পড়ে না, গালের পেশী মূর্তির মতো অনড়, আমি ন্যায়ের প্রতিনিধি, আমি ধর্মাবতার। যখন আমার লাল-শালু-ঘেরা এজলাসের সিংহাসনে বসি, তখন আমি ষড়রিপুর ঊর্ধ্বে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তির ঊর্ধ্বে, বীতরাগ, বীতভয়, বীতমন্যু। যেন ইস্পাতের ফ্রেমে আটকে দিয়েছে আমাকে, হাতে-পায়ে পেরেক ঠুকে দিয়েছে—কতদিন নিঃশব্দ চীৎকারে ব'লে উঠেছি, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না, আমাকে ছেড়ে দাও!' কিন্তু কেউ শুনতে পায়নি সেই চীৎকার, কেউ কিছু সন্দেহ করেনি, টের পায়নি যে আসামিদের চোখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করে, বোঝেনি আমি বেরোবার পথ খুঁজছি মনে-মনে, দরজায়-দরজায় পুলিশ পাহারা দেখে থমকে যাচ্ছি। আমিই বুঝতে দিইনি, পাথরের মতো ঠাণ্ডা রেখেছি চোখ, কথা বলেছি মৃত্যুর মতো স্থির

কণ্ঠে—এটুকুই আমার কৃতিত্ব, আমার বীরত্ব। আর তার ওপর—এজলাসের বাইরে, বাড়িতে, বা যেখানেই যাই, আমার সঙ্গে আছেন রতনদাস ব্রোকারের কন্যা, আমার প্রিয়তমা পত্নী। যেন নরকুলে দেবতা আমরা, আমাদের দিকে তাকাতে গেলে ক্ষুদ্র মানবের ঘাড় ব্যথা হ'য়ে যায়—এমনি আমাদের জীবন। শুভ্র, বিবর্ণ, নিষ্কলঙ্ক, নিয়মাবদ্ধ, অণুপরিমাণ ধুলো নেই কোথাও, নেই জল, হাওয়া, শ্যাওলা, মর্চে—নিশ্চিন্ত, নিশ্চিত, সম্ভ্রান্ত, নির্বীজ। আমি যে সব সহ্য করেছিলুম তাতেই বুঝবেন আমি কী-রকম নিপুণ অভিনেতা। আমার বুজরুকি, আমার হাত-সাফাই, আমার জীবন। যেন আমি গরিব ছিলুম না কোনোদিন, যেন আমার বাবা পঁচাত্তর টাকা পেনশন পান না, যেন আমি নেলির মতোই আজন্ম ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করেছি, যেন আমি কাঁদিনি কখনো, উড়ে যাইনি টুকরো ছেঁড়া কাগজের মতো হাওয়ায়, দুলিনি ঢেউয়ের সঙ্গে তোলপাড়।—কিন্তু বলুন, ক্লান্তি কি আসে না একটা সময়ে? ইচ্ছে করে না কি নিচে নামতে—অন্য অর্থে নিচে, ইচ্ছে করে না কি সব গোলাপ মাড়িয়ে দিতে, সব আলো কালো ক'রে দিতে, নেলির অতি যত্নে গড়া ঝকঝকে জগতের মধ্যে আমদানি করতে একটি ক্ষত, একটি ব্যাধির বীজাণু, সূক্ষ্ম বিষের প্রস্রবণ? অবশেষে মন কি চায় না আশ্রয়, অবলম্বন—পাশে কোনো নির্ভেজাল স্ত্রীলোকের শরীর, আমার গুহা, দুর্গ—এই ঘরে, ঐ সোফায়, যেটা দু-জনের আন্দাজ বিছানা হ'য়ে যায় রাত্রে, নেলির ঐশ্বর্য থেকে দূরে, উটকামণ্ডের দ্রষ্টব্য এই বাড়িটার উজ্জ্বল আক্রমণ থেকে দূরে, গোলাপ-বাগানের প্রহসন থেকে দূরে—জন্তুর সৌন্দর্যে ও সরলতায়? আমি চেয়েছিলাম নেলির ভালোবাসার প্রতিদান দিতে, প্রতিশোধ নিতে তার আর আমার ওপর—আর এমনি ক'রেই—যেহেতু অন্য কোনো উপায়ে আমি নেলিকে আমার মনের কথাটা বোঝাতে পারিনি—আমার স্ত্রীলোক নিয়ে খেলা শুরু হয়েছিলো।

অনুমতি করুন, মন খুলে কথা বলি আপনার সঙ্গে। আপনাকে আমার বহুকালের চেনা মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার কথা আপনি সবই জানেন, বা জানতেন এককালে—কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন, আমি ভুলিনি। নেলি, ছেলেমানুষ নেলি, সুখের কাঙাল—কী সরলভাবে সে বিশ্বাস করে যে সুখী হবার জন্যই পৃথিবীতে জন্ম নেয় মানুষ, কী করুণভাবে সুখী করতে চায় আমাকে। যেন সুখ একটা বম্বাই আম বা ভীমনাগের সন্দেশ যা কেউ কারো

হাতে তুলে দিতে পারে। যেন স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা কোনো ধ্রুব বিশ্ববিধান, সৌরমণ্ডলের আবর্তনেরই মতো। কী ক'রে আমি তাকে বোঝাই যে আমি সুখী হ'তে পারি না, চাই না? ভালোবাসতে চাই না, পারি না? ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই। কী ক'রে বোঝাই আমার জীবনের প্রতিটি ঘণ্টা লজ্জা দেয় আমাকে—যদিও আমি চুরি করিনি, নারীধর্ষণ করিনি, খুব পরোক্ষেও ঘুষ নিইনি কখনো—বরং সাধুতা আর সুবিচারবোধের জন্য সরকারি মহলে রীতিমতো সুনাম আছে আমার? কী ক'রে বোঝাই, তার সঙ্গে আমার আসল গরমিলটা কোথায়। সুখ অসম্ভব, অন্তত আমার জীবনে অসম্ভব, তা জেনে নিয়েই আমি বিয়ে করেছিলুম তাকে, যে-কোনো মেয়েকেই বিয়ে করতে পারতুম—দৈবক্রমে, আমার পক্ষে সুবিধাজনকভাবে, সে জুটে গিয়েছিলো। আর 'সুখ' বলতে নেলি যা বোঝে তার মাল-মশলা প্রায় সবই সে জন্মসূত্রে পেয়েছিলো—অঢেল অর্থ, সামাজিক গৌরব, ইচ্ছে হ'লেই হাওয়া বদলাতে ব্ল্যাক ফরেস্টে বেড়াতে যাবার স্বাধীনতা: এগুলি তার কাছে নিশ্বাসের বাতাসের মতো, যাদের সঙ্গে তার পরিবারের মেলামেশা তারা সকলেই প্রায় এই শ্রেণীর, এ-রকম না-হ'য়ে অন্য রকম যে হ'তে পারে তাও যেন নেলির ধারণার বাইরে। শুধু একটি উপাদান বাইরে থেকে জোটাতে হ'লো, তার 'সুখে'র বেশ বড়ো একটা অংশ বলা যায়: 'স্বামী'—সুশ্রী, বিদ্বান, সচ্চরিত্র স্বামী। ঐ বিশেষণগুলিতে ভূষিত ছিলাম আমি—তার চোখে, তার মা-বাবার চোখেও। অভাব ছিলো না আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর, তারা কেউ-কেউ তিনশোবার কিনতে পারে আমাকে, কোনো-এক নেটিভ রাজ্যের রাজার দুলালকে জামাই পেতে পারতেন রতনদাস, কিন্তু—রমণীরতন আমারই ভাগ্যে জুটলো। কেন, কী ক'রে? একটা কারণ এই যে রতনদাস, যাঁর বিরাট ব্যবসা প্রায় তাঁর নিজেরই সৃষ্টি, আমার প্রতি ঈষৎ অনুকূল ছিলেন—আমি 'নিচু থেকে উঁচুতে' উঠেছি ব'লে; আর-একটা—আর এটাই হয়তো বেশি জরুরি—আমি প্রেমিকের ভূমিকাটিতে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছিলুম নিজেকে, যেন অচেতনভাবেই বুঝেছিলুম নেলির মনের কোন তন্ত্রীটি সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর। 'আত্মার ভগিনী', 'হৃদয়ের বাঞ্ছিতা', 'জন্ম-জন্মান্তরের সুহৃদ'—এই সব সুবচন আমি শোনাই তাকে, যা সারা জগতে বাসি হ'য়ে গেছে, কিন্তু নলিনী ব্রোকারের কাছে চমকপ্রদ, যা অন্য কোনো যুবক তাকে আমার আগেই জপিয়ে যায়নি

(কেননা কোনো বাউণ্ডুলে কবিভাবাপন্ন ছোকরা তার সান্নিধ্যেই পৌঁছতে পারবে না)—আমি, যার নেকটাইগুলি স্থচারু, নিখুঁত বিলেতি আদবকায়দা যার আয়ত্ত, ইণ্ডিয়ান পীনাল কোডের সঙ্গে রোমান আইনের সম্পর্ক নিয়ে যে আধ ঘণ্টা ধ'রে কথা বলতে পারে—সেই আমার মুখে শেলি উগো রবীন্দ্রনাথের লাইন শুনে গ'লে গেলো এই সুইৎসার্লণ্ডের স্কুলে-পড়া সেন্টিমেণ্টল নির্বোধ বালিকা। ধ'রে নিলো আমার ভালোবাসা অতি উচ্চ স্তরের—'নক্ষত্রের জন্য পতঙ্গের বাসনা', ইত্যাদি। রোমাণ্টিক কবিরা আমার জন্য জয় করলেন রতনদাসের বিপুল বিত্তের একটি অংশ এবং একটি জাঁক ক'রে দেখাবার মতো সুন্দরী স্ত্রী। এর পরে কেউ যেন আর না বলে যে কবিতা কোনো কাজে লাগে না।

বিয়ের পরেও আমি বছরখানেক প্রেমিকের ভূমিকা বজায় রেখে চললুম, একটি সুরক্ষিত, পুরুষের-দ্বারা-অস্পৃষ্ট কুমারীর টাটকা নধর শরীরটাকেও পয়লা দফায় মন্দ লাগলো না। কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই নেলি হ'য়ে উঠলো মারাত্মকরকম স্ত্রী—তার 'সুখ' আর 'স্বামী', এই দুটো ধারণা প্রায় এক হ'য়ে গেলো। 'সুখী' হবে, আমাকেও 'সুখী' করবে—হা ঈশ্বর! বিয়ের পরে কিছুদিন তার ঝোঁক চাপলো বাঙালি হবে—ধ'রে নিলে সেটাই হবে আমার পছন্দসই; স্ল্যাক্স, বিলেতি ড্রেস, সালোয়ার-কামিজ—তার কুমারী অবস্থার বিবিধ সাজসজ্জা, সব তুলে রেখে শুধু শাড়ি ধরলে সে, আমার মা-বাবা একবার আমাদের কাছে বেড়িয়ে যাবার পর শাঁখা-সিঁদুর পর্যন্ত; এমনকি আমার মা-র মতো 'ঘরোয়া' ধরনে শাড়ি পরারও চেষ্টা করলে কয়েকদিন; ভারি আপসোস চুল সে কখনই লম্বা রাখেনি ব'লে। আমি বাধ্য হলুম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে যে তার আধো-আধো বাংলার ভুল উচ্চারণ আমার পক্ষে যেমন অসহ্য, তার সাজগোজের মেকি বাঙালিয়ানাও তেমনি। মিষ্টি ক'রে বললুম, 'তুমি যেমন আছো তেমনি আমার ভালো লাগে, অন্য কিছু তোমাকে হ'তে হবে না।' আমি তাকে বোঝাই যে সিঁদুরে পারদের বিষ মেশানো থাকে, লম্বা চুল অস্বাস্থ্যকর, পার্টির পক্ষে শাড়ি যতই চটকদার হোক, চলাফেরার সময় ওর মতো বিড়ম্বনা আর নেই। —মুশকিল এই যে আমার সব কথা সে অন্ধের মতো মেনে নেয়; ভাবে, সে এ-রকম না-হয়ে ও-রকম হ'লেই, এটার বদলে ওটা করলেই, দুটি হৃদয়ে একটি আসন পেতে কোনো হৃদয়নাথ এসে বসবেন।

ক্রমশ আমাকে এমন সব উপায় খুঁজতে হ'লো যাতে তার ভুল ভাঙে, মোহাবেশ কেটে যায়, যাতে রোমান্টিক কবিতার এই মূল তত্ত্বটা সে ধরতে পারে যে স্বপ্নে ছাড়া সুখ নেই ব'লে মানুষের ভাগ্যে শুধু অতৃপ্তি। বলেছি তো আপনাকে, তার ছবি আঁকার বদভ্যাস আমি না-সারিয়ে পারিনি—সেখানেই শুরু, মৃদু হাতে। সে যদি বাজে ছবি এঁকে সুখী হ'তো, আমার কী ক্ষতি ছিলো বলুন? নিজেই ক্লান্ত হ'য়ে ছেড়ে দিতো একদিন, আমার উপদেশে এমন কী সুফল হয়েছিলো যা এমনিতেই হ'তে পারতো না? অথচ আমার ওপর এতই ভক্তি তার, যে আমার 'অপছন্দ' ব'লে বন্ধ হ'য়ে যায় তার প্যাস্টেল বোলানো, পিয়ানোয় টুংটাং, ফরাশি মেনু, বাঙালি প্রসাধন। আমি তাকে আঘাত দিতেই চাচ্ছি, কিন্তু আহত সে হচ্ছে না, রবারের বলের মতো মাটিতে প'ড়েই লাফিয়ে উঠছে। অতএব আমাকে আর-একটু রূঢ় হ'তে হ'লো, তার সুযোগ পেলাম নেলির মাতৃত্বে।

আমাদের প্রথম পুত্রের জন্মের পরে নেলির মুখে দেখলাম গর্ব আর স্নেহ মেশানো মাতৃত্বের বিখ্যাত হাসি—যেন কী বৃহৎ কর্ম ক'রে উঠেছে—জগৎ জুড়ে চলছে এই মাতৃপূজা—বলবো কী মশাই, আমার গা-ঘিনঘিন করে, বমি পায়। আপনিই বলুন, একটা শিশু কি এলিফ্যাণ্টার ত্রিমূর্তি, না কি মৎসার্টের 'দন হুয়ান' যে তা সৃষ্টি করাতে কোনো বাহাদুরি আছে? যে-কাজ কেঁচো পারে, ছারপোকা পারে, তা নিয়ে অত জাঁক কিসের? নেলি অপলক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তার সন্তানের দিকে—যে-ভাবে, ধরুন, বহুকাল ধ'রে শুধু ছাপা ছবি দেখার পর অবশেষে আমস্টার্ডামে গিয়ে মূল রেমব্রাণ্টের দিকে তাকিয়ে থাকি আমরা, বা প্রথমবার পুরীতে গিয়ে সমুদ্রের সামনে বিহ্বল হ'য়ে যাই। আমাকে বলে, 'তুমি সুখী হয়েছো? বলো, তুমি সুখী হয়েছো? দ্যাখো, কেমন তাকিয়ে আছে তোমার দিকে!' এমনি সব সনাতন বুলি, যা জপিয়ে-জপিয়ে মানুষ-মায়েরা পুরুষ-জন্তুকে 'পিতা' হ'তে শিখিয়েছে, এমনকি তার স্বভাবশত্রু সন্তানের জন্য ভালোবাসারও সঞ্চার করেছে তার মনে। পৃথিবীতে মায়েরা যা পারে খৃষ্টান মিশনারিও তা পারে না! আমি দেখলুম এই একটা রাস্তা হ'লো যা দিয়ে আমি পালাতে পারি নেলির কাতর 'ভালোবাসা' থেকে, সে ছেলেকে নিয়ে মশগুল হ'লে আমার দিকে তার মনোযোগ ক'মে যাবে, আমি স্বস্তি পাবো

খানিকটা—কিন্তু যেহেতু নেলি সর্বস্বভাবে সন্তানকেই চাচ্ছে এখন, ঐ নোংরা মাংসপিণ্ডকে বুকে চটকেই স্বর্গসুখ অনুভব করছে, তাই মাতা-পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন ব'লে আমার মনে হ'লো। আলাদা ঘরে আয়ার কাছে থাকবে, দুধ খাবে একটি মাইনে-করা স্বাস্থ্যবতী গরিবের বৌয়ের বুক থেকে, তিন মাস বয়স থেকে বিলেতি বেবি-ফুড, দিনে চারবার বাচ্চাটিকে বেশ সমারোহ ক'রে মা-র কাছে নিয়ে আসা হবে পনেরো-কুড়ি মিনিটের জন্য—এই সব উত্তম বিলেতি ব্যবস্থা চালু করা হ'লো। এদিকে নেলির বুক টনটন করে—শারীরিক, মানসিক দুই অর্থেই, কিন্তু আমার সহায় সিভিল সার্জন আর আধুনিক বিজ্ঞান (মানে, তখন যেটা আধুনিক নামে চলতো); শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে এটাই ভালো, মায়ের স্বাস্থ্য আর রূপযৌবনের পক্ষেও, এই যুক্তির কাছে হার মানলো সে, কিংবা হয়তো আমি চাচ্ছি ব'লেই আপত্তি করলো না। এইভাবেই মানুষ হয়েছে নেলির দুই ছেলে—শৈশবে আয়া, পাঁচে পড়তেই কোনো দূর স্বাস্থ্যকর শহরে মিশনারি স্কুল, সতেরোয় পড়তে-না-পড়তেই বিলেত। ছোটোটিকে কাছে রাখার জন্য বড্ড পিড়াপিড়ি করেছিলো নেলি, অনেক করুণ চাহনি ছুঁড়েছিলো আমার দিকে, রাত্রে অনেকবার তার দীর্ঘশ্বাস আমাকে শুনতে হয়েছে—বিলেতি শিক্ষার পাৎলা আবরণ ফুঁড়ে বেরিয়ে-আসা তার সেকেলে, অনগ্রসর, আলোকহীন ভারতীয় মাতৃত্বের দীর্ঘশ্বাস, কিন্তু আমি ছিলুম কর্তব্যের পথে অটল। আমরা কি চাই ন্যাম্বি-প্যাম্বি বাঙালি খোকন, চোদ্দ বছর বয়সে মায়ের কোলে ব'সে মায়ের হাতে ভাত-খাওয়া মেরুদণ্ডহীন মলিকড্‌ল্, আমরা কি চাই এমন মা, যারা জন্ম থেকে রাক্ষুসে স্নেহে ঢেকে রেখে চিরকাল শিশু ক'রে রাখে সন্তানকে? না—একশোবার, হাজারবার না! ছেলে সুশিক্ষা পাবে, ডিসিপ্লিন শিখবে, সত্যিকার মানুষ হ'য়ে উঠবে সময়মতো—অন্ততপক্ষে বিশাল চাকুরে—এর চেয়ে বড়ো কথা আর কী?

কিন্তু একটা মুশকিল এই হ'লো যে—ছেলেরা যেহেতু কাছে নেই—নেলির জীবন হ'য়ে উঠলো নতুন ক'রে পুরোপুরি স্বামীকেন্দ্রিক, আমাকে ঘিরেই ঘুরছে, পৃথিবীর সংলগ্ন একটি পাংশু, ছোটো চাঁদ যেন, আঁকড়ে আছে আমাকে, আটকে আছে কাঁটা হ'য়ে গলায়, কোনো অচিকিৎস্য দাঁত-ব্যথার মতো সারাক্ষণের সঙ্গী সে আমার। আমি তার ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝতে

পারি যে ছেলেদের জন্য কষ্ট সে ভুলতে পারছে না, কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু বলে না কখনো, আমার ওপর কোনো অভিমান, কোনো অভিযোগ নেই তার—রাগ তো দূরের কথা—সে শুধু এই চায় (আর সেটা একটা অসম্ভব চাওয়া!) যে তার সন্তানের বিচ্ছেদবেদনা, তার নিপীড়িত মাতৃত্ব, তার সব দিশি, মেয়েলি, আদিম আকাঙ্ক্ষা, যা ধনরত্ন ফ্যাশনের জৌলুশ দিয়ে মেটানো যায় না—সেই সব-কিছুর আমি পরিপূরণ করবো আমার 'ভালোবাসা' দিয়ে। ভেবে দেখুন, কী অন্যায় আবদার! ভেবে দেখুন, কী জীবন আমাদের, দু-জনে মুখোমুখী কপোতকপোতী, আছি মফস্বলে, সেই একঘেয়ে একমুঠো সমপদস্থ সরকারি মহলের বাইরে মেলামেশা নেই, কোনো সাংসারিক বা পারিবারিক সমস্যা পর্যন্ত নেই যে তা নিয়ে মনটা বিক্ষিপ্ত থাকবে—আর সেইটেই ভয়াবহ সমস্যা। কিছু বৈচিত্র্য আসতো মাঝে-মাঝে এক-আধ পশলা ঝগড়াঝাঁটি হ'লে—বজ্রপাত না হোক শিলাবৃষ্টি হ'তে পারতো, কিন্তু না—নেলির পক্ষে তা অসম্ভব, সে যাকে শালীনতার বিরোধী ব'লে জানে (আর তার কাছে সুখেরই একটি উপাদান হ'লো শালীনতা), সে-রকম কোনো আচরণ সে যে-কোনো অবস্থায় এড়িয়ে যাবে, আমি তাকে খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা ক'রে বার-বার বিফল হয়েছি। আমার বিষ-মাখানো কূট বাক্যগুলিকে সে ফিরিয়ে দিয়েছে আমারই কাছে—প্রত্যাঘাত ক'রে নয়, আস্তে স'রে গিয়ে, বিরোধের সম্ভাবনাকে অস্বীকার ক'রে। অথচ, লোকেরা যে কখনো-কখনো নিজেদের সুখী ব'লে ভাবতে পারে তার কারণ কি এই নয় যে অনেকগুলো বিরুদ্ধ জিনিশে পরিবৃত হ'য়ে থাকে তারা—কখনো দারিদ্র্য, কখনো রোগ, কখনো কোনো চেষ্টার ব্যর্থতা? জগৎকে যা টিকিয়ে রাখছে, জীবনকে যা কোনো-এক রকম অর্থ দিচ্ছে, তা সদ্ভাব নয়, অভাব; মিলন নয়, বৈপরীত্য। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থলাভ, যে-কোনোরকম সাফল্য—এই গতানুগতিক সুখগুলোর সত্যিকার স্বাদ শুধু তারাই জানে, যারা বিছানায় বন্দী থেকেছে অসুখে, আগামীকালের বাজারখরচার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছে, দেখেছে তাদের বহু প্রয়াসের ভরাডুবি, কুকুর পুষে হৃদয়বৃত্তি তৃপ্ত করেছে। বিরুদ্ধ কিছু নেই, শুধু সুখ—এই অবস্থায় দেবতারাই টিকে থাকতে পারেন না মশাই, মানুষের কথা ছেড়েই দিন। ভেবে দেখুন ঐ গ্রীক দেবদেবীদের কাণ্ড—অমরতায় অভিশপ্ত, মৃত্যুর নিষ্কৃতিও

নেই বেচারাদের, আমাদের ইন্দ্র যম বরুণের মতো প্রলয়কালেও ধ্বংস হবে না, অনন্তকাল ধ'রে কিছুই তাঁদের করার নেই আসলে, তাই তো ঐ কৃমিকীটের মতো মানুষগুলোর ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন তাঁরা, কোথাকার কে হেক্টর আর আকীলিসকে নিয়ে মেছোনির মতো কোঁদল, স্বর্গে-মর্ত্যে ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটোছুটি, গলা দিয়ে অমৃত নামিয়ে ঢেঁকুর তুলছেন ঈর্ষাবিষ—পরস্পরকে হিংসে ক'রে, অপমান করে, নাজেহাল ক'রে কোনোরকমে কাটিয়ে দিচ্ছেন স্বর্গীয় জীবন। তাহ'লে বুঝুন, নিরবচ্ছিন্ন সাধ্বী নেলিকে নিয়ে ক্ষুদ্র মানুষ আমার কী শোচনীয় অবস্থা! আমি চাই তাকে কষ্ট দিতে, তার মনে আমার প্রতি ঘৃণা জাগাতে, তার ভালোবাসার নাগপাশ থেকে মুক্তি চাই—কিন্তু অবোধ বালিকা এ-সব কিছুই বোঝে না, বা বুঝেও বোঝে না। সে যত বেশি ধৈর্যশীলা গ্রিজেল্ডা সাজে তত আমার আক্রোশ বেড়ে যায়, ইচ্ছে করে তার পাতিব্রত্যের উচ্চ চূড়াকে ধুলোয় লুটিয়ে দিই, মনে হয় ভদ্রতার বা কূট-নীতির আব্রুটুকুও আর রাখবো না, রাষ্ট্রদূতের মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কথা না-ব'লে সরাসরি যুদ্ধে নেমে যাবো, যদি বোমা ফেলে পিলে চমকে দিতে হয় তাতেও পেছ-পা হবো না; হ'লোও তা-ই—অবশেষে উশকে তুলতে হ'লো আমার ধমনীকে, শুরু হ'লো আমার স্ত্রীলোকের শরীরে ডুবে যাওয়া—আমি নিজে তা চাই ব'লে নয়, নেলির জ্ঞাননেত্র উন্মীলনের জন্য। সেই ঢাকা—বকুল-ভিলার বারান্দায় সূর্যাস্তের ও ইলেকট্রিসিটির আলোয় দেখা মহিলারা, আমার জীবনে ভালোবাসার ইচ্ছার জাগরণ—সেখান থেকে অনেক দূরে চ'লে এলাম।

৯

আপনার সময়ে ঢাকা য়ুনিভার্সিটির ছাত্রীসংখ্যা কী-রকম ছিলো? মাপ করবেন, আমি ভুলে যাচ্ছিলাম আপনি আমারই বয়সী, একই সময়ে ছিলুম আমরা ঢাকায়। মনে আছে হস্টেলের মেয়েদের চাল-চলন, সাজগোজ? শাদা শাড়ি, আধখানা মাথা আঁচলে ঢাকা, সারবন্দী হ'য়ে হস্টেল থেকে কলেজে আসে, সৈনিকের মতো সমান তালে পা ফেলে, সামনে-পেছনে দু'তিন সারিতে বিভক্ত হ'য়ে—ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকে তাকায় না। জন পনেরো মেয়ে, তরুণী, ছাত্রী, কিন্তু দেখায় বয়স্ক ও গম্ভীর, ধরনটা প্রায় খৃষ্টান নান্‌দের মতো; এমনভাবে তারা আবৃত, সংবৃত, যূথচারী—যেন কোনো মঠ থেকে নির্গত হয়েছে এই শুভ্রবসনা সারস্বত ভগিনীরা, কয়েক ঘণ্টা মন্দিরে ঘণ্টা নেড়ে ফিরে যাবে বিকেলে, ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকে না-তাকিয়ে। আমাদের পক্ষে কল্পনা করা শক্ত যে এই দুর্গবাসিনীরা আমাদেরই সহপাঠিনী, যে আমাদের মতো সাধারণ মনুষ্যের সঙ্গে কোনো মিল আছে তাদের, তারা যে কখনো হাসে বা রসিকতা করে, বা এমনকি অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কখনো কৌতূহলী হয়, তাও যেন ধারণা করা শক্ত। কলেজে একটি দুর্ভেদ্য অন্তঃপুর তৈরি আছে তাদের জন্য—যার নাম 'লেডিজ কমনরুম'—সেখানে পর্দানশিন হ'য়ে দিন কাটায় তারা, মাষ্টারমশাইরা সেখান থেকে নিয়ে আসেন তাদের, ক্লাশের শেষে ফেরৎ রেখে আসেন বিশ-পঁচিশ গজ বিপদসংকুল করিডর পার ক'রে দিয়ে। সে এক দৃশ্য, তামাশা, যখন ঘণ্টা বাজলে হঠাৎ মিনিট দুয়েকের জন্য করিডরগুলি ললনাকীর্ণ হ'য়ে ওঠে—মেষপালকের অনুবর্তিনী ভেড়ীর পাল—মাপ করবেন, বলতে চেয়েছিলাম গজরাজের অনুগামিনী হস্তিনীযূথ—না, এটাও ঠিক হ'লো না—বলা যাক 'ছাত্রী' নামক এই বিরল ও সুকুমার প্রাণীটিকে অতি যত্নে রক্ষা করছে আমাদের বিদ্যালয়—বেড়া তুলে, পাহারা বসিয়ে, গণ্ডি টেনে—হাজারখানেক মাংসাশী জন্তুর মধ্যে গুটি পঞ্চাশ ভীরু হরিণী যেন, যেন মুহূর্তের অসতর্কতা

ঘটলে শ্বাপদেরা তক্ষুনি তাদের নধর গ্রীবায় দাঁত বসিয়ে দেবে। ক্লাশেও তাদের বসার ব্যবস্থা আলাদা—ছাত্রদের সঙ্গে এক সারিতে নয়, মাষ্টার-মশাইয়ের ডেস্কের ডাইনে-বাঁয়ে গৌরবান্বিত চেয়ারে। অবশ্য এমন নয় যে ক্লাশের মধ্যেই কখনো কোনো হরিণ-চক্ষু বইয়ের পাতা থেকে ছুটে আসে না আমাদের দিকে, বা কোনো রঙিন শাড়ি করিডরে এক ঝলক চঞ্চলতা ছিটিয়ে দেয় না; তাছাড়া বিদ্যালয়ের নানা অনুষ্ঠানেও এই মহীয়সী সন্ন্যাসিনীদের দেখা যায়; বোকা ছেলেরা মাঝে-মাঝে আলাপও করে লেডিজ কমনরুমের বনাতে ঢাকা পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে—আলাপ মানে হেঁ-হেঁ, হুঁ-হুঁ, ঘাড় দোলানো, কোমর মোচড়ানো—কোনো-কোনো সাহসী ছেলে আরো একটু এগোবারও চেষ্টা করে, কিন্তু—লক্ষ্ণৌয়ের খোলা চিড়িয়াখানায় খালের-জলে-ঘেরা ব্যর্থকাম বাঘেদের মতো, তাদেরও চেষ্টা পর্যবসিত হয় শুধু ভঙ্গিভঙ্গায়, লোলুপ দৃষ্টিতে, মানসিক ওষ্ঠলেহনের প্রহসনে। কিছুতেই ভাবা যায় না যে এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে সহজভাবে মেলামেশা কখনো সম্ভব।

আমি অবশ্য একটি উচ্চ উদাসীন ভাব বজায় রেখে চলি, যেন এই যত্নলালিত আশ্রমবালিকাদের বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার, কিন্তু সেদিন করিডরে বুলবুলকে দেখতে পেয়ে আমি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালাম। ফিলজফির রেবতী মুখুজ্জে ক্লাশে যাচ্ছেন, পেছনে অনিবার্য লেজুড় নিয়ে—কয়েকটি নতচক্ষু লতিয়ে-চলা ছাত্রী, তাদেরই মধ্যে বুলবুল। কিন্তু সে বোধহয় আমাকে দেখতে পেলো না, বা ইচ্ছে ক'রেই আমার চোখ এড়িয়ে গেলো; বা হয়তো অমনি ক'রেই আমাকে বুঝিয়ে দিলো যে অনাদিবাবুর বাড়িতে যার সঙ্গে সে প্রায় এগিয়ে এসে আলাপ করেছিলো, এই পবিত্র বিদ্যাপীঠে তার অস্তিত্ব সে স্বীকার করতে চায় না। আমার পক্ষে অসম্মানজনক এই ঘটনাটা আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু টিফিনের ছুটির পরে আমি যখন লাইব্রেরির স্ট্যাকে এসে বই ঘাঁটছি তখন হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ শুনলাম আমার পেছনে। তাকিয়ে দেখি, বুলবুল। একবার প্রতিহত হবার ফলে আমি ধ'রে নিলুম যে সেও এখানে কোনো বইয়ের খোঁজে এসেছে, আমারও ভান করা উচিত যে তাকে চিনি না। কিন্তু জায়গাটা নির্জন, সে আর আমি ছাড়া কাছাকাছি কেউ নেই কোথাও, চোখাচোখি হ'তেই হ'লো, আর পরস্পরকে পরিচিত ব'লে মেনে

ইনা-নিয়েও উপায় রলো না। সত্যি বলতে কী, বুলবুল এমনভাবে তাকালো যেন সে আমারই জন্য এসেছে এখানে, ছোট্ট ক'রে হেসে বললো, 'বিভা-দি এই বইটা আপনার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন।' 'বিভা-দি মানে—বিভাবতী দত্ত?' 'আমরা বিভা-দি বলি—আপনিও তা-ই বলবেন।' আমার মনে হ'লো আমাকে বিশেষ একটু খাতির করা হচ্ছে ; মিতু ও বুলবুল—যারা বিভাবতীর বহুকালের চেনা প্রিয় ছাত্রী—তাদেরই সমস্তরে যেন স্থান দেয়া হ'লো আমাকে ; যেন ঐ তরুণীদের জগতে, আমার সদ্য-আবিষ্কৃত নারীত্বের জগতে, আমি আরো একটু এগিয়ে গেলাম বুলবুলের মুখের ঐ একটি কথায়। কিন্তু সেটা বুঝতে দেয়াটা আমার পক্ষে গৌরবের নয়, তাই বললাম, 'আমাদের দেশে এই এক মুশকিল—মহিলারা আত্মীয় না-হ'লেও আত্মীয়তা পাতিয়ে নিতে হয় তাঁদের সঙ্গে।' আমার কথার চপল সুরে বুলবুল খুশি হ'লো না, গম্ভীরভাবে বললো, 'বিভা-দির কথা আলাদা। তিনি সত্যিকার দিদির চেয়েও অনেক বেশি। তা এই বইটা একটা ছোট্ট ভারতবর্ষের ইতিহাস—বিভা-দি পাঠিয়ে দিলেন যদি আপনার কোনো কাজে লাগে।' আমি, যাকে তিন দিনের মধ্যে সুইনবার্নের নাটক বিষয়ে ট্যুটরিয়াল দাখিল করতে হবে, কেন উনিশ শতকের কোনো ইংরেজ কবি একখানাও সত্যিকার নাটক লিখতে পারেননি, এই প্রশ্ন নিয়ে কয়েক মিনিট আগেও যে চিন্তিত ছিলো, সেই আমার কেন ভারতবর্ষের ইতিহাস কাজে লাগবে, তা মনে আনতে একটু সময় লাগলো আমার। বোধহয় আমার মুখ থেকে সেটা আঁচ ক'রে নিয়ে বুলবুল বললো, 'সেই হিস্টরিকল চার্টের জন্য—নিশ্চয়ই ভুলে যাননি?' 'ভারতের অতীত গৌরব জাহির করতে হবে?' এইটু হাসি বেরিয়ে গেলো আমার গলা দিয়ে, বুলবুল ঠোঁটে আঙুল রেখে শাসনের ভঙ্গি করলো। 'আস্তে! এটা লাইব্রেরি, এখানে কথা বলা বারণ।' তারপর নিচু গলায়, প্রায় ফিশফিশ ক'রে বললো, 'জাহির করা নয়—মনে করিয়ে দেয়া! যারা মনে রাখে তারাই মনে রাখার মতো কাজ করে।' এই শেষ কথাটা সে কি তার নিজের অনুভূতি থেকে বলছে, না কি এটা তার শোনা কথা, বই্যে-পড়া কথা, তা বুঝে নেবার জন্য আমি তার চোখের দিকে তাকালাম; চশমার পেছনে তার ছোটো-ছোটো চঞ্চল চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য স্থির হ'লো। 'আর-একটা কথা বলার আছে আপনাকে—' বুলবুলের ঠোঁট খুলে গেলো, কিন্তু কোনো কথা শোনা গেলো না,

ঠিক তক্ষুনি একটা ট্রেনের শব্দ শুরু হ'লো। লাইব্রেরির গা ঘেঁষেই রেল-লাইন, ঝকাঝক খটাংখট আওয়াজে বুঝলাম মালগাড়ি, সেই কর্কশ, ভারি, টেনে-চলা শব্দটা অল্পেই শেষ হ'লো না—প্রায় পাঁচ মিনিট আমাকে অপেক্ষা করতে হ'লো বুলবুলের মুখোমুখি, নিঃশব্দে, তার অসমাপ্ত কথাটা শোনার আশায়। ফাঁকটা ভরাবার জন্য আমরা বাধ্য হলাম দু-একবার পরস্পরের দিকে তাকাতে, হাসতে। আমি বুকের মধ্যে ঈষৎ চঞ্চলতা অনুভব করলাম; একটি নির্জন স্থানে একটি সদ্য-চেনা তরুণীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, তার কিছু বলবার আছে আমাকে—এটা যে একটা বিশেষ ঘটনা আমার বুদ্ধি তা মানতে না-চাইলেও আমার হৃদয়ে তার সাড়া জাগলো। আমার মনে হ'লো যেন বুলবুলের মুখেও আমার প্রতি একটু ঔৎসুক্যের ভাব দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সেটাকে আমার মনোমতো অর্থের সঙ্গে মানিয়ে নেয়া যাচ্ছে না; বয়সের পক্ষে এত বেশি আত্মস্থ তার মুখের ভাবটি, যেন তার ও আমার যৌবন বিষয়ে সে সচেতন নয়, কিংবা যেন সেই তথ্যটার কোনোরকম মূল্য নেই তার কাছে।

আমি বাইরের দিকে চোখ সরিয়ে নিলুম। সেখানে ঘাস সবুজ, মাঠ বিস্তীর্ণ, মেঘলা বিকেলে হাওয়ায় নড়ছে ডালপালা, কয়েকটা শালিখ লাফালাফি করছে মাটিতে। ঐ মাঠে, গাছের ছায়ায় ব'সে গল্প করা যায় না বুলবুলের সঙ্গে? সন্ধেবেলার প্রথম-তারা-ফোটা আকাশের তলায় ঘুরে বেড়ানো যায় না? নিশ্চয়ই কোথাও, কোনো নেপথ্যে, একটি নারী অপেক্ষা করছে আমার জন্য—আমার কল্পিত সেই বান্ধবী ও সঙ্গিনী—শুধু একটি দৈব ঘটনার অপেক্ষা, কোনো যোগাযোগ, ভাগ্যের কোনো ইঙ্গিত, আর তখনই সে পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসবে? কিন্তু ট্রেনের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর বুলবুল যা বললো তা শোনালো না ঘাসের মতো সবুজ, তার ফাঁকে-ফাঁকে শালিখ পাখি নেচে উঠলো না। 'আর-একটা কথা—স্বদেশী মেলার জন্য কাজ করতে আপনার কোনো অনিচ্ছা নেই তো?' 'বা:, আমি তো বলেছি ক'রে দেবো।' 'যদি নেহাৎ দায়ে প'ড়ে রাজি হ'য়ে থাকেন বিভা-দির কাছে, তাহ'লে বরং থাক।' আসলে, ঐ বই ঘেঁটে-ঘেঁটে তথ্য আর তারিখ সাজানোর কাজটি কল্পনা করতে একটুও সুখ হচ্ছিলো না আমার, কিন্তু আমি তো অপাঠ্য 'ফেইরি কুঈন'ও প'ড়ে উঠেছিলাম পরীক্ষা পাশ করার জন্য। 'এর

মধ্যে আর দায় কী আছে? আর এমন কিছু শক্ত কাজও তো নয়।' 'না—এমন আর শক্ত কী। বিশেষত আপনার পক্ষে—' বুলবুল হঠাৎ থেমে গেলো, যেন আমার পক্ষে প্রশংসাসূচক কোনো কথা এক্ষুনি কবুল করতে সে রাজি নয়। 'তা এই বইটা বিভা-দি পাঠালেন আপনার জন্য—অবশ্য লাইব্রেরিতে বইয়ের অভাব নেই, তবে এটা একটু আলাদা ধরনের, লেখকের নাম জানেন নিশ্চয়ই?' বইটা খাড়া ক'রে ধ'রে বুলবুল আমাকে পুটে ছাপা লেখকের নাম দেখালো, স্বদেশী যুগের একজন নামজাদা নেতা তিনি। 'যদি দরকার বোধ করেন—' 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!' ব'লে বইটা তার হাত থেকে নিলাম আমি, 'এঁর লেখা দ্বীপান্তরের কথা খুব ভালো লেগেছিলো আমার, এটাও ভালো লিখেছেন নিশ্চয়ই?' 'এটা ও-রকম হালকা ধরনের লেখা নয়, কিন্তু প্রতিটি কথা দেশপ্রেমে ডোবানো।' বুলবুলের শেষ কথাটা শুনে আমি একটু থমকালাম, মনে হ'লো ওটা কোনো পত্রিকার সমালোচনা থেকে তুলে নেয়া হয়েছে; আমার জানতে ইচ্ছে হ'লো বুলবুল বইটা নিজে পড়েছে কিনা, প'ড়ে থাকলে তার সত্যি কেমন লেগেছে। কিন্তু বুলবুল তক্ষুনি আবার বললো, 'ও—ভুলে যাচ্ছিলাম, "মুক্তধারা"র দুটো সংখ্যাও এনেছি আপনার জন্য। আপনার লেখাটা পনেরো দিনের মধ্যে চাই কিন্তু।' একটা ভঙ্গি হ'লো বুলবুলের কাঁধে, যেন কাজের কথা শেষ ক'রে চ'লে যাবে এবার। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আপনি কোন ইয়ারে পড়েন? কোথায় থাকেন?' 'সেকেণ্ড ইয়ার বি. এ., ফিলজফি অনার্স। থাকি কায়েৎটুলিতে।' 'তাহ'লে আমাদের কাছেই?' 'বাড়িতে কমই থাকি আমি। পরে কথা হবে—চলি।' যাওয়ার ভঙ্গিতে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলো যে আমার সঙ্গে অকারণে গল্প করার ইচ্ছে অথবা সময় তার নেই। কিন্তু কয়েকদিন পরে সে আমাদের বাড়িতে এলো একদিন, কাজল-মামিকে শেলাইয়ের জন্য কাপড় দিতে। আমি তাকে আসতে দেখিনি, শুনছিলাম পাশের ঘরে কাজলের সঙ্গে অন্য একটি মেয়ের গলা, চেনা লাগছিলো কিন্তু ঠিক যেন ধরা যাচ্ছিলো না। 'রুমাল', 'টীপয়ের ঢাকনা', 'এম্‌ব্রয়ডারি', 'হেমিস্টিচ'—এমনি কয়েকটা কথা কানে এলো আমার, কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ শুনলাম, 'রণজিৎ বাড়ি আছে নাকি?' কাজল ও-ঘর থেকেই ডাকলো 'রঞ্জু, একটু আসবে এখানে?' আমি উঠে গেলাম, বুলবুল বিশেষ লক্ষ করলো না আমাকে, কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসবেন?'

তখন প্রায় সন্ধে, রাস্তায় বেরিয়ে বুলবুল বললো, 'চলুন ঢাকেশ্বরী বাড়ির দিকটায় বেড়িয়ে আসি একটু।' আমি একটু অবাক হলাম তার প্রস্তাব শুনে, কেননা ঢাকায় তরুণ-তরুণীর (এমনকি রমনা পাড়ায় ছাড়া বিবাহিত দম্পতির) দ্বৈত বিহার একটি অসাধারণ ঘটনা। জিগেস না-ক'রে পারলাম না, 'বাড়ি যাবেন না?' 'আমার বাড়ি ফেরার তাড়া নেই।' 'আপনি কি একাই ঘুরে বেড়ান এ-রকম?' 'সাধারণত—তবে মাঝে-মাঝে কোনো সঙ্গীও জুটে যায়, এই যেমন আপনি এখন।' 'বাড়িতে কেউ কিছু বলে না?' 'নাঃ! মা-বাবা আমার আশা ছেড়ে দিয়েছেন,' ঠোঁটের কোণে হাসলো বুলবুল। তার কথা, তার ব্যবহার—সবই একটু ঝাপসা লাগলো আমার, একটু অদ্ভুত। হঠাৎ অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে প'ড়ে গেলো। আমি তখন স্কুলে পড়ি —ক্লাস নাইন-এ—সতীনাথ নামে একটি ছেলে মাঝে-মাঝে আসতো আমার কাছে। ল পড়ছে, বছর সাতেকের বড়ো আমার, আমার তখনকার বয়সের পক্ষে অনেকটাই বড়ো। প্রথম দিন, প্রথমে আমার স্কুল-ম্যাগাজিনের প্রবন্ধের প্রশংসা ক'রে, তারপর অন্য দু-একটা কথার পরেই আমাকে বলেছিলো তার পকেটে এখন এমন-কিছু আছে যা নিয়ে ধরা পড়লে অন্তত পাঁচ বছর জেল হ'য়ে যাবে তার। আমি ভেবেছিলুম চালিয়াতি, বিশ্বাস করিনি। পটুয়াটুলিতে কোনো-এক ঠিকানায় আমাকে একটা চিঠি দিয়ে আসতে বলেছিলো, আমি রাজি হইনি। রাজি হইনি, যেদিন সতীনাথ সন্ধের পরে আমাকে নিয়ে রেসকোর্সের কাছে বেড়াতে যেতে চেয়েছিলো। আমি তাকে তাদেরই একজন ব'লে সন্দেহ করেছিলুম, যারা অন্য অর্থে 'ছেলে-ধরা'—দু-একবার যাদের পাল্লায় পড়েছিলুম ব'লেই যাদের কথা ভাবতেই আমার ঘেন্না করে। নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে ওটার কী-রকম চল ছিলো ঢাকায়? হাল আমলের বিলেতি ধরনে নয় কিন্তু—ওটাই বেশি পছন্দ ব'লে নয়, বলা যেতে পারে বিকল্প, নেহাৎই দায়-সারা গোছের ব্যাপার। মেয়েরা ধরাছোঁয়ার বাইরে, এমনকি তাদের চোখে দেখাও সহজ নয়, ইডেন ইস্কুলের দেয়াল জেলখানার সমান উঁচু, কয়েকটি বিশিষ্ট পাড়ায় ছাড়া রাস্তায় পা দেন না মহিলারা, গাড়িতে চলেন খড়খড়ি তুলে দিয়ে। আর ঐ ব্যাপারটা নিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে এত উপদেশ শুনতে হয় যে ছেলেরা মাঝে-মাঝে নিজেদের, মধ্যেই কৌতূহল না-মিটিয়ে পারে না। না মশাই,

আমি ও-লাইনে ছিলুম না কোনোদিন—আমি নারীপ্রেমিক, তখনও ছিলুম, এখনো আছি। তা সতীনাথকে বালক-শিকারী ভেবে হয়তো ভুল করেছিলুম, কিন্তু তার চোর-চোর তাকানো, এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় কথা বলা, যেন একটা গা-ছমছম-করা রহস্য পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই ধরনের ভাবভঙ্গি তার—এগুলো আমার এত বিশ্রী লাগলো যে তাকে দেখলেই আমি নিজের চারদিকে পাহারা বসিয়ে দিই, তার কোনো প্রস্তাবে রাজি হই না কখনো। আস্তে-আস্তে আমার কাছে যাওয়া-আসা ছেড়ে দিলে সে, আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

কিন্তু বুলবুল মেয়ে—আমার চাইতে বেশি বয়সের সন্দেহজনক পুরুষ নয়—একটি ছিপছিপে তরুণী, মিতুর বন্ধু, বিখ্যাত বিভাবতীর দূত, তাই তার মধ্যে ঐ ঈষৎ গোপনতার ভাব লক্ষ ক'রে আমার বরং ভালোই লাগলো, আর তার স্বাধীন সাবলীল চাল-চলন দেখেও কিছুটা প্রশংসা-মেশানো বিস্ময় অনুভব না-ক'রে পারলুম না। সে কি জানে না এই নির্জন পথে তার আর আমার একসঙ্গে হেঁটে বেড়ানো কত বিপজ্জনক? কত রকম কথা ছড়াতে পারে, আমার মাথায় কোনো চরিত্ররক্ষকের ডাণ্ডা পড়তেই বা কতক্ষণ। কিন্তু আমি পুরুষ; এই ভীরু ভাবটা আমার মনে জাগলেও তা মুখে আনা অসম্ভব। কথা বলতে-বলতে বুলবুল আমাকে নিয়ে এলো ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পেছনকার আমবাগানে—নানারকম অখ্যাতি আছে জায়গাটার, চারদিকে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বুলবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো আশঙ্কার ছায়া দেখতে পেলাম না আমি; সে বললে, 'এখানে ঘাস বেশ পরিষ্কার, একটু বসা যাক আসুন। আজ বড্ড হেঁটেছি, স্বদেশী মেলার তোড়জোড় শুরু হ'য়ে গেছে তো।' 'আপনিই করছেন সব?' 'কী ক'রে ভাবলেন আমি একাই সব ক'রে উঠতে পারি?' আস্তে হাসলো বুলবুল। 'অনেকে মিলেই করা হচ্ছে—আপনিও আছেন। বিভা-দি আশ্চর্য—ঠিক বুঝে নেন কাকে দিয়ে কোন কাজ হবে।' আমি জিগেস করার সুযোগ পেলাম, 'আচ্ছা, সেদিন আপনি বলছিলেন টাকা তোলার জন্যই এই মেলা। তা-ই কি?' 'খানিকটা তা-ই। তাছাড়া লোকেদের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলারও একটা উপায় এটা।' 'কী হয় টাকা দিয়ে?' 'সে কী! এই যে বিভা-দি স্কুল চালাচ্ছেন, টাকা লাগে না? রাজবন্দীদের মামলা চালাবার খরচই কম নাকি ভেবেছেন?

এ-সব আসে কোত্থেকে? এমনি ক'রে জোগাড় হয়—সারা দেশ ভ'রে অনেক মানুষের অনেক চেষ্টায়। নবেম্বর মাসে দমদম কন্সপিরেসি কেস আসছে হাইকোর্টে। বারোজন আসামি। বিভা-দি বলেন: ভালো উকিল-ব্যারিস্টার লাগাতে পারলে অনেকেই খালাশ পেয়ে যাবে।' আমি হঠাৎ জিগেস করলাম, 'অপরাধ করেনি ব'লে খালাশ পাবে, না কি উকিলের জারিজুরিতে?' বুলবুল সরু চোখে তাকিয়ে বললো, 'দেশের কাজ করাকে আপনি অপরাধ বলেন?' 'আমি বলি না, কিন্তু যারা বিচার করছে, তাদের কাছে অপরাধ নিশ্চয়ই? তাদের আইনের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়েছে, সেটা তো ঠিক?' গম্ভীর চোখে, শাসন করার ধরনে আমার দিকে তাকালো বুলবুল। 'আইন অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার। কে কী করেছে সেটা নয়—আদালতে কী প্রমাণ হয় সেটাই আসল কথা। সেইজন্যই তো ভালো উকিল চাই।' 'তার মানে—এমন উকিল, যিনি মিথ্যেটাকেই সত্য ব'লে প্রমাণ করবেন?' গভীর রং ছড়িয়ে পড়লো বুলবুলের মুখে, যেন খুব রেগে গেছে আমার ওপর, যেন আমি তার বন্ধুতার সম্মান রক্ষা করছি না। একটু পরে শান্তভাবে বললো, 'সত্যি-মিথ্যে অত সোজা ব্যাপার নয় তো। ধ'রে নিতে হবে আপনার যাতে কাজ এগোবে সেটাই সত্য, আর মিথ্যে সেটাই যা আপনাকে বাধা দেয়।' 'গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ কিন্তু তা বলে না। তাতে সত্য বড়ো কথা।' 'ও, আপনি তাহ'লে গান্ধীবাদী?' 'না, না, আমি কোনোরকমই বাদী বা বিবাদী নই—সুযোগ পেলেই তর্ক করি, এই একটা বদভ্যাস আমার,' ব'লে আমি হাসলাম। 'আমি আবার তর্ক ভালোবাসিনা, এতে বড়ো কাজের ক্ষতি হয়। তাছাড়া—দু-জনে একমত হ'তে পারলে খুব ভালো লাগে, তা-ই না?' আমি বলতে যাচ্ছিলাম সকলেই সব ব্যাপারে সব সময় একমত হ'লে পৃথিবীটা আর বাসযোগ্য থাকতো না, কিন্তু সে-মুহূর্তে বুলবুলের সরলতায় আর উৎসাহে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়ই।'

বুলবুল আমাকে জিগেস করলে 'মুক্তধারা'র সংখ্যা দুটো আমার কেমন লাগলো। 'তা, ভালোই তো।' 'তার মানে—বেশি ভালো না? ঢাকার কাগজে ভালো লেখা পাওয়া সহজ নয় তো—বিভা-দি লেখেন ব'লেই চলছে।' বুলবুলের কথায় তার এই ধারণাটি ধরা পড়লো যে বিভাবতীর লেখা নিঃসন্দেহে 'ভালো', কিন্তু তাঁর লেখা প'ড়েই সবচেয়ে নিরাশ হয়েছিলাম আমি, ছোটো

অথচ রূঢ় একটি আঘাত পেয়েছিলাম। আইরিশ বিপ্লবীদের জীবনী লিখছেন ধারাবাহিকভাবে, কিন্তু সবটাই যেন বই প'ড়ে লেখা, লেখকের মনের কোনো স্পর্শ নেই (যদিও, ধ'রে নেওয়া যায়, বিভাবতীর মতো দেশপ্রেমিকের পক্ষে বিষয়টা খুবই উৎসাহজনক)। 'রক্তের তর্পণ,' 'স্বাধীনতার সূর্যোদয়,' 'দধীচির অস্থি'—মাসিকপত্রে অনবরতই যা পাওয়া যায়—সেই সব শব্দ, বা 'তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে, কেমন ক'রে সইবো'-র মতো অসংখ্য বার দাগা-বুলোনো কোটেশন—আমি ভাবতেই পারিনি বিভাবতী তাঁর লেখার মধ্যে স্থান দেবেন এগুলিকে। যাঁর চেহারা অত ভালো, ব্যবহার অত মার্জিত, যিনি কোনো নিমন্ত্রণে এলে লোকেরা কথা থামিয়ে চেয়ে ত্যাখে, যিনি তাঁর কর্মক্ষমতা ও চরিত্রের জন্য সকলেরই শ্রদ্ধেয় হয়েছেন,—আমি ধ'রেই নিয়েছিলাম তাঁর লেখা হবে উঁচু তারে বাঁধা, তাঁর পরনের খদ্দরের মতোই সাত্ত্বিক, তাঁর মুখের হাসির মতোই প্রসন্ন। আমার ভেবে কষ্ট হ'লো যে তাঁর অমন সুন্দর ব্যক্তিত্বের ছিটেফোঁটাও তিনি পৌঁছিয়ে দিতে পারেননি আরো অনেকের কাছে, যারা হয়তো কখনো তাঁকে চোখে দেখবে না তাদেরও জন্য, ঐ আইরিশ বিপ্লবীদের উপলক্ষ ক'রে। কিন্তু আমার এই মোহভঙ্গের কথা বুলবুলের কাছে অবশ্য উচ্চার্য নয়, আমি একটু ঘুরিয়ে বললুম, 'আচ্ছা, আপনি জানেন, এগুলো সত্যি কি বিভা-দিরই লেখা?' 'সে কী, আপনি কি ভাবছেন অন্য কেউ তাঁর নামে লিখে দিয়েছে? এমন একটা অদ্ভুত কথা কী ক'রে মনে হ'লো আপনার?' 'শুনেছি নামজাদারা নাকি সেক্রেটারি দিয়ে লিখিয়ে নেন অনেক সময়? তাতে দোষ নেই—কত জরুরি কাজ থাকে তাঁদের, বিভা-দি কখন লেখার সময় পান তা-ই ভাবছিলাম।' আমার কথাটার কপটতা বুলবুলের কানে ধরা পড়লো না, খুশি হ'য়ে বললো, 'আপনি এখনো জানেন না কী অসাধারণ মানুষ আমাদের বিভা-দি।' হঠাৎ থেমে, আমাকে চোখে বিঁধে বললো, 'আপনি বুঝি খুব সিনেমায় যান?' 'কী ক'রে জানলেন?' 'বাঃ, ছাত্রমহলে কে না জানে আপনার কথা। আর আমি আপনাকে দেখেওছি কয়েকদিন সদরঘাটের সিনেমা-হাউস থেকে বেরোতে।' আমি জানতাম না আমার গতিবিধি লক্ষ করার মতো সময় বা কৌতূহল কারো থাকতে পারে—বিশেষত কোনো তরুণীর; ঈষৎ গর্বিত হলাম মনে-মনে, কিন্তু সেই গর্ব ফুটো ক'রে দিয়ে বুলবুল বললো, 'সিনেমা দেখে সময় নষ্ট করেন কেন?' 'সময় নষ্ট কেন হবে—ভালো লাগে, তাই যাই।' একটু ভেবে বুলবুল বললো,

'আপনার কাছে ভালো লাগাটা বড়ো হ'তে পারে—আমি কিন্তু তা ভাবি না।' 'আপনি কি কখনোই যান না কোনো ফিল্ম দেখতে?' 'গিয়েছি দু-একবার, বিভা-দিই আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই যে এক কমিক অ্যাক্টর, মজার গোঁফ, পায়ে ঢলঢলে বুটজুতো—' 'চ্যাপলিন!' আমি চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম, 'আপনি চ্যাপলিনের নাম মনে করতে পারছিলেন না? আশ্চর্য!' 'আশ্চর্য কেন?' এবার একটু ভারিক্কি চালে, একটু বিদ্যে ফলাবার ধরনে আমি বললাম, 'ফিল্ম-অ্যাক্টরদের মধ্যে কেউ যদি থাকেন সত্যিকার প্রতিভাবান, আর্টিস্ট, তাহ'লে এক চার্লি চ্যাপলিনেরই নাম করতে হয়। "গোল্ড রাশ"-এ তিনি প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে তাঁর ধারে-কাছে কেউ এগোতে পারে না—ফেয়ারব্যাঙ্কস, ভ্যালেনটিনো, লন চ্যানি—কেউ না। আশ্চর্য কান্না-মেশানো হাসি—যেন অলিভার টুইস্ট, না—আরো ভালো, যেন কিং লিয়রের ফূল—যদি অবশ্য এমন হ'তো যে ঐ ফূলই শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করলে লিয়রকে আর কর্ডেলিয়াকে, যদি সুখের সমাপ্তি হ'তে পারতো নাটকটার। —তা কি সম্ভব নয়—চ্যাপলিনের লিয়র, যাতে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা হবে ফূল-এর?' হঠাৎ বুলবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কথার স্রোত থেমে গেলো, তার চোখে দেখলাম সেই সূক্ষ্ম ক্লান্তির ছায়া, যা কোনো অজানা বিষয়ের আলোচনার দ্বারা আক্রান্ত হ'লে আমাদের ভব্যতাবোধ চাপা দিতে পারে না। আমার উৎসাহে রাশ টেনে বললাম, 'আপনি বুঝি "গোল্ড রাশ" দ্যাখেননি?' 'না,' মাথাটি একটু পেছনে হেলিয়ে জবাব দিলো বুলবুল। 'তাছাড়া—আপনার ঐ চ্যাপলিন যত বড়োই অভিনেতা হোন তাতে আমাদের কী লাভ? তাতে কি আমাদের অন্নবস্ত্রের অভাব মিটবে? বন্ধ হবে ইংরেজের জুলুম? দেশ স্বাধীন হবে?' তার এই কথা শুনে আমার চোখ বিস্ফারিত হ'লো, এক ঝলক রক্ত উঠে এলো মাথায়, এটা তার পরিহাস কিনা তা বোঝার চেষ্টায় তার চোখের দিকে তাকালাম। না—কৌতুকের কোনো লক্ষণ নেই, স্থির গম্ভীর তার দৃষ্টি—তাতে মিশে আছে যেন আমার জন্য কিছু আবেদন, কিছু ভর্ৎসনা। পাছে রাগের ঝোঁকে কোনো অন্যায় কথা ব'লে ফেলি, তাই চেষ্টা ক'রে নিচু গলায় বললাম, 'আপনি কি সত্যি বলছেন যে ভারতবর্ষ যাতে স্বাধীন হবে না সে-রকম কোনো-কিছুরই কোনো মূল্য নেই?' 'আমি সে-রকম কিছু বলিনি, বলতে চাইনি। কিন্তু—' একটু থামলো

বুলবুল, দু-আঙুলে এক ফালি ঘাস ছিঁড়লো,—'আমি বিভা-দিকে দেখেছি, তাঁকে আমি দেবীর মতো ভক্তি করি, তিনি আমাকে জীবনের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই পথের দু-পাশে যে-সব নানা রঙের ফুল ফুটে আছে সেদিকে আমার তাকাবার সময় নেই, মনও নেই।' 'দেবীর মতো,' 'জীবনের পথ'—এই দুটো কথাই খট ক'রে বাজলো আমার কানে, একটু শস্তা শোনালো, কিন্তু যখন দেখলাম বুলবুল দু-চোখ ভরা বিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, যে-বিশ্বাস সে বুদ্ধি দিয়ে অর্জন করেনি, হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে, তখন আমি আমার তর্কের দানোকে চাপা দিয়ে দিলাম। 'এখানে অন্ধকার হ'য়ে আসছে, যাবেন নাকি এবার?' 'অন্ধকারকে আমার ভয় নেই—তাছাড়া আপনি তো আছেন।' আমার একটু অবাক লাগলো যে আমিই যে তার পক্ষে আশঙ্কার কারণ হ'তে পারি এটা তার কল্পনার ত্রিসীমানায় নেই। হেসে বললাম, 'আমি তেমন বলবান নই কিন্তু, কোনো দুর্বৃত্ত আক্রমণ করলে আপনাকে বাঁচাতে পারবো না।' 'তখন না-হয় আমিই আপনাকে বাঁচাবো। —কিন্তু চলুন, আমাকে আবার আরেক জায়গায় যেতে হবে।' আমবাগান থেকে বেরিয়ে, বুলবুলের পাশে হাঁটতে-হাঁটতে, তার ঠোঁটে হঠাৎ একটি ছোট্ট হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'আসল কথা কী, জানো? আমি তো তোমার মতো কবি নই, সাহিত্যিক নই, আমি অতি সাধারণ—আমি শুধু এটুকু বুঝি যে ঘরে আগুন লেগেছে, আর তাতে যদি এক বালতি জলও ঢালতে পারি তাহ'লেই আমার বেঁচে থাকা সার্থক।—এই রে, "তুমি" ব'লে ফেললাম, কিছু মনে করলেন না তো? না—মনে করার কী আছে, এই ভালো, আপনিও আমাকে "তুমি" বলবেন। কেমন—রাজি?' বুলবুল চলতে-চলতে আমার হাতটা ধরলো একবার, তক্ষুনি ছেড়ে দিলো।

১০

আমি চমকে উঠেছিলাম বুলবুলের মুখে হঠাৎ 'তুমি' শুনে, তার হাতের ছোঁয়ায় কেঁপে উঠিনি তাও নয়, আমার বয়সে ও অবস্থায় তা অনিবার্য ছিলো। আপনার তো মনে আছে তখনকার বাংলা উপন্যাসে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে বদলটা কী-বিরাট একটা ঘটনা ছিলো, লেখককে কত কাঠখড় পোড়াতে হ'তো তরুণ-তরুণীকে ঐ স্তরে নিয়ে আসার জন্য, আর হাত থেকে জলের গ্লাশ নিতে গিয়ে আঙুলে আঙুল ঠেকে যাবার ফলে, বা রোগশয্যায় কোনো নারীহস্তের স্পর্শে (নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন নায়ক-নায়িকার কেমন ঘন-ঘন অসুখ বাধাতেন লেখকেরা, তাদের কাছাকাছি আনার আর কোনো উপায় না-পেয়ে !) যত বিদ্যুৎ ছাপার অক্ষরে ব'য়ে গেছে তা দিয়ে ভারতবর্ষের পাঁচ লক্ষ গ্রামে ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে দেয়া যায়। আমাকে মানতেই হবে, আমারও শিরায় একটি ফুলকি জ্বলেছিলো বুলবুলের ঐ আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত আচরণে, কিন্তু তার দিক থেকে একেবারেই কোনো বিকার দেখলাম না, তার আর আমার মধ্যে যে অগ্নি ও দাহ্যবস্তুর একটি সম্বন্ধ বদ্ধমূল, তা যেন তার খেয়ালই নেই। মাঠ পেরিয়ে আলো-জ্বলা রাস্তায় পড়লুম আমরা, হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলতে লাগলো সে, খুবই সমতল ও সাধারণ সুরে, আর এমন স্বচ্ছন্দে নির্ভুলভাবে 'তুমি' ব'লে চললো যেন সে আর আমি বাচ্চা বয়স থেকে এক বাড়িতে বড়ো হয়েছি, যেন আমরা ভাইবোনের মতো পরস্পরের অত্যন্ত বেশি পরিচিত। তার এই মেকি অন্তরঙ্গতা আমাকে অবশ্য পীড়া দিচ্ছিলো ; এক-একটি ল্যাম্পোস্ট পার হবার সময় আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখছি তার মুখের দিকে—যেন বুঝে নেবার চেষ্টা করছি এর কতটা অংশ ছলনা বা আত্ম-প্রতারণা। মিতু বর্ধনের কথা তুললো সে, আমার সঙ্গে সেদিনের পরে আর দেখা হয়নি শুনে বললো, 'আমি পর্শু বিকেলে যাচ্ছি মিতুর কাছে—মানে শনিবার—ইচ্ছে হ'লে তুমিও আসতে পারো। অবশ্য আমার মধ্যস্থতার কোনো দরকার নেই, তুমি যা

ভাবছো তার চেয়ে ঢের বেশি সে চেনে তোমাকে। অনেকদিন ধ'রেই চেনে।... অবাক হচ্ছো? মিতুকে আবার বোলো না যে আমি বলেছি—তোমার যেখানে যা লেখা বেরোয় সব সে খুঁজে-খুঁজে জোগাড় করে—বোধহয় দিলদার নওরোজকেও তোমার কবিতা পাঠিয়েছিলো।' আমি ব'লে উঠলাম, 'ধাঃ!' 'কেন, এতে অবাক হবার কী আছে? মিতু আমার মতো কাঠখোট্টা নয়—কবিতা ভালোবাসে, নিজেও গল্প লেখে লুকিয়ে-লুকিয়ে। কিন্তু ভীষণ লাজুক, কাউকে দেখাতে চায় না, তা তুমি পিড়াপিড়ি করলে রাজি হ'তে পারে—তার সঙ্গে খুব মিলবে তোমার। ঐ যে, তোমার বাড়ি এসে গেছে, আচ্ছা—' তার বিদায় নেবার ভঙ্গি দেখে আমি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম, 'চলুন আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।' 'কোনো দরকার নেই—তাছাড়া আমি বাড়ি যাচ্ছি না এক্ষুনি। কিন্তু ঐ "আপনি"টা কি তুমি ছাড়বে না কিছুতেই? বয়সেও তো একটু ছোটো আমি, যদিও আসলে—' 'আসলে তুমিই বড়ো, যেহেতু তুমি মেয়ে,' আমি তার কথায় বাধা দিলাম, 'তা-ই না? প্রায় আমার দিদিমার বয়সী!' 'দেখলে তো, রাগিয়ে দিয়ে কেমন "তুমি" বলালুম তোমাকে, নিজেদের মধ্যে "আপনি" আমার বিশ্রী লাগে।' ' "নিজেদের" মানে?'—কিন্তু প্রশ্নটা আমার মুখ দিয়ে বেরোবার আগেই বুলবুল আবার বললো, 'আচ্ছা, আর-একটু আসতে পারো আমার সঙ্গে—ঐ লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত। তা শোনো,' আমার মুখের ওপর তার দৃষ্টি অনুভব ক'রে আমিও ফিরে তাকালাম, 'মিতুকে আমি ভালোবাসি খুব, কিন্তু সব কথা বলি না তাকে—হয়তো তার সহ্য হবে না, তাই।' আমি হাঁটা থামিয়ে বললাম, 'মানে? কী সহ্য হবে না?' 'তা তোমাকে পরে একদিন বলবো, কেমন? এখন তো দেখা হবে মাঝে-মাঝে স্বদেশী মেলার ব্যাপারে।' বুলবুলের এই কথাটায় দুটো অনুমান ছিলো যা আমাকে ভাবিত করলো; এক, তাদের স্বদেশী মেলার সঙ্গে আমিও যেন রীতিমতো যুক্ত হ'য়ে গিয়েছি ('নিজেদের' অর্থ কি তা-ই?): দুই, যেন এই মেলা হ'য়ে গেলেই তার সঙ্গে আর দেখা হবে না আমার। 'তাহ'লে তুমি আসছো বকুল-ভিলায় শনিবারে?' অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলাম, 'শনিবার? আচ্ছা দেখি।' (আসলে মিতুর বাড়িতে যাবার ইচ্ছে আমার ষোলো ছেড়ে আঠারো আনা, কিন্তু বুলবুলকে তা জানতে দিতে চাই না আমি।) 'ও, না—

শনিবার আমার অন্য একটা—' আমি হঠাৎ থেমে গেলাম, কোনো অজ্ঞাত কারণে আমার মনে হ'লো যে শনিবার আমার অন্য কোথায় যাবার কথা তা বুলবুলকে বোধহয় না-বলাই সমীচীন। মিতুর জন্মদিনে গানের আসর ভেঙে যাবার পর জোন্সের সঙ্গে আমার আবার দু-মিনিট কথা হয়েছিলো; খানিকটা সংস্কৃত পড়েছিলো ব'লে বঙ্কিমের বাংলা সে বুঝতে পারে, কিন্তু শরৎচন্দ্রকে নিয়ে অসুবিধে হচ্ছে তার, আমার পক্ষে কি সম্ভব হবে মাঝে-মাঝে তাকে সাহায্য করা? যদি সময় হয়? অসুবিধে না হয়? আমি রাজি হয়েছিলুম, জোন্স বলেছিলো তাহ'লে শনিবার যদি পাঁচটা নাগাদ চা খাই গিয়ে তার সঙ্গে।—তক্ষুনি এই ব্যাপারটা আমার মনে প'ড়ে গেলো। আমি সঠিকভাবে রাজি হয়েছিলুম কিনা মনে পড়লো না (কেননা আমার চোখ সে-মুহূর্তে স'রে গিয়েছিলো কাজলের দিকে, মিতুর কাছে বিদায় নিচ্ছিলো সে—'চলি, মিতু, খু—ব ভালো লাগলো, একদিন এসো আমাদের ওখানে।' 'আপনারা আবার আসবেন,' ব'লে মিতু চোখ ফিরিয়েছিলো—ঠিক আমার দিকে নয়, আমি যেখানে জোন্সের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলুম সেদিকে)—কিন্তু 'না' বলিনি এটা নিশ্চিত, জোন্স হয়তো ধ'রে নিয়েছে আমি যাবো, তাই আমাকে যেতেই হবে, নয়তো আমিও তার চোখে তেমনি একজন ভারতীয় ব'নে যাবো যারা নিমন্ত্রণ নিয়ে, বা ক'রে, ভুলে যায়, আর সময় বিষয়ে যাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। 'আপনি ক-টার সময় যাবেন?' 'ফের আপনি!'—বুলবুলের চোখে কৌতুক ভেসে উঠলো—'আমি কি কখনো ঘড়ি দেখে চলি ভেবেছো? যাবো সন্ধের দিকে কোনো সময়ে।' 'আমার একটু দেরি হ'তে পারে।' 'তোমার ইচ্ছে না-হ'লে আমি তোমাকে জোর করছি না—একটু স'রে দাঁড়াও।' আমাদের পেছনে একটা ঝংকৃত আত্ম-ঘোষণা বেজে উঠলো, একদল বাচ্চার উচ্চহাসির মতো সাইকেলের ঘুন্টি, ফিরে তাকিয়ে আবছা আলোয় আমার মনে হ'লো অন্ধকারে চাঁদের মতো অমূল্যর গোলগাল সদাপ্রফুল্ল মুখখানার উদয় হয়েছে। 'ঠিক চিনতে পেরেছি পেছন থেকে,' ব'লে অমূল্য কোমর থেকে পা পর্যন্ত একটি লীলায়িত ভঙ্গি ক'রে সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। আমি ধ'রে নিয়েছিলুম তার কথাটা আমারই উদ্দেশে বলা, ভেবেছিলুম আমার সঙ্গে একটি মেয়েকে দেখেই সে সাইকেলের ঘুন্টিকে তূর্যনাদে পরিণত না-ক'রে পারেনি, তাই যৎপরোনাস্তি

বিস্মিত হলুম যখন বুলবুল কথা বললো উত্তরে। 'আরে, অমূল্য! অমন অসভ্যের মতো ঘণ্টা বাজাও কেন?' 'আমি সাইকেলের বেল্-এ গিটকিরি প্র্যাকটিস করছিলাম। জানো, আমি আজ জগন্নাথ-হল-নিবাসী যুববৃন্দের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছি তাদের কর্ণকুহরে গীতবর্ষণের জন্য। অবশ্য দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারও আছে।—তুমি যাচ্ছো নাকি, রণজিৎ, সুধাংশুর ম্যানেজারিতে আয়োজিত এই তুঙ্গ ভোজসভায়? থুড়ি, মাফ কিজীয়ে, আই বেগ ইওর পার্ডন, ভুলেই যাচ্ছিলাম ও-সব ভালগার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তুমি নেই—হস্টেলের কোনো ফীস্টে কেউ কখনো ছাখেনি তোমাকে। তুমি ফুলের মধু চাঁদের সুধা পান করো—' আমি ঝাঁঝালো গলায় ব'লে উঠলাম, 'তোমার এই রদ্দি রসিকতাগুলো এবার ছাড়ো তো, অমূল্য—গর্দভের রাগিণী যদি বা শোনা যায় তার রসিকতা অসহ্য!' কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র একটু খারাপ লাগলো আমার (কেননা সাধারণত আমি কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলি না), তাছাড়া একটু লজ্জা করলো পাছে বুলবুল ভাবে সে সামনে আছে ব'লেই আমি অমূল্যকে 'জব্দ করতে' চাচ্ছি। কিন্তু অমূল্যর মুখে হাসি আরো বিস্তীর্ণ হ'লো আমার কথা শুনে (তার চামড়ায় বেঁধাবার মতো তীর বোধহয় তৈরি হয়নি), আর বুলবুল খানিকটা হাসি, খানিকটা শাসনের সুরে ব'লে উঠলো, 'তুমিও যেমন! অমূল্যর কথায় কেউ আবার রাগ করে নাকি! ওর শাদা মনে কাদা নেই।—চলো অমূল্য, আমিও রমনার দিকে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে একটু হাঁটবে চলো।' একবার ফিরে তাকিয়ে, ছোট্ট হেসে, বন্ধুভাবে হাত নেড়ে, আমার কাছে বিদায় নিলো বুলবুল।

আমি আস্তে-আস্তে বাড়ি ফিরে এলাম, এক ঝাঁক প্রশ্ন আমাকে ঘিরে ধরলো। কয়েকদিন আগে, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির স্ট্যাকে দাঁড়িয়ে, যখন চলন্ত ট্রেন বুলবুলের আরম্ভ-করা কথা থামিয়ে দিয়েছিলো, তখন, যাতে বার-বার তার দিকে তাকাতে না হয়, তাই বাইরে মাঠের ওপর দৃষ্টি ছড়িয়ে যে-সুখস্বপ্নটিকে আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রশ্রয় দিয়েছিলাম, তা-ই যেন বাস্তব হলো আজ: সন্ধেবেলা, প্রথম-তারা-ফোটা ঠাণ্ডা নীল আকাশের তলায়, একটি সঙ্গিনীকে আমি পেয়েছিলাম। এর আগে কখনো এমন হয়নি যে এতটা সময় একান্তে কোনো তরুণীর সঙ্গে আমি কাটিয়েছি।

আরো কথা: আমি তাকে খুঁজে বের করিনি, তার পেছনে ছুটিনি, সে-ই আমার কাছে এসেছে। নির্জনতা, তার চোখে-মুখে ঔৎসুক্য যা লুকোবার কোনো চেষ্টা সে করেনি, তার কোনো-কোনো কথায় ও ভঙ্গিতে গোপনতার ভাব, শেষ পর্যন্ত 'তুমি' বলা, হাতে হাত রাখা—একটা প্রেমের কাহিনী গ'ড়ে ওঠার মতো উপাদানের অভাব ছিলো না। রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত ছিলো আমার, প্রায় হয়েওছিলুম একটা সময়ে, কিন্তু আখেরে এই অবসাদ কেন, এই অস্বস্তি? বুলবুলের সঙ্গে যে-সময়টুকু আমি কাটালাম, তার মধ্যে আমার ভূমিকা কত তুচ্ছ তা চিন্তা ক'রে আমার অহমিকায় আঘাত লাগলো। মনে ক'রে দেখলাম, তার ইচ্ছেমতোই সব-কিছু হয়েছে, আমি যেন শুধু তারই হুকুম তামিল করলুম এতক্ষণ। 'আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসুন—চলুন ঐ আমবাগানে—আসুন বসা যাক—এবার উঠুন—ঐ লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত—তোমার ইচ্ছে না-হ'লে আমি জোর করছি না।' যেন জোর করার কোনো প্রশ্ন ওঠে, যেন এই এক ঘণ্টার মধ্যেই তার কোনো দাবি জ'ন্মে গেছে আমার ওপর। আর তারপর—অমূল্যকে দেখামাত্র আমাকে ফেলে তার সঙ্গে চ'লে যাওয়া। তাহ'লে অমূল্যর সঙ্গেও তার বন্ধুতা, তাকেও সে 'তুমি' বলে, 'শাদা মনে কাদা নেই' ব'লে প্রশংসাও করে। সে কি চাচ্ছে এইভাবে ঈর্ষা জাগাতে আমার মনে? জানে না, অমূল্যর মতো একটা বাজে ছেলেকে ঈর্ষা করা আমার পক্ষে কত অসম্ভব? আর তারপর অন্য একটা কথা আমার মনে হ'লো, যেন এক ঝলকে বুলবুলের ভেতরটা দেখতে পেলাম। না—ঈর্ষা জাগানো নয়, নারীর চিরাচরিত মনোমুগ্ধকর ছলাকলা নয়, ও-সবের বিরুদ্ধেই নিজেকে ঘিরে একটি চতুর ব্যূহ সে রচনা করেছে। তার 'তুমি' বলা, হাত ছোঁয়া, প্রায় বালকের মতো সহজ ভঙ্গি—এই সবই হ'লো প্রতিষেধক, বসন্তের টিকার মতো—অন্তত তার দিক থেকে তা-ই, অন্তত সে ভাবছে যে অমনি ক'রেই প্রেমের বীজাণুগুলিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে, পারবে 'নির্দোষ'ভাবে মেলামেশা করতে যুবকদের সঙ্গে। কথাটা ভেবে একটু মন-খারাপ হ'লো আমার, একটু অপমানিত বোধ করলুম, যেহেতু—আমি যদি তাকে ভুল না-বুঝে থাকি—তাহ'লে আমার পৌরুষের কোনো মূল্য নেই তার কাছে, তার নিজের নারীত্বেরও কোনো মর্যাদা নেই: প্রেম, যার জন্য সেই বকুল-ভিলার

সন্ধ্যা থেকে শুরু ক'রে আমার আকাঙ্ক্ষা দিনে-দিনে আরো প্রবল হ'য়ে উঠছে, তার সম্ভাবনাকেও স্বীকার করতে সে রাজি নয়। আমার মনে হ'লো, দুটো মিষ্টি কথা ব'লে আমাকে ঠকিয়ে দিয়ে গেলো মেয়েটা, অনুতাপ হ'লো তাকে অতটা কাছে ঘেঁষতে দিয়েছিলুম ব'লে, স্থির করলুম পরে কখনো তাকে বুঝিয়ে দেবো যে তার সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে বিচরণ করার মতো গোবরগণেশ ছেলে আমি নই।

—কিন্তু কে জানে, এটাও হয়তো নারীত্বের ঘোষণা তার, ছলাকলারই উল্টো পিঠ—আমি যুবক ব'লেই আমার সঙ্গ চাচ্ছে সে, কিন্তু নিজের কাছে তা স্বীকার করছে না, ভান করছে এটা 'নির্দোষ', দেখাতে চাচ্ছে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দু-জন সহকর্মীর, সজ্ঞানে সে যার বিরুদ্ধে বেড়া তুলে দিলো, অচেতন মনে সেটাই হয়তো তার লক্ষ্য। কিন্তু এই অনুমান—আমার নিজের পক্ষে চাটুকারী হ'লেও—পুরোপুরি মেনে নিতে যেন পারলাম না; নির্জনে একটি তরুণীর সঙ্গ পেলে যে-সুখ আমার অনুভব করার কথা, তা মনের কোথাও খুঁজে পেলাম না আমি; লেগে রইলো অস্বস্তি, ঈষৎ বিরক্তির ভাব, বুলবুলের প্রতি একই সঙ্গে আকর্ষণ ও সংশয়।

শনিবার সন্ধের পরে আমি যখন খান কয়েক বই হাতে নিয়ে বকুল-ভিলায় পৌঁছলুম, বুলবুল তখন যাবার মুখে। আমাকে দেখে সে ব'লে উঠলো, 'বেশ ছেলে! আমিও যাচ্ছি আর উনিও এলেন। কত বই হাতে! বিদ্যের জাহাজ! মিতুর সঙ্গে কথা হচ্ছিলো একটু আগে—বিভা-দি ভাবছেন মেয়েদের দিয়ে একটি নৃত্যনাট্য করাবেন মেলায়, বারো-চোদ্দটি স্বদেশী গান গেঁথে-গেঁথে একটি নাটিকার মতো হবে আরকি। বঙ্কিম থেকে দিলদার নওরোজ পর্যন্ত বাছা-বাছা গান থাকবে। কোন-কোন গান, পর-পর কী-ভাবে সাজালে ভালো হয়, তা-ই নিয়ে কথা হচ্ছিলো। তোমার কী মনে হয়, রণজিৎ?' আমি কোনো জবাব দিলাম না, বুলবুল দরজার দিকে এগোলো। 'চলি মিতু, সত্যি আর সময় নেই আমার, আমার ছাত্রী আমার অদর্শনে কাতর হ'য়ে পড়েছে এতক্ষণে। রণজিৎ, একটু ভেবে দেখো যা বললাম—ঐ স্বদেশী গানের ব্যাপারটা; মিতু, তুই জেনে নিস ওর কাছে, তুই আর রণজিৎ মিলে করলে সবচেয়ে ভালো হয়।—আরে, আর্থার জোন্সের নাম লেখা দেখছি!' আমি আমার হাতের বইগুলোকে একটা জানলার তাকে

নামিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে একটু থেমে বুলবুল একটার মলাট উল্টোচ্ছিলো, তার শেষ বিস্ময়বোধক বাক্যের সেটাই কারণ। আমাকে বলতে হ'লো, 'উনি পড়তে দিলেন আমাকে।' 'কে? আর্থার জোন্স? তুমি তার বাড়ি গিয়েছিলে নাকি?' আমি, জানি না কেন, খানিকটা আত্মসমর্থনের সুরে বললাম, 'কেন, গেলে কোনো দোষ আছে?' 'না, না, দোষ কেন থাকবে, আমরা সকলেই জানি জোন্স খুব ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চায়। তা সাহেবের সঙ্গে কী কথা হ'লো তোমার?' ও-রকম প্রশ্ন করাটা যে সৌজন্যসম্মত নয়, বুলবুলকে তা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না, সংক্ষেপে জবাব দিলাম, 'নানা কথা হ'লো।'

আসলে নানা কথা হয়নি, জোন্সের সঙ্গে আমার আলাপের বিষয় ছিলো শুধু ভাষা ও সাহিত্য। রমনার প্রায় শেষ প্রান্তে তার বাংলোতে ঢুকে প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত আমি আরাম পাইনি। ঘরের মেঝে এত ঝকঝকে আর পালিশ-করা যে আমার ঢুকতে গিয়ে পা হড়কে যাচ্ছিলো, আসবাবপত্র এতই সুশোভন যে বসতে প্রায় সংকোচ বোধ হয়, চায়ের পেয়ালা এত বেশি সুন্দর যে মনে হয় না সত্যি ওগুলো ঠোঁট ঠেকিয়ে চা খাবার জন্য তৈরি—অন্তত তখন তা-ই মনে হয়েছিলো আমার, কেননা তখনও আমি জানি না যে এর চেয়ে অনেক বেশি বিলাসিতায় উন্নীত হবো আমি—আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। কিন্তু জোন্সের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হবার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার অনভ্যাসজনিত দ্বিধার ভাবটা কেটে গেলো। বাংলা আর ইংরেজি ভাষার মেজাজ যদিও এত আলাদা, তবু কোনো-কোনো শব্দে কেমন অতি দূর ঐতিহাসিক আত্মীয়তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়, এই ব্যাপারটা দেখলাম তাকে বেশ উত্তেজিত ক'রে রেখেছে: 'জন্ম' শুনে তার মনে প'ড়ে যায় 'genesis', 'generation'; 'জ্ঞান' শুনে 'ignorant', 'cunning'; 'স্থান' শুনে 'stand'; 'তৃষ্ণা'র সঙ্গে 'thirst'-এর আর 'স্মৃতি'র সঙ্গে 'martyr'-এর সম্পর্ক না-টেনে সে পারে না, আর 'বিদ্যা'র মধ্যে সেই মূল সে খুঁজে পায় যা থেকে তৈরি হয়েছে 'wise', 'witch', 'ideal', 'idea'। আমি তখন, আমার পয়লা নম্বরি বি. এ. ডিগ্রি সত্ত্বেও, ভাষাতত্ত্ব অল্পই জানি; 'স্মৃতি' কেমন ক'রে 'মার্টার' শব্দের আত্মীয় হ'লো, আমার তা ধারণার অতীত, কিন্তু আমি আমার বিস্ময় বেশি প্রকাশ করলুম না, পাছে জোন্স

আমাকে নেহাৎ অজ্ঞ ব'লে ভাবে। কিন্তু সে যখন কথায়-কথায় বললে যে ইংরেজি 'crimson' শব্দ সংস্কৃত 'কৃমি' থেকে এসেছে তখন আমি ব'লে না-উঠে পারলুম না, 'সত্যি? আশ্চর্য!' 'আশ্চর্য না! "Same" আর "সম", "name" আর "নাম"—এ-ধরনের নিকট সম্পর্ক কানেই ধরা পড়ে; "শর্করা" থেকে "sugar," বা "খণ্ড" থেকে "candy," এগুলোও বোঝা শক্ত নয়—এ-সব শব্দের উচ্চারণ খুব কাছাকাছি থেকে গেছে, আর অর্থের কোনো বদলই হয়নি—কিন্তু কোথায় 'কৃমি'—একটা ঘেন্নার ব্যাপার—আর কোথায় গোলাপের "crimson" রং! "Candy" বলতে আর-একটা কথা মনে পড়লো। "Candid", "candle," "candidate" ইত্যাদি শব্দগুলোর তলায় আছে ল্যাটিন "candor", "শাদা"—আর এরই সংস্কৃত জ্ঞাতি হ'লো "চন্দ্র" ও "চন্দন"—দুটোরই ধাতুগত অর্থ উজ্জ্বল, দীপ্তিশালী। তেমনি, ইংরেজি "scene"-এর সঙ্গেও সংস্কৃত "ছায়া"র সম্পর্ক আছে। "ছায়া", গ্রীক "স্কিয়া"—বাংলায় আপনারা যাকে "ছায়া" বলেন তা-ই, কিন্তু সংস্কৃতে "ছায়া" বলতে দীপ্তিও বোঝায়—সেই "মেঘদূতম্"-এ আছে না—' জোন্স উঠে গিয়ে একটা বই নামালো তাক থেকে, পাতা উল্টে বললো, 'এই যে, পূর্বমেঘে—"রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব..." দৃশ্য, দীপ্তি, রঙ্গমঞ্চ—এমনি অনেক ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ লুকোনো আছে এই "scene"-এর মধ্যে, আর তা থেকে যে আরো কত শব্দ বেরিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।' আমি জিগেস করলাম, 'কিন্তু "কৃমি" থেকে "crimson" হ'লো কী ক'রে?' 'বলছি—বেশ একটু কৌতুকের ব্যাপার। "কৃমি" মানে পোকা, আর একরকম পোকার মৃতদেহ থেকে লাল রং তৈরি হ'তো আগে, আরবরা তার নাম দিয়েছিলো 'কিরমিজ'—যা "কৃমি"র আরবি উচ্চারণ ছাড়া কিছু নয়; তা-ই থেকে, মাঝে আরো কয়েকটা ভাষা ঘুরে, ইংরেজি "crimson"-এ পৌঁছনো গেলো। আর-একটা খুব মজার কথা হ'লো "banyan"—ওটার মূলে আছে সংস্কৃত 'বণিক', তাই থেকে পর্তুগীজ 'বানিয়ান'—আপনাদের 'বানিয়া', 'বেনে'—গাছটার ঐ নাম হ'লো যেহেতু ভারতবর্ষে বটতলায় কেনাবেচা চলে। সত্যি—ভাষার মতো এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর-কিছু নেই। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস লুকোনো আছে ভাষার মধ্যে, সব জাতি একত্র হয়েছে সেখানে, ঋণ নিয়েছে পরস্পরের কাছে। যারা বিশেষ কোনো জাতি বা ধর্মের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস করে—যেমন

মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিকরা করতেন, বা আমরা ইংরেজরা করতুম উনিশ শতকে, আর এখন হিটলার শুরু করেছে জর্মানিতে, তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি পাওয়া যাবে ভাষাতত্ত্বে।'

আমি তাকে জিগেস করলাম এখনকার ইংরেজ কবিদের মধ্যে কাকে তার ভালো লাগে। সে এমন একটা নাম করলে যা তখন আমার শুধু ঝাপসাভাবে শোনা ছিলো : টি. এস. এলিয়ট, একজন আমেরিকান, আমি তাঁর কিছু পড়িনি শুনে তখনই 'প্রুফ্রক' ব'লে একটা কবিতা প'ড়ে শোনালো। আমি যখন জিগেস করলুম বইটা আমি কয়েকদিনের জন্য ধার পেতে পারি কিনা তখন সে সোৎসাহে ব'লে উঠলো, 'নিশ্চয়ই!...ইয়েটসের শেষ বইটা পড়েছেন?—একেবারে নতুন এক কবির জন্ম হয়েছে এটাতে। জেমস জয়সের এটা... ?' আমি বিদায় নিলাম সাইকেলের কেরিয়ারে কয়েকটি সদ্য-বেরোনো বই আর মগজে অনেক সদ্য-গজানো ভাবনা নিয়ে।

বুলবুল চ'লে যাবার পর আমি মিতুকে বললাম, 'আপনার বন্ধুটি আমাকে হঠাৎ "তুমি" বলতে শুরু করেছেন কেন জানি না। আর ঐ এক স্বদেশী মেলা ছাড়া আর কি কোনো কথা নেই?' মিতু সস্নেহে বললো, 'হ্যাঁ, বুলবুলকে একটু পাগলাটে মনে হয় প্রথমে, তবে ও খুব ভালো—আপনি কিছু মনে করেননি তো?' আমি বললাম, 'বুলবুলও খুব প্রশংসা করে আপনার, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো কলেজে (পুরো সত্যটা বললাম না); আপনার দেখছি পারস্পরিক-অনুরাগ-সমিতি গঠন করেছেন।' 'সমিতি কেন হবে—বন্ধুতা।' বুলবুলের সঙ্গে মিতুর বন্ধুতার ভিত্তিটা কী, তা জানার জন্য কৌতূহল হ'লো আমার, জিগেস করলাম, 'বুলবুলকে আপনি কি অনেকদিন ধ'রে চেনেন?' 'প্রায় ছেলেবেলা থেকেই। ট্যুশনি ক'রে পড়া-খরচ চালায়, কত রকম স্বদেশী কাজ করে—অসাধারণ মেয়ে।' 'কত মেয়ে তো জেলেও যাচ্ছেন আজকাল, এতে আর অসাধারণ কী আছে?' মিতু জবাব দিলো, 'ওর কথা আরো একটু জানলে আপনি ও-কথা বলতেন না। ওদের বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো নয়, বাবা চান যে-কোনো রকম একটা বিয়ে দিয়ে মেয়েকে পার করতে, বুলবুল জেদ ক'রে য়ুনিভার্সিটিতে পড়ছে, এদিকে মা-র হাঁপানির টান উঠলে বাড়িতে রান্নাবান্নাও করে, তার ওপর বিভা-দির "মুক্তধারা" পত্রিকার প্রুফ দ্যাখে রাত জেগে-জেগে—আমার ভারি

অবাক লাগে ওকে। আর তাছাড়া—' মিতুর ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটলো—'আমি নিজে তো পারি না ও-সব, আমি কিছুই করছি না, বাড়ি ব'সে দিন কাটাই—সেজন্যেও বুলবুলকে আমি প্রশংসার চোখে না-দেখে পারি না। আমার এখনো একা পথ চলতে বাধো-বাধো লাগে, মাথা ধরে রোদে বেরোলে—আসলে আমি একটু সেকেলে ধরনের আছি বোধহয়।' বুলবুলের সঙ্গে মিতুর স্বভাবের বা মতিগতির মিল নেই জেনে আমি মনে-মনে গভীর স্বস্তি পেলাম, একটু বেশি উৎসাহের স্বরে ব'লে উঠলাম, 'সকলকেই সব পারতে হবে কেন—আপনি কিছুই করছেন না, এ কথাও ঠিক নয়—গান গাওয়াও অনেক কিছু করা, আর—আপনি এত ভালো গান করেন যে আর-কিছুরই দরকার নেই আপনার।' আমার একটু অবাক লাগলো মিতু যখন লাল হ'লো আমার কথা শুনে—তার গানের প্রশংসা তো সারাক্ষণ শুনছে সে, এখনো লজ্জা পায়? একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'মা-র সঙ্গে একবার দেখা করবেন আসুন, তাঁর শরীরটা বেশি ভালো নেই আজ—ওপরে গিয়ে বসবেন নাকি? বাবাও এসে পড়বেন এক্ষুনি।' সে-রাতে আমি ন-টা অবধি কাটিয়ে এলাম বকুল-ভিলায়; ফেরার পথে, যেমন জলের ওপর ঝিরিঝিরি হাওয়া, বা শুকনো পাতা চৈত্রমাসে উড়ে চলে, বা দূর-থেকে-শোনা ঝাউবনের মর্মর, তেমনি, মাঝে-মাঝে, মৃদু ও ফিরে-ফিরে-আসা, অশান্ত ও মধুর, আমার মনের ওপর দিয়ে একটি ভাবনা ব'য়ে গেলো—'আমি কি প্রেমে পড়ছি?' 'আমি কি প্রেমে পড়ছি?'

১১

সেই তখনকার আমি, আর কয়েক বছর পর যার ছবি বেরিয়েছিলো বম্বাইয়ের সব ক-টা কাগজে, নলিনী ব্রোকারের সঙ্গে বাহুবদ্ধ অবস্থায়, নব দম্পতি, সুখী, সহাস্য, সমপদস্থের ঈর্ষাভাজন আর সাধারণের ইচ্ছাপূরণের উপায়—এ-দু'জন কি এক মানুষ? জানেন, নলিনীকে নিয়ে আমার প্রথম কর্মস্থলে যখন পৌঁছলুম, অচেনা মধ্যপ্রদেশের ছোটো শহরে, বাংলাদেশ থেকে দূরে, অন্য ভাষার মানুষের মধ্যে, আর তারপর আমার এমন এক জীবন শুরু হ'লো যেখানে আমাকে অন্যেরা প্রায় কখনোই ভুলতে দেয় না যে আমি একজন ঊর্ধ্বতন রাজপুরুষ, ন্যায়দণ্ডধারী বিচারক—তখন আমি আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলুম এই ভেবে যে এবারে নিজের সম্পূর্ণ রূপান্তর আমি ঘটাতে পেরেছি। চাকুরে হিশেবে, প্রকাশ্য জীবনে, যা-কিছু ভঙ্গি আমার কাছে প্রত্যাশিত, সেগুলি এমন নিখুঁতভাবে আয়ত্ত ক'রে নিলুম যে কয়েক বছরের মধ্যেই 'ব্রিলিয়েন্ট অফিসার' ব'লে আমার খ্যাতি ছড়ালো প্রাদেশিক গবর্নর থেকে নয়াদিল্লির দপ্তর পর্যন্ত। আমি মনে-মনে হাসলাম নিজের এই সাফল্যে, আমার কৌতূহল হ'লো অন্য দিক থেকে নিজেকে যাচাই করতে, আমি আমার অতীত থেকে কত দূরে স'রে আসতে পারি, তা নিয়ে একটা পরীক্ষা করার ইচ্ছে হ'লো। পরীক্ষা—মানে এক্সপেরিমেণ্ট। তার ল্যাবরেটরি আমার মন, যন্ত্রপাতি আমার বুদ্ধি, তার গিনি-পিগ্ আমার স্ত্রী।

সম্ভব কি ছিলো না আমার পক্ষে নেলিকে ভালোবাসা? নিশ্চয়ই ছিলো। মন করলে কী না পারা যায়—আর এ তো কিছু শক্ত কাজ নয়, শুধু নেলির রূপযৌবনকে সেটুকু সুযোগ দেয়া যাতে শরীরের মন্থন থেকেই উঠে আসতে পারে সেই সুঘ্রাণ নবনী, চলতি কথায় যাকে 'স্নেহ' ব'লে থাকে। স্নেহ—মমত্ববোধ—যার বেশি অধিকাংশ স্বামী-স্ত্রীর ভাগ্যে আখেরে জোটে না—সেটুকু জন্মাবার বাধা ছিলো কী? আমাদের হৃদয় তো ম'রে যায় না সত্যি, শুধু ঘুমিয়ে প'ড়ে মাঝে-মাঝে, কখনো কোনো আঘাতে জেগে ওঠে আবার—

কিন্তু বাইরে থেকে কেউ তাকে জাগাতে পারে না, যদি না আমরা নিজেরা ইচ্ছুক হই, সহযোগী হই, এগিয়ে আসি। নেলিকে ভালোবাসতে আমি ইচ্ছুক ছিলুম না, প্রতিরোধী ছিলুম—এই আরকি মোদ্দা কথাটা। এমন একটা উপায় আছে যাতে কামনার বিহ্বল মুহূর্তেও হিম হাওয়া বইয়ে দেয়া যায়—তা হ'লো নিজেকে দু-অংশে ভাগ ক'রে নেয়া, সেই উপনিষদের দুই পাখির মতো। তা-ই করেছিলুম আমি ; যখন আমি নেলির আলিঙ্গনে গ'লে যাচ্ছি, ঠিক তখনই আর-একজন আমি পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে দু-জনকে, বাঁকা ঠোঁটে মিটিমিটি হেসে, হয়তো দেড়-ইঞ্চি-ছাই-সমেত একটা মোটা চুরুট মুখে নিয়ে—দেখছে এক মজার ডনকুস্তি, সার্কাসের খেলা, হাঁপানি, গোঙানি, মুমূর্ষুর মতো নাভিশ্বাস—কিন্তু বড্ড পুরোনো, গতানুগতিক, ক্লান্তিকর। পরে আমি যখন স্ত্রীলোক নিয়ে খেলা শুরু করলুম তখনও ঠিক এই ব্যাপার। ছেনে, ছিঁড়ে, খুঁড়ে, মেঝেতে গড়িয়ে, দু-পাশে দুই মেদ-মাংস ঢাকা কঙ্কালকে নিয়ে রাত কাটিয়ে—আমার উদ্ভাবিত নানারকম উৎকট ব্যায়াম থেকে যেটুকু সুখ আমি নিংড়ে নিতে পেরেছি তা হ'লো নিজেকে লক্ষ করার, ধাপে-ধাপে নিজের উন্নতির দৃশ্য দেখার বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তৃপ্তি। উন্নতি বইকি—আমি ঘৃণা লজ্জা ভয় কাটিয়ে উঠছি, ম'জে আছি ঠিক তা-ই নিয়ে আমার রুচির পক্ষে যা বীভৎস, আমার মধ্যে মহাপুরুষের সম্ভাবনা আছে—অন্তত আরো অনেক কিছু সম্ভব হ'তে পারে আমাকে দিয়ে। কিন্তু না—তুমি একটু বেশি জাঁক করছো, রণজিৎ—এই খেলার রসদ জোগাতে এখনো বিস্তর বেগ পেতে হয় তোমাকে, তুমি এখনো সাংসারিক সুবুদ্ধি হারাওনি, কটাক্ষপাত করো না কোনো কমিশনারের পত্নী কিংবা কর্নেলের বান্ধবীর দিকে, কোনো রাজা-বাহাদুরের হীরেয়-মোড়া রক্ষিতাকেও এমনতর আনতশির অভিবাদন জানাও যেন তিনি কোনো মহীয়সী মহিলা—এক কথায়, যাঁদের সঙ্গে তোমার সামাজিক মেলামেশা নির্ধারিত—ক্লাব, রেসকোর্স, বল্-নাচের আসর, গবর্নরের পার্টি, এই সব নির্দিষ্ট জায়গায় যাঁরা কিছুক্ষণের জন্য হৃদ্যতার চর্চা ক'রে থাকেন—তাঁদের সঙ্গে একেবারে নিয়মমাফিক মাজাঘষা ব্যবহার ক'রে তুমি নেলির সাজানো বাড়ির মতোই নিষ্কলঙ্ক রেখেছো বাইরের জগতে তোমার সুনাম। —এমনি, নিজেকে আমি গঞ্জনা দিই মাঝে-মাঝে, শাসন করি, উস্কে দিই, যখন কোনো ছুতো ক'রে আমি নেলিকে পাঠিয়ে দিই তার মা-র কাছে, আর

আমার অনুগত অর্থগৃধ্নু ভৃত্যোরা সন্ধের পরে এনে হাজির করে কোনো গাঁয়ের বধূ, বন্য যুবতী, কোনো হাভাতের কুমারী মেয়ে, বা হয়তো কোনো ধিকিধিকি-জ্বলা মধ্যবয়সী বিধবা। ভাববেন না কোনো ক্ষতি করেছি কারো, আপনাকে তো বলেছি এটা বিশুদ্ধ লেনদেনের ব্যাপার, কোনো কুমারী কান্নাকাটি করলে আমি ছেড়েও দিয়েছি (তাও খালি হাতে নয়)—যদি কোনো অন্যায় ক'রে থাকি তা করেছি শুধু নিজেরই ওপর। তবু—আমার কৌতূহল, আমার আত্মজ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা আমাকে থামতে দেয়নি; আস্তে-আস্তে আমি নিজেই পথঘাট চিনে নিলুম, বুঝে নিলুম আমার গবেষণার উপাদানগুলো এমন-কিছু বিরল পদার্থ নয়; যে-কোনো শহরে ছুটি কাটাতে যাই—দেশের মধ্যে, বা য়োরোপে—সেখানেই দেখি লীলাসঙ্গিনীরা অপেক্ষা ক'রে আছে আমার জন্য—কেউ দশ টাকা পেলেই খুশি, কারো খাঁকতি পঞ্চাশ পাউণ্ড, এই যা তফাৎ। বিনামূল্যে, শুধু খানিকটা ফুর্তির জন্য যারা রাজি, তাদের আমি সভয়ে এড়িয়ে চলেছি, পাছে পরে অন্য ধরনের ঋণশোধের দাবি তুলে আমাকে ফাঁসিয়ে দেয়। আমি হ'য়ে উঠেছিলুম ততটাই চতুর যতটা নেলি ছিলো সরল ও বিশ্বাসপ্রবণ; তাই এটা সম্ভব হ'লো যে সে কিছুই টের পায়নি, যদিও দেশভ্রমণের সময় আমার সঙ্গেই থাকতো সে।

একেবারে টের পায়নি? সন্দেহ করেনি কিছু? তা কি সম্ভব? কিন্তু আমার ওপর আস্থা হারালে সে বাঁচবে কী নিয়ে? তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা ছিলো তার বিয়ে, ভেবেছিলো সেটাই বহু শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে গিয়ে, পল্লবিত হ'য়ে, তাকে আশ্রয় দেবে বাকি জীবনের মতো, তা-ই সে দেখেছে তার মায়ের জীবনে, তার সমবয়সী অনেক মেয়ের জীবনেও—হঠাৎ তার বেলায় যে একটা ব্যতিক্রম ঘটতে পারে তা যেন তার ধারণার বাইরে। তাই সে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখে সন্দেহ, অনবরত নিজেকে বোঝায় যে সব ঠিক আছে, আঁকড়ে থাকে তার বালিকাবয়সের 'সুখে'র ধারণাকে, একই অমূল তরুতে জল ঢালে প্রতিদিন। আর আমি এদিকে নিজের কাছে দোষী হ'য়ে আছি এখন পর্যন্ত গোপনতার দুর্বলতাটুকু কাটাতে পারছি না ব'লে—যদি নেলির কাছেই লুকিয়ে রইলুম তাহ'লে আমার এক্সপেরিমেণ্টের চরম ফলাফল তো জানা যাবে না, যে আত্মজ্ঞান আমি এতদিন ধ'রে অর্জন করেছি তার অংশ আমার সহধর্মিণীকে দিতেই হবে, আমার কৃতিত্বের নির্ভুল প্রমাণ শুধু

তারই কাছে আমি পেতে পারি। তাই, সে যখন তার সুখের স্বপ্নকে একটা মূর্ত রূপ দেবার জন্য তৈরি করলে উটকামণ্ডে এই বাড়ি, এই বিখ্যাত বাগান, তার সাধের 'আনন্দ', 'বন্-অ্যর'—আমি তখনই স্থির করলাম যে এই আমার সুযোগ, আর বেশি দেরি করা চলবে না।

আমার প্রথম কাজ হ'লো হতচ্ছাড়া চাকরি থেকে কেটে পড়া। অবশ্য অন্য একটা কারণও ছিলো ; ইংরেজের গৌরবরবি অস্ত যাবার পর খদ্দরধারী মন্ত্রীদের তাঁবেদারি বেশিদিন আমার ধাতে সইলো না। টিকে গেলে হয়তো স্বাধীন ভারতে ক্ষুদ্র একটি জ্যোতিষ্ক হ'তে পারতুম—কিন্তু না মশাই, পলিটিক্স আমার ঘেন্না, ওর কেউটের ছোবল একবার প্রায় খেয়েছিলুম তো। নেলিরও ও-সব বাজে ভড়ং নেই; কংগ্রেসি মহলে তার বাবার অগাধ প্রতিপত্তি তার যে কোনো কাজে লাগতে পারে, সে যে চাইলে হ'তে পারে লোকসভার সদস্য বা কোনো নিষ্প্রয়োজনীয় উপমন্ত্রী, এ-সব তার মগজেই খেলে না ; স্ত্রী, মা, গৃহিণীর ছাঁচেই ঈশ্বর তাকে গড়েছেন। আমি অকালে রিটায়ার করাতে খুশি হ'লো সে ; ভাবলে এবার দ্বিতীয় যৌবনে দ্বিতীয় হানিমুন শুরু হবে। সেজন্যে যা-কিছু দরকার সবই আছে আমাদের : স্বাস্থ্য, অর্থ, অবসর, আর এই নতুন রমণীয় পরিবেশ। ছেলেরা একবার উড়ে এসে মাসখানেক কাটিয়ে গেলো আমাদের সঙ্গে, খুব তারিফ করলে বাড়ি দেখে ; তারা বিলেতে ফিরে যাবার পর তাদের প্রতিটি মন্তব্য (যার অধিংকাশ আমি স্বকর্ণে শুনেছিলাম) আমাকে আরো অনেকবার নেলির মুখে শুনতে হ'লো। যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেদের দেখে সে মুগ্ধ ; কবে তারা দেশে ফিরবে, বিয়ে করবে, নাতি-নাৎনি উপহার দেবে আমাদের, এই নতুন স্বপ্নে রঙিন হ'য়ে উঠলো তার দিনগুলি। যে-পুত্রবধূরা এখনো অনিশ্চিত, যে-পৌত্রপৌত্রীরা এখনো শুধু দুর্নিরীক্ষ্য জীবাণু ছাড়া কিছু নয়, তাদের কল্পনাতেই নেলি দেখলাম উচ্ছল—এমনি অসাধারণ তার স্নেহবৃত্তি। তা হোক, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তার এই স্বপ্নের অংশ আমাকেও দিতে চায় সে, যেন ওটা এমন কোনো অভিনব সুখাদ্য যা থেকে আমি বঞ্চিত হ'লে তার নিজের ভোগ সম্পূর্ণ হয় না। সব মিলিয়ে এমনি তার ভাবভঙ্গি যেন হঠাৎ কোনো মলয়সমীরণ ব'য়ে যাচ্ছে, আমার পুরোনো চোখেও মাঝে-মাঝে নেলিকে সুন্দর মনে হয়, বাগানের গোলাপগুলো যেন সুখের পরামর্শ দেয়, এমনকি বহুকাল পরে নেলির সঙ্গে কয়েকটা প্রণয়রজনীও

যাপন করলুম। কিন্তু তারপরেই ভয় হ'লো পাছে শেষ মুহূর্তে সত্যি হেরে যাই, পাছে এই অফুরন্ত অবসরের সুযোগে নেলি আমার অনেক দিনের অনেক কষ্টের সাধনাকে বানচাল ক'রে দেয়। পেরেকের মাথায় হাতুড়ি ঠুকে দিলাম এবার, বাড়িতে মেয়েমানুষ আনা শুরু হ'লো। নেলির চোখের ওপর, নাকের তলা দিয়ে।

আমি অবশ্য এমন ব্যবস্থা করেছিলুম যাতে হঠাৎ একটা ভাঙচুর না হয়, ব্যাপারটাকে রসিয়ে-রসিয়ে অনেকদিন ধ'রে উপভোগ করতে পারি। প্রথমে জ্বলন্ত কয়লা, তারপর স্নিগ্ধ মলম। পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চাওয়া, 'তুমি দেবী, আমি নরকের কীট', দু-চার ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত। নেলি জানে—এতদিনে জেনেছে—আমার সত্যিকার চেহারাটা কী, তবু আমার মুখের কথা চোখের জল একেবারে উড়িয়ে দেবে এমনও তার মনে জোর নেই। মাঝে-মাঝে বিরাম দিই—যাতে নেলি একেবারে আশা ছেড়ে না দেয় আমার বিষয়ে, যাতে আবার কোনো দুপুর-রাতে আধো-ঘুমে-শোনা মেয়েলি গলায় বেলেল্লা হাসি ছোরা হ'য়ে বিঁধতে পারে তাকে। তারপর আবার ক্ষমা চাওয়া, মূর্ছিতের মুখে বারিসিঞ্চন। এমনি চালাতে লাগলুম আমার চমৎকার টেকনীক—পর-পর ব্যভিচার আর ন্যাকামি। অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন শ্রীমতী নলিনী কী ক'রে সহ্য করেছিলো, কেন বিদ্রোহ করেনি, চ'লে যায়নি, আইনের শরণ নিয়ে কঠিন কোনো শাস্তি দেয়নি আমাকে? সে, রতনদাসের কন্যা, কিসের অভাব তার, কার তোয়াক্কা রাখে সে, আমাকে পথের ভিখিরি ক'রে ছেড়ে দেয়াও তার সাধ্যে কুলোতো না তা নয়। কিন্তু কেন কিছু করেনি, এ-বাড়ি ছেড়ে চ'লে যায়নি পর্যন্ত, তার কারণটা তো সোজা। না—সে পারবে না, কিছুতেই জানাতে পারবে না জগৎকে, তার নিকটতম মা-বাবাকেও না, যে তার সুখের প্রাসাদ চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেছে, কোনোদিন গ'ড়েই ওঠেনি, যে তার সমস্ত জীবন একমুঠো ধুলোর চেয়ে বেশি কিছু নয়, আর সে নিতান্ত অবোধ ব'লেই এতদিন তা বোঝেনি। এই পরাজয়—যা আমি তাকে অবশেষে মেনে নিতে বাধ্য করলুম—তা অন্যের কাছে উদ্‌ঘাটন করতে পারলে না সে; সেই অপমান এড়াবার জন্য মৃত্যু বেছে নিলে। না—আত্মহত্যা নয়, বরং আত্মরক্ষা, জীবের সেই আশ্চর্য ক্ষমতা, যা শরীরের মধ্যে ফলিয়ে তোলে কোনো রোগ, মনের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য। নিঃশব্দ হ'য়ে

গেলো, নিঃসাড় হ'য়ে গেলো, যেন আস্তে-আস্তে ফুরিয়ে এলো মোমবাতির মতো—ডাক্তারি ভাষায় তার নাম হ'লো মারাত্মক অ্যানেমিয়া। আমি তার চিকিৎসা নিয়ে হুলুস্থুল করেছিলুম, আনিয়েছিলুম বম্বাই আর কলকাতা থেকে বিশারদ—কিন্তু তার শরীর কোনো সহযোগিতা করলে না চিকিৎসার সঙ্গে, নেলি তার বিদ্রোহ ঘোষণা করলো—কোনো কথায় নয়, কাজে নয়—তার রক্তে অফুরন্তভাবে বেড়ে-চলা শ্বেতকণিকায়, বিকল হৃৎপিণ্ডে, যকৃতের অক্ষমতায়। জানেন, এক রাত্রে—আমি যখন অসহ্য সময় কাটাবার জন্য কালো গোলাপের গবেষণা করছি, অনেক রাত্রে হল্যাণ্ড থেকে আনানো বই পড়ছি এই ঘরে ব'সে—সে এসেছিলো আমার কাছে। বই থেকে চোখ তুলে হঠাৎ দেখলাম তাকে। গায়ের রং একেবারে বদলে গেছে—কালো, ছাইয়ের মতো, গালে ঠোঁটে কোথাও এক ফোঁটা লাল নেই। 'আমাকে তাড়িয়ে দিলে কেন?' পরিষ্কার বাংলায় বললে কথাটা, খুব নরম গলায়। তিনবার, চারবার তাকে দেখলাম; সে আসে, দাঁড়ায় আমার কাছে এসে, আমার চোখে চোখ রেখে ঐ একটি কথা ব'লে মিলিয়ে যায়। অগত্যা কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম একজন হাউসকীপারের জন্য; গায়ত্রীকে খুঁজে পাওয়া গেলো।

আজ্ঞে? আমি হত্যাকারী? আগেভাগেই রায় দেবেন না মশাই, পুরো মামলাটা শোনেননি এখনো। আসুন কিছুক্ষণের জন্য ঢাকায় ফিরে যাই। আপনার আমার যৌবনের দিনে। আপনি কি যুবক আছেন এখনো?... আজ্ঞে? ঐ তো ভুল করছেন, বয়স দিয়ে বার্ধক্যের হিশেব হয় না। আমার বার্ধক্য শুরু হয়েছিলো পঁচিশ বছরে—বহুদিন ধ'রে একই রকম বৃদ্ধ আছি, দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু আমি জানি আমার পঁচিশে আর পঁচানব্বুইতে কোনো তফাৎ নেই। তবু—আমিও একবার যৌবন পেয়েছিলাম—কয়েক বছর, কয়েক মাস, অন্তত কয়েকটা দিনের জন্য। সেই বকুল-ভিলার দুপুরবেলাগুলো। মাস আশ্বিন, আকাশ মিনিটে-মিনিটে বদলে যাচ্ছে। কালো মেঘ, রুপোলি মেঘ, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি আর রোদ, কখনো এমন আশ্চর্য নীল যেন ওপিঠে সত্যি স্বর্গ আছে, কখনো আবার বিকেলের দিকে ঝোড়ো। আর যেন ঐ দূর, প্রকাণ্ড আকাশেরই একটি ঘনিষ্ঠতর রূপের মতো, মিতু। তার আস্তে-আস্তে, টেনে-টেনে কথা বলার ধরন। তার কোমল সলজ্জ ভাব, নিজের কিছুটা অংশ গুটিয়ে রাখার, লুকিয়ে রাখার ভঙ্গি।

তার ঈষৎ দূরত্ব, তার চোখ, কালো, ধূসর, বাদামি, কিন্তু ঘোড়ো নয় কখনো—শান্ত, ভরপুর। কী-কথা বলতাম? মনে নেই কী-কথা, কেমন ক'রে কেটে যেতো ঘণ্টাগুলো তাও মনে নেই। সন্ধেবেলা আছে তার গানের রেওয়াজ, লোকজনের আনাগোনা—আমি তাই দুপুরবেলাটা বেছে নিয়েছি; সোজা কলেজ থেকে দেড়টা নাগাদ পাড়ি দিই ওয়াড়িতে, যখন বেরিয়ে আসি পশ্চিমের সূর্য বকুল-ভিলার লম্বা ছায়া ফেলেছে সামনের কম্পাউণ্ডে। যে-প্রশ্নটা আমাকে দোলা দিয়েছিলো কয়েকদিন আগে, তার উত্তর আমার হৃদয়ের শব্দে বেজে উঠলো, কোনো প্রথম অন্তঃসত্ত্বার মতোই আমি অনুভব করলাম আমারই মধ্যে নতুন এক জন্মের সূচনা—শুধু ইচ্ছা নয়, কল্পনা নয়—বাস্তব, নির্ভুল, বাড়ন্ত: প্রেম।

কিন্তু আমাদের জীবনে বিশুদ্ধ কিছু নেই—সবই মিশোল, যাকে আমরা মহৎ বৃত্তি বলি তারও মধ্যে কিছু-না-কিছু ভেজাল থাকেই। এক অদম্য আবেগ আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় মিতুর কাছে—কলেজের ক্লাশ শেষ হওয়ামাত্র; কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে যখন বেরিয়ে আসি তখন আর আমি ভাবে বিভোর প্রেমিক থাকি না, আমি টের পাই নিজের মধ্যে কোথায় একটু বিরক্তিবোধ—ক্লান্তি, অতৃপ্তি। প্রকৃতি, আমার অনুমতির অপেক্ষা না-ক'রে আমার মধ্যে কাজ ক'রে যাচ্ছে; একটি তরুণী, যে বুলবুলের মতো অত্যন্ত বেশি খোলামেলা হ'য়ে তার নারীত্বকে বরবাদ ক'রে দেয়নি, বরং সেটাকে কিছুটা আড়ালে রেখে আরো প্রস্ফুট ক'রে তুলেছে—তেমনি একটি তরুণীর সঙ্গলাভের ফলে আমার রক্তে ফণা তুলছে কামনা—মাঝে-মাঝে এমনকি একটু অসহিষ্ণুভাবে। এটা নিজের কাছে স্বীকার করতে আমি লজ্জা পাই, চেষ্টা করি ভুলে থাকতে—ভুলে থাকা কঠিনও হয় না, কেননা সেই একই সময়ে, একই কারণে, অন্য একটা ঘটনাও ঘটেছিলো, যাকে হয়তো বলা যায় আমার সত্তার সম্প্রসারণ। আমি যেন খুলে যাচ্ছি, ছড়িয়ে যাচ্ছি চারদিকে, হ'য়ে উঠছি নিজের চাইতে অনেক বড়ো, অনেক ভালো, ক্ষমতাশালী, যেন পৃথিবীতে সকলেই আমার বন্ধু। আমি বুলবুলকে আর অপছন্দ করি না, কেননা আমার কাছে নারী হিশেবে তার অস্তিত্ব আর নেই, নারীত্বের সব লক্ষণ, সব সুঘ্রাণ আমার জন্য গুচ্ছ ক'রে ধ'রে রেখেছে অন্য একজন। বুলবুল আমাকে যা-কিছু বলেছিলো সব আমি ক'রে দিয়েছি—তাদের মেলার জন্য ঐতিহাসিক চার্ট,

'মুক্তধারা'র জন্য গোরা-চরিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ, নৃত্যনাট্যের জন্য স্বদেশী গানও বেছে দিয়েছি—আর এগুলো ক'রে উঠতে কোনো কষ্টই হয়নি আমার, বিরক্ত লাগেনি—এখন সবই যেন সহজ হ'য়ে গেছে আমার কাছে। অমূল্যকেও আর অসহ্য লাগে না আমার—বকুল-ভিলায় সব সময় যাওয়া-আসা করে সে, যাকে বলে 'বাড়ির ছেলের মতো'; মিতুর মা-বাবাকে মাসিমা-মেসোমশায় ডাকে, দরকারমতো ফরমাশ খাটে তাঁদের, মিতুর ওস্তাদজীকে কোনো খবর পাঠাবার দরকার হ'লে সাইকেল নিয়ে তড়িঘড়ি ছুটে যায়, মিতুকে কিনে এনে দেয় সদরঘাট থেকে 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'নবশক্তি'। আমি, আমার প্রেমে-পড়া নতুন ব্যক্তিত্ব নিয়ে, অমূল্যর বোকামি আর বদ রসিকতাগুলোকে ক্ষমা করতে পারি এখন, একটু করুণাও করি তাকে—যেহেতু মিতুর শুধু একটুখানি আশে-পাশে থাকার জন্য তাকে এত বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে, এত বিভিন্নভাবে কাজে লাগতে হচ্ছে এই পরিবারের। আমি এমনকি ইতিমধ্যে আর্থার জোন্সের কানেও অমূল্যর কথাটা তুলেছি—আমার এক বন্ধুকে কোনোরকম একটা সুপারিশ দিতে সে পারে কিনা—সে-কথা বলতে পারার মতো সদ্ভাব জোন্সের সঙ্গে আমার হয়েছে ততদিনে। সপ্তাহে একদিন বা দু-দিন বিকেলবেলাটা আমি জোন্সের সঙ্গে কাটাই; আমার জিভ থেকে কিছুতেই কেন 'th'-এর ঠিক উচ্চারণ বেরোয় না, আর সে-ই বা কেন, সংস্কৃত জানা সত্ত্বেও, 'ঠ' ও 'ট' উচ্চারণ করতে সীমাহীনরূপে অক্ষম, এই ধরনের কয়েকটা মৃদু ঠাট্টা চলে তার সঙ্গে আমার; কিন্তু তার বাংলা পড়ায় আমি যেটুকু সাহায্য করছি সে-তুলনায় অনেক বেশি ফেরৎ পাই তার কথাবার্তা থেকে, কেননা এমন কোনো কথাই সে বলে না যা ব্র্যাডলি অথবা ম্যাথু আর্নল্ড থেকে তুলে নেয়া: আর তার কাছে ধার-পাওয়া বইগুলো প'ড়ে-প'ড়ে সাহিত্য বিষয়ে আমারও ধারণা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আমি চেষ্টা করছি একেবারে অন্য ধরনে কবিতা লিখতে, ভাবছি যে অমিত রায় হয়তো ঠাট্টার ছলে ঠিক কথাই বলেছিলো, সত্যি এখন 'কড়া লাইনের খাড়া লাইনের' রচনা চাই—অমিত রায়ের কথাটাকে মনে-মনে সংশোধন ক'রে নিয়ে এও ভাবি (কেননা নারীর মুখ আমার কাছে এখন জগতের এক অপরিহার্য উপাদান) যে গোলাপফুল বা নারীর মুখ যদি 'ন্যুরেলজিয়ার ব্যথা' হ'য়ে পাঠকের মনে পৌঁছয় তাহ'লেই হয়তো মনের ভাবটা ভাষায় ঠিক ধরা পড়ে; এই যে আমার মিতুকে

ভাবলেই বুকের মধ্যে টনটন করে, এটাকে বলার জন্য বোধহয় এমন ভাবাই দরকার, যা আঁটো, ঘন, ধারালো, খুব বেশি মসৃণ নয়, ঈষৎ ভাঙাচোরা, যেন আবেগের চাপে কথাগুলো মাঝে-মাঝে ফেটে যাচ্ছে। আমার মনের মধ্যে, আমার ভালোবাসারই সহোদর যেন, আস্তে-আস্তে একটা আশা গ'ড়ে উঠছে যে আমি শেষ পর্যন্ত লেখকই হবো—হ'তে পারবো, হঠাৎ আমার সঙ্গে এই যে একজন সাহিত্যরসিক ইংরেজের আলাপ হ'য়ে গেলো, এতেও যেন তারই ইঙ্গিত পাচ্ছি।

আরো একজনের সঙ্গে আমি কিছুটা ঘনিষ্ঠ হলাম এই সময়ে—সে কাজল। কিন্তু এর পেছনে একটু বেদনার ইতিহাস আছে।—বেদনা? না কি সেই মামুলি গল্প, বাংলাদেশের সনাতন সম্পত্তি, মরুভূমিতে গোলাপের মতো নারী-হৃদয়ের ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস? আমি নেলিকে যা করেছিলুম তার পেছনে ছিলো আস্ত একটা জীবনদর্শন—আমার কোনো স্বার্থ নয়, অন্য কারো প্রতি আসক্তি নয়, বিশুদ্ধ কৌতূহল শুধু—প্রেম, বিবাহ, পরিবার ইত্যাদি বিখ্যাত ভূতগুলোকে মেরে ফেলার চেষ্টা। কিন্তু সব সময় সে-রকম কিছু থাকে না—নেহাৎ ঘটনাচক্রে কষ্ট পায় লোকেরা, সমাজ অনড় ব'লে, পাহারাওয়ালা দুর্ধর্ষ ব'লে। যারা শুধু প'ড়ে-প'ড়ে মার খায়, প্রতিবাদ করে না, প্রতিবাদ করতে শেখেনি কখনো—বলুন তো, তাদের জন্য কি ব্যথিত হওয়া যায়, তারা কি সহানুভূতিরও যোগ্য?...আজ্ঞে? আমার স্ত্রীর কথা? তা তার সপক্ষে অন্তত এটুকু বলার আছে যে সে আমাকে ভালোবাসতো, আর মানুষের হৃদয়ের ওপর তার নিজেরও হাত নেই। তার সঙ্গে কাজলের তুলনা করলে খুব ভুল করবেন। কাজলের জীবন কোন দিক থেকে ভেঙেছিলো, তা আপনি অনেক আগেই বুঝেছেন নিশ্চয়ই? বুঝেছেন, যে জলপাইগুড়ির সেই বাস্-লাইনের মালিক, যাঁর টাকায় তিনি বিলেত যাবার সাধ মিটিয়েছিলেন, তাঁর কন্যাটির প্রতি একেবারেই মন ছিলো না ফটিক-মামার? যে খুব সম্ভব তিনি বিদেশে পাঁচ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করেননি, হয়তো বা কোনো 'ধিঙ্গি মেম' তাঁকে পুরোপুরি গিলেও নিয়েছিলো? এটা তো কিছু শক্ত কথা নয়, বাড়ির বয়স্করা চোখের পলকে বুঝে নিয়েছিলেন, মামা প্রথম ফেরার পর দু-দিনের জন্য বেড়াতে এসেও টের পেয়েছিলেন আমার দিদি—শুধু আমারই, অনেকদিন পর্যন্ত, কিছু খেয়াল হয়নি! ছেলেমানুষ—সদ্যযুবক—সাংসারিক ব্যাপারে কোনোই খেয়াল

নেই—এ-ই আমি ছিলুম তখন। বাড়ির সবাই ভালোবাসে আমাকে—সেটা উল্লেখযোগ্য নয়, স্বতঃসিদ্ধ, আমাকে কিছু দিতে হবে না বিনিময়ে, অন্ত কারো হৃদয়ের দিকে তাকাতে হবে না—এই ছিলো আমার ধারণা তখন। কী স্বার্থপর জীবনের সেই বসন্তঋতু—কবিতায় বিখ্যাত ও বন্দিত যৌবন! তবু—হঠাৎ একদিন কাজলকে আমি তার নিজের দিক থেকে দেখতে পেলাম, যখন ফটিক-মামা ঘোষণা করলেন যে তাঁকে শিগগিরই কলকাতায় ফিরতে হবে। মা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন—'সে কী? সামনে পুজো, এটা কি একটা যাবার সময়?' কিন্তু মা-র অনুরোধ, অনুনয়, চোখের জল কোনো কাজে লাগলো না; ফটিক-মামাকে যেতেই হবে, তাঁর ব্যাবসার পার্টনারের চিঠি পেয়েছেন কলকাতা থেকে—জরুরি কাজ। তাছাড়া কী-বা হবে ঢাকায় ব'সে থেকে, এতদিন ধ'রে এত চেষ্টা ক'রে মাত্র তিনজনকে রাজি করাতে পেরেছেন তাঁদের কোম্পানির শেয়ার কিনতে—একজন অনাদিবাবু, আর অনাদিবাবুরই সূত্রে আরো দু-জন—কাউকে বোঝানো যায় না যে ইলেকট্রিক বাল্‌ব এমন একটি দরকারী জিনিশ যে এই ব্যাবসায় ফেল হবার কোনো কথাই ওঠে না, দিশি বাল্‌ব বিলিতির চাইতে শস্তা হবে, লোকেরা স্বদেশী ব'লেও কিনবে তাঁদের 'জ্যোতি' বাল্‌ব—এর পরে পাখাও তৈরি হবে, পাখার নাম হবে 'মলয়'—দু-বছরের মধ্যেই ডিভিডেণ্ড দিতে পারবেন তাঁরা। কিন্তু না—ঢাকার লোকেরা ইণ্ডাস্ট্রি-মাইণ্ডেড নয়, ঝাড়কে-ঝাড় চাকুরে, সেই মামুলি 'গাভ্‌মেণ্ট পেপার' ছাড়া কিছু বোঝে না, জমিদার-শ্রেণী বংশানুক্রমে তুলোর বাক্সে জীবন কাটাবার ফলে পাই-পয়সা রিস্ক নিতে নারাজ, আর সাহা-বসাকদের মধ্যে যারা লাখ টাকার কারবারি তারা এখনো ঘরে-ঘরে সিঁদুর-লেপা গণেশ-বসানো সিন্দুকে পাঁজা-পাঁজা নোট রেখে দেয়, আর ব্যাবসা বলতেও তাদের মৌরসিপাট্টা শাঁখা শাড়ি মনোহারি দোকানই বোঝে শুধু। কী হবে এই দেশের—যেখানে মেডিয়াভল অন্ধকার বিরাজমান, যেখানে এখনো কারো-কারো ধারণা যে ইলেকট্রিক আলোয় চোখ খারাপ হয়, যেখানে বিপুল পরিমাণ টাকা গণেশের ভুঁড়ির মধ্যে প'চে যায়, আর মেয়েদের গায়ের কিংবা হাতবাক্সের সোনা হ'য়ে আটকে থাকে? 'ভারত-ললনাদের স্বর্ণালংকার কেড়ে নিয়ে ইণ্ডাস্ট্রিতে খাটানো উচিত, তাহ'লে দেশে আর অভাব থাকবে না।' শেষ কথাটা ব'লে ফটিক-মামা সমর্থনের জন্য আমার দিকে তাকালেন। কিছুদিন

আগে হ'লে আমি তৎক্ষণাৎ সর্বান্তঃকরণে একমত হতুম, কিন্তু সে-মুহূর্তে আমার চোখে ভেসে উঠলো কাজল-মামির চাঁদের মতো নেকলেসটা, যার চুনি-পান্নার ঝিলিকের সঙ্গে কাজলের চোখ একবার অন্তত পাল্লা দিয়েছিলো। সেদিন, মিতুর জন্মদিনের সন্ধ্যায়, আমি যখন মহিলাদের সঙ্গে ব'সে চা খাচ্ছিলুম, আমার চোখ কয়েকবার স'রে এসেছিলো কাজলের মুখ থেকে ঐ নেকলেসটাতে, আমি ভাবছিলাম তার গলা আর বুক আরো কত সুন্দর দেখাচ্ছে ওটার জন্য, আর ঐ ঠাণ্ডা সোনা আর পাথরগুলোতে কি সঞ্চারিত হচ্ছে না তার শরীরের কিছুটা উত্তাপ? তাছাড়া, ততদিনে আমি টের পেয়েছি যে আমার মা, তাঁর অগাধ স্নেহবৃত্তি সত্ত্বেও, কাজলের প্রতি তার স্বামীর উদাসীনতার জন্য মনে-মনে কাজলকেই দায়ী করেন—আড়ে-ঠারে কোনো কথায় তা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে; সে নাকি যথেষ্ট 'চৌকশ' নয়, স্বামীর ওপর দাবি খাটাতে জানে না। আমার মনে হয় এটা অবিচার, আর এজন্যেও আমি কাজলের কিছুটা পক্ষপাতী হ'য়ে পড়েছি, এমন কিছু বলতে চাই না যা ঘুরিয়ে-ফিরিয়েও তার বিরুদ্ধে যেতে পারে। তাই, ফটিক-মামার কথার উত্তরে আমি একটু সাবধানে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো ফটিক-মামা, তবে মেয়েদের সুন্দর দেখালে ভালো লাগে তা মানবে নিশ্চয়ই?' 'Ah, young man!' ব'লে ফটিক-মামা আমার পিঠ চাপড়ে হেসে উঠলেন, কিন্তু তারপরেই যেন মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখে একটা হালকা ছায়া পড়লো, নিচু গলায় বললেন, 'গয়না ছাড়াই সুন্দর দেখায় এমনও আছে।'

আমি বরাবরই রাত-জাগা পাখি; সে-রাতেও জেগে-জেগে একটা চিঠি লিখছিলাম। টুকটাক আওয়াজ আসছে পাশের ঘর থেকে—সেটা ফটিক-কাজলকে ছেড়ে দিয়েছেন আমার মা—মামা কাল চ'লে যাচ্ছেন, তাঁর জিনিশ-পত্র গোছানো হচ্ছে। গোছগাছ হ'য়ে যাবার পর অনেকক্ষণ কেটে গেলো, চারদিক নিশুতি নীরব, আমার ঠোঁট নিঃশব্দে নড়ছে, কলম চলছে, এমন সময় আবার কথাবার্তা শুরু হ'লো পাশের ঘরে, মামার বিরক্তি-ভরা ঘুমেল গলা শুনলাম, 'আঃ! থামো তো! ঘুমুতে দাও।' যাকে বলা হ'লো সে কিন্তু থামলো না, গুনগুন ক'রে কী-যেন-কী বলতে লাগলো—মনে হ'লো কিছু একটা তর্কাতর্কি হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয় কথা শোনা উচিত নয়, এই চিঠিটা অনেক বেশি জরুরি, কিন্তু মাঝে-মাঝে দু-জনেরই গলা চ'ড়ে উঠছে ব'লে

নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে সেই শান্ত নীরব আবহাওয়া, যা এই চিঠি লেখার জন্য দরকার আমার। 'গয়নার ঢিপি', 'তোমার বাবা', এই কথা দুটো ফটিক-মামার গলায় বেশ রাগি আওয়াজে ছুটে এলো আমার কানে—তবে কি উনি সত্যি কাজলের গয়নাগুলো নিয়ে যেতে চাচ্ছেন ব্যাবসায় তা খাটাবার জন্য, না কি চাচ্ছেন কাজল তার বাবার কাছ থেকে স্বামীর জন্য মূলধন এনে দিক? 'তোমার লজ্জা করে না—' ব'লে কাজল একটা কথা আরম্ভ করলো, তার ঐ নরম গলা অত তীক্ষ্ণ হ'তে পারে আমার ধারণা ছিলো না (যেমন মিতুর কথা শুনে ভাবা যায় না গাইবার সময় তার গলা কেমন অতি সহজে উঁচু থেকে আরো উঁচু পর্দায় ঢেউ তুলে-তুলে খেলা করতে পারে)—কিন্তু এর পরে কাজল কী বললো বোঝা গেলো না। আরো কিছুক্ষণ নিচু গলায় কথা চললো দু-জনের মধ্যে—নিচু, চাপা, কিন্তু তলায়-তলায় তীব্র (আমি পাশের ঘর থেকেও তা টের পাচ্ছিলাম)—তারপর হঠাৎ একটা কথা যেন কাজলের গলা চিরে বেরিয়ে এলো—'বলো, ঐ ছবিটা কার! বলতেই হবে!' ফটিক-মামা বাঘের মতো গর্জন ক'রে উঠলেন, 'চুপ!' তারপর নিথর স্তব্ধতা নামলো।

আমি বিরক্ত হলাম চিঠি লেখায় এই ব্যাঘাত ঘটলো ব'লে, কিন্তু ওটাতে তক্ষুনি আবার মন দিতে পারলুম না, আমার মনে প'ড়ে গেলো কয়েকদিন আগেকার একটা ছোট্ট ঘটনা। সাইকেলটা সারাতে দিয়েছিলাম সেদিন, হেঁটে-হেঁটে ফিরছিলাম রাত দশটা নাগাদ, বাড়ির কাছে এসে দেখি, আমার বিশ-পঁচিশ গজ আগে-আগে ফটিক-মামাও চলেছেন। আস্তে হাঁটছিলেন, একটু ক্লান্তভাবে, মাথা নিচু ক'রে। আমি তাড়াতাড়ি পা চালালাম তাঁকে ধ'রে ফেলার জন্য, কিন্তু ফটিক-মামা একটা ল্যাম্পোস্টের তলায় থামলেন, পকেট থেকে কিছু-একটা বের ক'রে দেখতে লাগলেন মন দিয়ে—ছোটো এক টুকরো কাগজ, কোনো চিঠি বা ফোটো বোধহয়—এত মন দিয়ে পড়ছিলেন বা দেখছিলেন যে পেছনে আমার পায়ের শব্দ তিনি শুনতে পেলেন না, আমার 'ফটিক-মামা' ডাক শুনে এত বেশি চমকে উঠলেন যে কাগজটা তাঁর হাত থেকে প'ড়ে গেলো। বিদ্যুৎবেগে সেটা তুলে নিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'রঞ্জু, আড্ডা দিয়ে ফিরছিস? চল শিগগির, বাড়ি চল, জবর খিদে পেয়ে গেছে, আর দিদি বোধহয় মাংসের রেজেলা করেছেন আজ।' কথা বলার এই ধরনটাই ফটিক-মামার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সে-মুহূর্তে সেটা ঠিক

যেন মানালো না তাঁকে, যেন চেষ্টা ক'রে হাসছেন, তাঁর কপালে আমি চিন্তার রেখা দেখলাম, অন্তত এটুকু স্পষ্ট বোঝা গেলো যে আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে তিনি বাড়ি ফিরে খাওয়ার কথা ভাবছিলেন না। ব্যাপারটা আমি পরের দিনই ভুলে গিয়েছিলাম অবশ্য, কিন্তু সে-রাতে শুয়ে-শুয়ে মনে পড়লো—হঠাৎ মনে হ'লো আমি যেন চকিতে দেখতে পেয়েছিলাম মামার হাত থেকে প'ড়ে-যাওয়া কাগজটাকে—কোনো ফোটোগ্রাফ, কোনো মুখ, কোনো মেয়ের মুখ?

কখনো বা মা-কে দেখতাম ফিশফিশ ক'রে কিছু বলছেন ফটিক-মামাকে—কোনো সাংসারিক সদুপদেশ দিচ্ছেন বোধহয়—আর আমার ফুর্তিবাজ বিশাল-বক্ষ ভোজনবিলাসী ফটিক-মামা কপালে হাত দিয়ে কী যে ভাবছেন বোঝার উপায় নেই। মাঝে-মাঝে বিদেশী টিকিটওলা চিঠি আসে মামার নামে—সেটা খুবই স্বাভাবিক, নিশ্চয়ই নানা দেশে বন্ধুবান্ধব আছে তাঁর, কিন্তু মিনু যখন জমাবার জন্য স্ট্যাম্পগুলি চেয়ে নেয়, আমি দেখি সেগুলো সবই জর্মানির। মামাকে অনেকবার বলতে শুনেছি যে-দেশটা তাঁর সবচেয়ে ভালো লেগেছিলো তা হ'লো জর্মানি; গ্যেটের বিষয়ে বেশি কিছু না-জানলেও জর্মানদের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ; আর যদিও পলিটিক্স নিয়ে এমনিতে কখনো কথা বলেন না, তবু এক-একদিনের কাগজ প'ড়ে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন। —'দেখছিস রঞ্জু, কী-রকম গুণ্ডামি চালিয়ে যাচ্ছে হিটলার। কী অত্যাচার ইহুদিদের ওপর! এই দৈত্যকে আরো বাড়তে দিলে কিন্তু সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। নাঃ, আর-একটা যুদ্ধ না-হ'য়ে উপায় নেই, দেখছি।' সে-সময়ে, আমাদের দেশের অন্য অনেকেরই মতো, হিটলারকে নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলুম না; তাই আমি ধরতে পারিনি মামার এ-সব কথায় এই সত্যিকার দুশ্চিন্তার সুর কেন, যদি ধরা যাক জর্মানির কোনো ক্ষতিও করে হিটলার, তাতে তাঁর কী এসে যায়? আমি জানতাম আমাদের ইংরেজ-বিদ্বেষের একটা উল্টো পিঠ হলো জর্মান-প্রীতি, এঞ্জিনিয়রদের পক্ষে জর্মানি একটি আদর্শ দেশ তাও শুনেছিলাম; কিন্তু এটা আমার মাথায় কখনো খেলেনি যে জর্মানির সঙ্গে অন্য কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে ফটিক-মামার, বা হিটলার বিষয়ে ভীত হবার কোনো ব্যক্তিগত কারণ। এও লক্ষ করিনি যে বিদেশী চিঠি যেদিনই আসে সেদিনই একটু বিষণ্ণ হ'য়ে থাকেন ফটিক-মামা।

এবারেও কাজলকে নিয়ে যাবার কথা তুলেছিলেন আমার মা, খুব মৃদু-ভাবে অবশ্য। ফটিক-মামা সহাস্যে বলেছিলেন, 'আর ভাবনা নেই দিদি, এবারে গুছিয়ে আনা গেছে, ফ্যাক্টরির কাজ শুরু হ'লেই বাড়িটা বদলাবো, তারপর—' মা বাধা দিয়ে বললেন, 'আমি তো তোকে কতবার বলেছি, বাড়ি বদলাবার জন্যে ভাবিস না—দুটি প্রাণীর সংসার তো, ওতেই চমৎকার চ'লে যাবে। কাজল এখন পাকা গিন্নি হয়েছে, ছবির মতো গুছিয়ে নেবে, দেখিস।' মামা একটা পচা রসিকতা করলেন এর উত্তরে, 'ওঃ দিদি, তোমার কাজলের প্রশংসা শুনে-শুনে জেরবার হ'য়ে গেলাম, এর পরে আমার হিংসে হবে কিন্তু ব'লে দিচ্ছি!'—একটু থেমে, একই রকম হালকা সুরে—'শোনো দিদি, আমি ভাবছি কাজলের গয়নাগুলো আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো এবার—ও-সব জবড়জং ভারি গয়নার দিন তো আর নেই, কলকাতায় নিয়ে চমৎকার হালকা হালফ্যাশনের ডিজাইনে গড়িয়ে দিলে হয় না?' মা একটু ভেবে বললেন, 'তা বেশ, কিন্তু তুই পুরুষমানুষ ও-সবের তো বুঝিস না কিছু, স্যাঁকরা যদি ঠকিয়ে দেয় তোকে? বরং এখানে আমাদের গদাধর স্যাঁকরা পুরোনো লোক, ওর হাতের কাজও খুব পরিষ্কার, আর তাছাড়া কাজলের নিজের পছন্দমতো ডিজাইন হওয়া চাই তো।' মামা একটু গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'বেশ, যা ভালো বোঝো।' একটু আগে যে-ক'টা কথা দৈবাৎ আমার কানে এসেছিলো, তার সঙ্গে এমনি কয়েকটা তুচ্ছ ব্যাপার মিলিয়ে নিতে-নিতে যেন একটা সন্দেহের ছায়া পড়লো আমার মনে, কিন্তু এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবলাম না আমি, ভাবতে ইচ্ছেও করলো না, যেহেতু মনে-মনে আমি ক্ষুব্ধ ছিলাম মিতুকে লেখা চিঠিটা আজ রাত্রে শেষ হ'লো না ব'লে।

পরের দিন আমি স্টেশনে এলাম মামাকে তুলে দিতে; মীটার-গেজের ছোট্ট ট্রেনটা যখন টিকশ-টিকশ ক'রে টিকাটুলির বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, তখন একটা গভীর নিশ্বাস পড়লো আমার। রোজ এগারোটা-পঞ্চাশে ঢাকা স্টেশন থেকে ছাড়ছে এই ট্রেন, তৈরি থাকছে নারানগঞ্জের ঘাটে স্টিমার—কেন আমি একটা টিকিট কেটে চেপে বসি না, পরের দিন ভোরবেলা নামি না কেন গমগমে আধো-অন্ধকার মস্ত-বড়ো-ঘড়ি-বসানো শেয়ালদা স্টেশনে, সেই শহরে, সময় যেখানে বত্রিশ মিনিট এগিয়ে আছে, ভোরের রোদে চিকচিক করে জলে-ধোয়া অ্যাস্‌ফল্টের রাস্তা, যেখানে সব বই, সব পত্রিকা কিনতে পাওয়া

যায়, লোকেরা পরিষ্কার উচ্চারণে বাংলা বলে, আর—সবচেয়ে বড়ো কথা—যেখানে মিতু আছে এখন? এর চেয়ে সহজ আর কী হ'তে পারে, কেন যাই না, কেন আমি বঞ্চিত রাখছি নিজেকে? ভাগ্য যেন খেলা করছে আমাকে নিয়ে; ঠিক এই সময়ে—যখন বকুল-ভিলায় দুপুরগুলো হ'য়ে উঠছে আমার অস্তিত্বের কেন্দ্র, দিন-রাত্রির অন্য সব সময়ের তলায় তারই অনুরণন আমি শুনতে পাচ্ছি—ঠিক তখনই মিতুর ডাক পড়লো কলকাতায়, দিলদার নওরোজের নতুন গান রেকর্ড করার জন্য। নওরোজ, যাঁর কবিতার আমি ভক্ত, আর এডিসনের উদ্ভাবিত ঐ গোল, ভঙ্গুর চাকতিগুলো, যা গেঁথে দিয়েছে আমার স্মৃতিতে কনক দাশের গলায় 'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে' লাইনটা—তারা আমার এমন শত্রুতা করবে কে জানতো? যদি চ'লে যাই কোনো ছুতো ক'রে কলকাতায়, তারপর মিতুর সঙ্গে একই তারিখে ফিরে আসি? ভোরবেলা গোয়ালন্দের স্টিমার, নদীর বুকে শরতের কুয়াশা, ট্রেনে-রাত-জাগা ক্লান্তির পরে চায়ের আস্বাদ, রেলিঙে ভর দিয়ে দেখা পদ্মার জল, যা রোদ্দুরে রুপোলি হ'য়ে উঠলো, একতলায় এঞ্জিন-ঘরের গরম ধোঁয়া, সারেঙের ঘণ্টার নির্দেশ, সিংহের মাথার মতো পিস্টনগুলোর অবিরাম ওঠা-পড়া, জলের গন্ধ, স্টিমারের চাকায় ফেনিয়ে-ওঠা ঘূর্ণি, খালাসিদের রান্নার গন্ধ, ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাতের সঙ্গে মুর্গির ঝোল, কোনো স্টেশনে তক্তা পাতার সময় খালাসিদের সুরেলা চীৎকার—এই সব দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ যদি তার সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে পারি, তার চেয়ে বড়ো সুখ আর কী হ'তে পারে আমার জীবনে? পদ্মার বুকে দোতলা স্টিমার—'এমু' কিংবা 'অস্ট্রিচ' যার নাম, যেখানে আমরা সাত ঘণ্টার জন্য ছুটি পেয়েছি অন্য সব দায়িত্ব থেকে, যেখানে সময় কাটানো ছাড়া আর-কিছুই করার নেই, আর চারদিকে অনেক-কিছু আছে যা অভ্যেস এখনো পচিয়ে দেয়নি—সেখানে নিশ্চয়ই মিতুর আরো একটু কাছে আমি আসতে পারবো, যেন আমার মুঠোর মধ্যে প্রায় এসে যাবে সেই রহস্য, যার জন্য আমি তাকে ভালোবাসছি, অথচ যার সঠিক কোনো উপলব্ধি এখনো আমার ঘটেনি। কিন্তু না—মিতু লিখেছে তার রেকর্ডিঙের তারিখ আগামী সপ্তাহে স্থির হয়েছে, তার বাবাও তাঁর রোগীদের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, তাদের ফিরতে আর বেশি দেরি হবে না।

'মিতু লিখেছে': এই কথাটা কতই না সহজে বলা হ'য়ে গেলো, কিন্তু—

তারা চ'লে যাবার পর তৃতীয় দিনেই যখন মিতুর প্রথম চিঠি এসে পৌছলো আমার হাতে, তখন পত্রপ্রাপকের সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি একাত্ম ক'রে তুলতে আমার কেটে গিয়েছিলো সারাটা সন্ধ্যা আর অর্ধেক রাত্রি। আমি আশা করিনি সে চিঠি লিখবে, একেবারেই আশা করিনি তাও নয়—হয়তো আমরা চোখে-চোখে কিছু বলেছিলাম, কিন্তু সেই নিঃশব্দ বিনিময়কে স্পষ্ট ভাষায় রচিত, নির্ভুল নাম-ঠিকানা-লেখা চিঠিতে তর্জমা ক'রে নেবার মতো সাহস আমার ছিলো না। শুধু বার্তা বা সারাংশ নয়, চিঠিটার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার পক্ষে গবেষণার বিষয় হ'য়ে উঠলো—যে-ভাবে একজন সমালোচক কোনো কবিতার ছন্দ, উপমা, শব্দব্যবহার, কমা-সেমিকোলন, আর সম্ভব হ'লে তার পরিত্যক্ত পূর্বলেখনগুলো সব খুঁটে-খুঁটে পরীক্ষা করেন, আর অমনি ক'রেই টেনে বের করেন তার নিহিত অর্থ, যা শব্দগুলো অর্ধেক লুকিয়ে রেখেছে পাঠককে আরো উত্তেজিত করার জন্য, ঠিক সেইভাবে আমি লক্ষ করলাম নীলচে রঙের কাগজের ওপর ভায়োলেট কালিতে আঁকা অক্ষরগুলিকে, একটু বড়ো-বড়ো, ডানদিকে হেলানো হাতের লেখা, তার ই-কার উ-কারের লম্বা টানগুলো, যা ওপরের ও নিচের কথাটাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যেন এক নতুন লিপি রচনা করছে, কমার বদলে ড্যাশ-এর অত্যধিক ব্যবহার (বোধহয় কোনো সদ্য-নামজাদা তরুণ লেখকের প্রভাব), দুটো-একটা মজার বানান ভুল (যেমন চিহ্নে মূর্ধণ্য ণ দিয়ে অকারণে 'সুস্থে' একটা ষ-ফলা বসিয়ে দেয়া)—এই সব-কিছু জোগান দিলো আমার সুখে, আমার রসবোধকে উস্কে দিলো, আর তাছাড়া, যে-কথাগুলোকে সে লেখার পরে দুটো আড়াআড়ি লাইন টেনে কেটে দিয়েছে, তা থেকেও আমি বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম সে তার মনের ভাব কতটা লুকিয়েছে, আর সেই লুকোনো ভাবটা কী। আমি খুব আস্তে ছুঁলাম চিঠিটাকে, নিচু হ'য়ে গন্ধ নিলাম, হালকা ক'রে ঠোঁটে ছোঁয়ালাম একবার, যেন ঐ এক টুকরো কাগজ খুব কোমল ও মূল্যবান কোনো সামগ্রী, যেন আমি হাত দিয়ে জোরে চাপ দিলে হঠাৎ লেখাগুলি শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে।

আমি যে ভাবছিলাম মিতুর সঙ্গে এক স্টিমারে ভ্রমণ করতে পারলে আশ্চর্য কোনো ফলাফল ঘটবে, সেটাই হয়তো ভুল আসলে—স্টিমারেও অন্য লোক থাকবে, অন্য কাজ, খিদে পাবে, বেলা বেড়ে উঠলে ঘুমও পেতে পারে ক্লান্তিতে,

ডেক্-এর ওপর বাক্স-তোরঙ্গ শিশু নিয়ে শুয়ে-ব'সে-থাকা সারি-সারি যাত্রীর ভিড়ে চলাফেরাও সহজ হবে না—মিতুর বা তার মা-বাবায় চেনা অন্য যাত্রীও বেরিয়ে পড়া অসম্ভব কী? তাছাড়া এমন যদি হয় যে অনাদিবাবুরা সেকেণ্ড ক্লাশের যাত্রী, তাহ'লে আমি তো সেখানে পৌঁছতেই পারবো না। কিন্তু চিঠি—চিঠি একেবারেই ব্যক্তিগত, অন্তরঙ্গ, চিঠি আর আমার মধ্যে জগতের কোনো সাধ্য নেই কোনো দেয়াল তোলে—সকলের চোখের আড়ালে, দূরে-দূরে থেকেও, মিলিত হয়েছে দু-জন মানুষ, মুখোমুখি, যেন প্রায় ছুঁতে পারছে পরস্পরকে। অন্য একজন মানুষের সঙ্গে সত্যিকার সহৃদয় সংস্পর্শ—কত কম ঘটে সেটা আমাদের জীবনে; কত বিরল সেই মুহূর্ত, যখন সে আর আমি ছাড়া আর-কেউ নেই, আর দু-জনেরই মন এক সুরে বাঁধা, এক পথে যাত্রী। কত বিপদ—কত খানা খন্দ গর্ত খাদ ঘিরে রেখেছে আমাদের; দুই বন্ধুর মধ্যে একজন যখন 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস' প্রায় শেষ ক'রে এনে টলস্টয় ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারছে না, ঠিক তখনই অন্য জন কোনো অভিনেত্রীর চতুর্থ বিবাহ নিয়ে উত্তেজিত; রেস্তোরাঁয় ব'সে প্রেমিকটি যখন নিভৃত আলাপের সুযোগ খোঁজে, তখন প্রেমিকাটির কান ও মন কেড়ে নেয় মঞ্চনিঃসৃত গীতবাদ্য; তরুণী স্ত্রী যখন বিকেলে চুল বেঁধে স্বামীর অপেক্ষায় ব'সে আছে, স্বামী তখন বাড়ি ফিরে শোনায় তার এইমাত্র দেখা টেনিস খেলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, যার বিন্দু-বিসর্গ তার স্ত্রীর মাথায় ঢোকে না,—এমনি ক'রে, তুচ্ছতম কারণে, অনবরত ব্যর্থ হ'য়ে যায় মনের সঙ্গে মন মেলাবার চেষ্টা। কিন্তু চিঠির এ-সব বিপদ নেই;—আমরা যাকে ভালোবাসি তার নির্যাস যেন ধরা পড়ে তাতে, শুধু আমাদেরই জন্য; মাথা ধরা, খিদে পাওয়া, অন্য লোকের সংসর্গ, অন্য কোনো উপসর্গ—এই সব আকস্মিকতার উৎপাত থেকে তা মুক্ত; এমনকি বলা যায় সেটা দৈবের অধীন পর্যন্ত নয়, যদি না অবশ্য ডাকবিভাগ বিলি করতে ভুল করে।

আর-একটা কথা আমার মনে হয়েছিলো মিতুর প্রথম চিঠি প'ড়ে, পরে যার অনেক প্রমাণ পেয়েছি আমার জীবনে। মানুষের উপস্থিতি আর চিঠি প্রায়ই একরকম হয় না; অনেকের সঙ্গেই মেলামেশা ক'রে বোঝা যায় না তার চিঠি কেমন হবে; কখনো এমন হয় যে সাক্ষাৎমতো যাকে বেশ ভালো লেগেছিলো, তার একটি চিঠি পাওয়ামাত্র তার বিষয়ে আগ্রহ

হারিয়ে ফেলি আমরা, কেননা তার রচিত শব্দগুলো ফাঁস ক'রে দিয়েছে তার এমন কোনো বোকামি বা ন্যাকামি বা অশিক্ষা বা স্থূলতা, তার মধ্যে যার অস্তিত্ব আমরা সম্ভব ব'লে ভাবিনি। আবার এমনও হয় যে কথা শুনে যাকে খুব সাধারণ ভেবেছিলুম, চিঠিতে সে নিজেকে প্রমাণ করে বুদ্ধিমান ও সুরসিক ব'লে। আর যাদের উপস্থিতি ও চিঠি সমান ভালো, তাদেরও একটি নতুন ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে আসে চিঠিতে—তারই উদাহরণ আমার কাছে এখন মিতু। আমি দেখলাম, মিতুর ব্যবহার যতটা লাজুক তার হাতের লেখা ততটাই নিঃসংকোচ, মুখের কথায় সে অত্যন্ত বিনীত হ'লেও তার লিখিত ভাষায় দুর্বলতা নেই—'আপনার চিঠির আশায় থাকবো'—এ-রকম একটা কথা মুখ ফুটে সে কিছুতেই বলতো না আমাকে। চিঠিও সাহিত্যজাতীয় জিনিশ—অন্তত সম্ভাব্য সাহিত্য (মাদাম দ্য সেভিন্যে শুধু তাঁর কন্যাকে চিঠি লিখেই সাহিত্যিক ব'লে গণ্য হয়েছেন);—চোখের তাকানো, কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা, হাতের বা ভুরুর ভঙ্গি—ভাব-প্রকাশের এ-সব গৌণ উপায় সাহায্য করছে না ব'লে শুধুমাত্র ভাষা দিয়েই সব বলতে হয় চিঠিতে; তাছাড়া পরস্পরকে দেখা যাচ্ছে না ব'লে, কোনো কথা শুনে লাল বা ফ্যাকাশে হবার মতো কোনো শ্রোতা মুখের সামনে ব'সে নেই ব'লে, বলা একটু সহজও হয়। মিতুর চিঠি পেয়ে সেই রাত্রেই জবাব লিখলাম আমি, বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরে, রাত দুটো অবধি জেগে; পরের দিন কলেজে যাবার পথে নিজের হাতে ডাকে দিলাম রমনার পোস্টাপিশে। অন্য এক স্বাদ এলো আমার জীবনে, যেন আমাকে ফুঁড়ে নতুন এক হাওয়া বইছে, আমাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে এক নতুন রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা। মিতুর জন্য আমার যে-অভাববোধ, তারই তলা দিয়ে সুখের ফল্গু বইতে লাগলো। আমি বিকেলে ডাকপিয়নের আশায় বাড়ির সামনে পাইচারি করি (এমনও হ'লো পর-পর দু-দিনে দুটো চিঠি এলো মিতুর); খাম খোলার আগেই ভেবে ফেলি আমার উত্তরের প্রথম লাইনটা (যদিও লিখতে ব'সে তা অনিবার্যভাবে বদলে যায়); আর যেদিন সে নীলচের বদলে শাদা কাগজে আর ভায়োলেটের বদলে কালো কালিতে চিঠি লিখলে, সেদিন আমার তেমনি বিস্ময়ের অনুভূতি হ'লো, যেমন হয়েছিলো সবুজ শাড়ি হলদে ব্লাউজে সূর্যাস্তের আলোয় তার নতুন এক চেহারা দেখতে পেয়ে।

একদিন কলেজ থেকে দেরি ক'রে ফিরেছি; কাজল-মামি আমার হাতে একটা পুরু খাম দিয়ে বললেন, 'মিতুর চিঠি—তা-ই না?' সাধ্যমতো উদাসীন-ভাবে বললাম, 'তা-ই তো মনে হচ্ছে।' 'এইমাত্র দিয়ে গেলো ডাকপিয়ন,' খানিকটা জবাবদিহি দেবার ধরনে কাজল আবার বললো, 'তোমাকে বুঝি রোজই চিঠি লিখে মিতু?' 'না, না, রোজ লিখবে কেন। এই—মাঝে-মাঝে।' আমার কেমন একটু অপ্রস্তুত লাগলো কাজলের সামনে, হঠাৎ মনে পড়লো ফটিক-মামা কলকাতা থেকে কাজলকে কখনোই চিঠি লেখেন না—মাঝে-মাঝে আমার মা কেই লেখেন দু-চার লাইন, আর এটা এ-বাড়ির সবাই এমনভাবে মেনে নিয়েছে যে এ-নিয়ে কেউ কোনো মন্তব্য করে না পর্যন্ত, আমারও এ-মুহূর্তের আগে মনে হয়নি এটা কত অস্বাভাবিক, সাধারণ সাংসারিক দিক থেকেও কত বড়ো অন্যায়। 'আর তুমি বুঝি পাওয়ামাত্র জবাব দাও?' ব'লে কাজল ঠোঁটের কোণে হাসলো। আমি একটু লাল হ'য়ে বললাম, 'আমার এই এক বদভ্যাস জানো তো, কিছু লেখার জন্য হাত নিশপিশ করে, আর-কিছু না পারি তো চিঠিই সই।' কাজলের মুখ গম্ভীর হ'লো, আমার চোখে চোখ ফেললো মুহূর্তের জন্য; তারপর হঠাৎ—কিন্তু অতর্কিতে নয়, সুচিন্তিতভাবে—তার ঠোঁট থেকে আস্তে একটি প্রশ্ন খ'সে পড়লো, 'তুমি মিতুকে বিয়ে করবে?' মুহূর্তের জন্য যেন আলপিন ফুটলো আমার সারা মুখে, নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'কী যে বলো, আমার মনের ত্রিসীমানায় বিয়ের চিন্তা নেই। তুমি বুঝি ভাবো কাউকে চিঠি লিখলেই তাকে বিয়ে করতে হবে?' 'থাক থাক, আর বলতে হবে না, যে-রকম লাল হ'য়ে উঠেছো তাতেই সব বোঝা গেছে। চা খাবে এসো।'

এর পর থেকে কাজল মাঝে-মাঝেই আমাকে শোনাতে লাগলো মিতুর সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লে কী ভালোই না হয়। 'চমৎকার মানাবে তোমাদের দু-জনকে—আহা, এক্ষুনি কেন, কিন্তু এম. এ. পাশ ক'রে বেরোতে তো বেশি দেরি নেই তোমার, চাকরিও পাবে, এখন থেকে ঠিক হ'য়ে থাক না। আমি নিশ্চয়ই জানি মিতুর মা-বাবার আপত্তি হবে না, তাঁরা তা-ই চাচ্ছেন মনে-মনে, আর আমরাই বা এর চেয়ে ভালো পাত্রী কোথায় পাবো তোমার জন্য? কী বলো—ওঁরা ফিরে এলে ওঁদের কানে তুলে দেবো নাকি কথাটা? মিতুকে তোমার বৌ ব'লে ভাবতে আমার এত আনন্দ হয় যে কী বলবো!' অন্য

কেউ এ-ধরনের কথা বললে আমি ভীষণ রেগে যেতাম, হয়তো আর কথাই বলতাম না তার সঙ্গে, কিন্তু—যেহেতু মিতুর হৃদয়ের ভাষা আমি তার চিঠির মধ্যে শুনতে পেয়েছি, তাই যেন আমার কাজলের কাছে অপরাধী লাগছে নিজেকে ; যেন কাজলের প্রাপ্য ভালোবাসাই তার বদলে আমার কাছে চ'লে এলো—এমনি একটা অস্বস্তি আমি অনুভব করি, সে যখন আমার কাছে মিতুর সঙ্গে আমার বিবাহিত জীবনের রঙিন ছবি আঁকে ; বা বলা যায় প্রেমে পড়ার ফলে আমার চরিত্রের এটুকু উন্নতি হয়েছে যে কাজলকে আমি করুণা করতে শিখেছি এখন, তাকে প্রশ্রয় দিতে আমার আপত্তি নেই ; মিতুকে আর আমাকে নিয়ে তার জল্পনা-কল্পনা শুনতে আমার খুব খারাপও লাগে না সত্যি বলতে—হয়তো এই ভাবটাকেই চলতি ভাষায় বলে 'সহানুভূতি'। আমার ভালো লাগে ভাবতে যে অন্য একজন মানুষ আমার ভালোবাসাকে সমর্থন করে, ভালো লাগে যে সেই অন্য মানুষটিকে আমি কিছুটা সুখীও করতে পারি দু-দণ্ড তার কাছে ব'সে গল্প ক'রে। এমনি ক'রে কাজলের সঙ্গে আমার অন্য একটা সম্পর্ক গ'ড়ে উঠলো ; আমি কলেজ থেকে এলে সে-ই আমাকে চা দেয়, খাবার দেয় ; আমি (তাকে সুখী করার জন্যই) তাকে বলি আমার রুমালে তার ও-ডি-কলোন থেকে কয়েক ফোঁটা মাখিয়ে দিতে, একদিন বলার পরে রোজই আমার রুমালে সুগন্ধ পাই। মিতু যেদিন লিখলে তারা সামনের শুক্রবার ফিরছে, সেদিনও আনন্দের আতিশয্যে খবরটা কাজলকে না-জানিয়ে পারলুম না। কিন্তু তার পরের দিনই—পুজো প্রায় এসে গেছে তখন—ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধলো।

১৩

এই যে, চা দেবী আবির্ভূতা হয়েছেন—আসুন। আমার প্রথম প্রেম, আর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে টেকসই। শুরু করেছিলুম আট বছর বয়সে, তারপর এখনো, বিকেল পাঁচটা নাগাদ, আমার অ্যাল্কহলে ডোবানো স্নায়ুগুলো কাৎরে ওঠে কয়েক ফোঁটা ট্যানিন রসের জন্য। ধন্য বলি এই অভ্যেসকে যা পঞ্চাশ বছরেও আমাকে ছেড়ে যায়নি, অনেক দুঃখের দিনে বন্ধুর মতো যে পাশে ছিলো। ধরুন না সেই দাঙ্গার সময়—আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই? য়ুনিভার্সিটি ছুটি হ'য়ে গেছে, শহর অচল, রোজ রাত্রে যুদ্ধের হুংকার, আর্তের চীৎকার, আগুনের উল্লাস, ঘুম নেই। আমি ঢাকার ছেলে, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা নতুন নয় আমার কাছে, কিন্তু আগে যাকে মনে হ'তো শুধু উপদ্রব, বিশ্রী একটা অসুবিধের ব্যাপার, এবারে তা রীতিমতো যন্ত্রণা দিচ্ছে আমাকে—যেহেতু এরই জন্য দিনের পর দিন মিতু আটকে আছে কলকাতায়। কাগজের হেডলাইন, ইতিহাস—আর আমাদের জীবন: এ-দুয়ের মধ্যে গরমিলটা কখনো ভেবে দেখেছেন কি? পার্ল হার্বরে যেদিন বোমা পড়লো, সেদিনও কি হিরোশিমায় ছিলো না অনেক তরুণ-তরুণী, যারা বাগ্‌দত্ত, বা সেই তারিখেই বিয়ে হ'লো যাদের—তারা কি পলকের জন্যও ভেবেছিলো ঐ ঘটনার কী-রকম সব ফলাফল হ'তে পারে তাদের জীবনে, আর তাদের সন্ততিরও জীবনে? তেমনি, আমাকেও যদি কোনো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তখন বলতেন, 'এই দাঙ্গার শেষ পরিণাম কী, জানো? ভারতবর্ষ তিন টুকরো হ'য়ে যাবে!'—তাহ'লে আমিও ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে জবাব দিতাম, 'তা যা-ই হোক, কিন্তু মিতু কবে ফিরবে তা বলতে পারেন?' যাদের ঘর পুড়ছে, স্বামী-পুত্র খুন হচ্ছে, যারা রাস্তায় ছোরা খেয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না, যে-চাষির বৌ শহরে সব্জি বেচতে এসে আর ফেরেনি, যে-সব দিন-মজুরের রোজগার বন্ধ—আমার যন্ত্রণা তাদের জন্য নয়, নিজের অসহায়, আশাহীন, হাত-পা-বাঁধা অবস্থার জন্য—যেহেতু আমার এমন কোনো সাধ্য নেই যে

বাঞ্ছিতার ফিরে আসার তারিখটিকে একটি দিনও এগিয়ে আনতে পারি। যে-মানুষ প্রেমে পড়েছে, যে-তরুণ কবির প্রথম বই ছাপা হচ্ছে, যে-বিজ্ঞানী কোনো আবিষ্কারের প্রান্তে এসে রাত ভ'রে ল্যাবরেটরিতে অনিদ্র—এদের কাছে দাঙ্গা, যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা ছাপিয়ে তখনকার মতো বড়ো হ'য়ে ওঠে তাদের প্রেম, কবিতার বই, প্রায়-খুঁজে-পাওয়া নতুন জ্ঞান। যারা চায় আদর্শ সমাজ গ'ড়ে তুলতে, যেখানে কারো কোনো অহংবোধ আর থাকবে না, থাকবে শুধু এক সর্বব্যাপী সমষ্টিচেতনা, তাদের তাই প্রথমেই লক্ষ্য হওয়া উচিত কবিতার হত্যা, ভালোবাসার ধ্বংস; জ্ঞানের স্পৃহা বা সৌন্দর্যপ্রীতির মতো প্রবণতা—যা মানুষকে অন্যদের থেকে আলাদা ক'রে দেয়—তার অবলুপ্তি। কিন্তু এ-সব কথা তখন আমি ভাবিনি, আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিলো অনুপস্থিত মিতু। সেই ক্লান্ত বিরস বিরক্তিকর কুৎসিত দিনগুলোর মধ্যে শুধু কয়েকটা মুহূর্ত সহনীয় হ'য়ে উঠতো, যখন কাজল আমাকে এনে দিতো, অসময়ে, জেগে-ব'সে-থাকা বা ঘুম-ভেঙে-যাওয়া কোনো রাত্তির দুটোতে হয়তো—সোনালি সুগন্ধি এক পেয়ালা চা। শুধু চায়ের জন্য নয়, কাজলের সঙ্গও আমার ক্রমশ একটু বেশি ভালো লাগছিলো—অন্য কোনো সঙ্গী নেই ব'লে, আর-কিছু করার নেই ব'লে। দিন-রাত আটকে আছি বাড়ির ক-খানা দেয়ালের মধ্যে—বড়োজোর পাড়ার মধ্যে একটু পাইচারি করি কখনো বা, কিন্তু কাছাকাছি কথা বলার মতো কেউ নেই, কোনো লেখাতে মন বসে না, বই পড়াতেও অরুচি ধ'রে যাচ্ছে—এ-রকম অবস্থায় কাজলকেই আমার মনে হচ্ছে মরুভূমিতে ছোট্ট ওয়েসিসের মতো, অন্তত একটু ছায়া, একটু জল, একটু বৈচিত্র্য। আগের মতো নিঃশব্দ আর শিথিল আর নেই কাজল, এখন সে কথা বলে, তার চলাফেরাও বেশি স্বচ্ছন্দ, সন্ধেবেলা মাঝে-মাঝে আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে যায় সে, আমি তাকে তারা চেনাবার চেষ্টা করি, গ্রহ আর নক্ষত্রের তফাৎ বোঝাই; কখনো বা দুপুরে খাওয়ার পর নিজের ঘরে বিছানায় গা ঢেলে না-দিয়ে আমার ঘরে ডেকচেয়ারটায় ব'সে গল্প করে সে। কথাবার্তার বিষয় তার বেশি নেই, কিন্তু পাড়ার ছেলেরা—যারা রাত্রে লাঠিসোটা নিয়ে পাহারায় থাকে আর দিনের বেলা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে চাল ডাল শাকসব্জি জোগান দেয়—কখনো এমনকি কিছু মাছ কিংবা হাঁসের ডিম—সেই কর্মিষ্ঠ, সাহসী ও পরোপকারী ছেলেদের মুখে মুসলমান-নিধনের নিত্যি-নতুন প্ল্যান

শুনে-শুনে আমি এমন অবসন্ন হ'য়ে পড়ি যে সে-তুলনায় আমার বরং ভালো লাগে কাজলের জলপাইগুড়ির বাল্যস্মৃতি, আর আমাকে আর মিতুকে ঘিরে তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন, যাতে নিজের একটি অংশ সে তৈরি ক'রে নিতে চাচ্ছে দূতী হ'য়ে, ঘটকালি ক'রে। আমি সাবধান থাকি যাতে ফটিক-মামার কোনো প্রসঙ্গ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে (দাঙ্গার খবরে উদ্বিগ্ন হ'য়েও কাজলকে আলাদা কোনো চিঠি লেখেননি ফটিক-মামা, আমারও আর ভালো লাগে না তাঁর কথা ভাবতে), যাতে আচমকা কখনো আঘাত না-দিয়ে ফেলি কাজলকে। আমার এই সুশ্রী ও বঞ্চিতা আত্মীয়াটিকে দয়া করা আমার কর্তব্য, এমনি একটা দাম্ভিক মনোভাব আমি এড়াতে পারি না ; আবার অন্য দিক থেকে মনে হয় আমি রীতিমতো কৃতজ্ঞ তার কাছে, যেহেতু অনুপস্থিত মিতু আর আমার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সেতুর মতো যেন হ'য়ে আছে সে, মিতুর অভাবের কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণের মতো। কাজের অভাবে, শূন্যতার চাপে যখন হাঁপিয়ে উঠি, তখন আমি মাঝে-মাঝে একটু খেলাও করি তাকে নিয়ে, আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝতে দিই যে অন্য দু-একটি তরুণীকেও আমার মন্দ লাগে না—এই যেমন আমাদের য়ুনিভার্সিটির বিজয়া সেন। এই খবর শুনে কাজল রীতিমতো অস্থির হ'য়ে ওঠে—প্রাগুক্ত কাল্পনিক বিজয়া সেন দেখতে কেমন, কোন ইয়ারে পড়ে, বয়স কত, চশমা আছে কিনা—তার এই ধরনের কৌতূহল আমাকে মেটাতে হয় ; এম. এ. পড়ে শুনে আঁৎকে ওঠে কাজল—'ওরে বাবা, তাহ'লে তো বুড়ি!' 'তা কেন—আমারই বয়সী—ছোটোও হ'তে পারে।' 'বোকা ছেলে—একুশ বছরের ছেলেরা হ'লো কচি ডাব, আর মেয়েরা একদম ঝুনো নারকোল, তাও জানো না।' আমার মজা লাগলো কাজলের উপমা শুনে—'কই, তোমার তো একুশেরও বেশি, কিন্তু তোমাকে কি বুড়ি মনে হয়?' 'কী পাকা ছেলে রে বাবা! ফাজিল!' একটু লাল হ'লো কাজল, তারপর আর-একটা আপত্তি খুঁজে পেলো, 'বিজয়া সেন—তার মানে বদ্যি? তাহ'লে তো বিয়ে হ'তে পারবে না।' 'কেন পারবে না? ও-সব কায়েৎ-বদ্যি কেউ আবার মানে নাকি আজকাল!' 'বলো কী তুমি? জাতে না-মিললে তো হিন্দুমতে বিয়েই হবে না।' 'তাতে কী? আইনের মতে হবে।' এবারে গম্ভীর হ'লো কাজল, একটু চুপ ক'রে বললো, 'আমি জানি তুমি বানিয়ে বলছো, বিজয়া সেন ব'লে কেউ নেই।' 'বা রে, থাকবে না কেন—রোজ দেখা হয় কলেজে, আর

তুমি বলবে মানুষটাই নেই! ভালো ছাত্রী—ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছিলো ঢাকা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে।' 'আচ্ছা, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো—আমাকে ছুঁয়ে বলো, তাহ'লে বুঝবো!' আমার দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দিলো কাজল, আমি হেসে উঠলাম, সেও হাসলো তার সুন্দর আঁটো দাঁতে ঝিলিক তুলে—মিতুর প্রতি আমার নিষ্ঠায় যে সত্যি কোনো চিড় ধরেনি তা জানতে পেরে তার মন হালকা হ'লো। কিন্তু পরমুহূর্তেই যেন আশঙ্কার ছায়া পড়লো তার মুখে, হঠাৎ আমার হাত চেপে ধ'রে ব'লে উঠলো, 'বলো—কথা দাও আমাকে, মিতু ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে ভাববে না কখনো!' যে-রকম তীব্রভাবে সে বললে কথাটা তাতে আমি অবাক হলাম; তার মাংসল নরম মুঠো থেকে নিজের হাতটা আস্তে-আস্তে ছাড়িয়ে নিতে-নিতে আমার মনে হ'লো যে কাজলের জন্যই মিতু হ'য়ে উঠছে আমার জীবনে আরো বেশি বড়ো, আরো বেশি সত্য। আমার লজ্জা করলো সহপাঠিনী-সংক্রান্ত রসিকতাটা উদ্ভাবন করেছিলুম ব'লে, কাজলের চোখের দিকে তাকিয়ে যেন বিশ্বাস হ'লো যে হৃদয়ের সব আকাঙ্ক্ষা একান্তভাবে একজনকে সমর্পণ করাকেই বলে সার্থকতা। আমাকে অন্যমনস্ক দেখে কাজল বললো, 'কী ভাবছো? আজ চিঠি আসার তারিখ বুঝি? কিন্তু পিয়ন আসার এখনো সময় হয়নি।'

মিতুর চিঠি! ঐ এক নতুন ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে আমার মনে। দাঙ্গার শুরুতে শহরের এমন অবস্থা হয়েছিলো যে দু-দিন ডাক পর্যন্ত বিলি হয়নি; তারপর একই সঙ্গে তিনটে চিঠি এলো মিতুর। ঢাকা থেকে এক আত্মীয়ের টেলিগ্রাম পেয়ে তার বাবা ফেরার তারিখ পেছিয়ে দিয়েছেন—'কাগজ প'ড়ে মনে হচ্ছে সাংঘাতিক ব্যাপার, আপনারা ভালো আছেন তো? খুব সাবধানে থাকবেন, বেশি আর কী বলবো। এদিকে মা-বাবা অস্থির হ'য়ে আছেন বাড়িটা খালি আছে ব'লে, লুঠতরাজ না হ'য়ে যায়, কেন যে এ-সব গোলমাল বাধে কে জানে। শহরের অবস্থা একটু ভালো হ'লেই আমরা আর এক মুহূর্ত দেরি করবো না।' তিনটে ছোটো-ছোটো চিঠি, প্রায় একই কথা প্রত্যেকটাতে; শেষেরটায় লিখেছে, 'পারেন তো রোজই চিঠি লিখবেন, দুশ্চিন্তায় আমি ঘুমোতে পারি না।' অনেকগুলো ডাকটিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে চিঠির মধ্যে, যাতে ঐ বস্তুটি সংগ্রহের জন্য আমাকে বিপদের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে বেরোতে না হয়।

আমি প্রায় রোজই চিঠি লিখে চলেছি, কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হচ্ছে আমার লেখার কথা ফুরিয়ে গেছে, মিতুর চিঠিও আর যেন আমাকে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে না। চিঠি : যা নিয়ে আমি মনে-মনে এত বাড়াবাড়ি করেছিলুম, এমনকি ভেবেছিলুম উপস্থিতির চেয়েও ভালো, এখন দেখি সেটা ধোঁয়াটে ছায়ামাত্র, এক ম্লান অশরীরী বিকল্প—ক্ষণিক, আংশিক, খণ্ডিত, বা যেন এক মন্থর গোযান, যাকে ছাড়িয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার উপলব্ধি হ'লো যে পুরো মানুষটার একটিমাত্র মুহূর্তের প্রতিনিধি হ'লো চিঠি : সেটা লিখতে তার যে-দশ মিনিট বা এক ঘণ্টা সময় লেগেছিলো, শুধু সেটুকুই আমি পেলাম ব'লে ধরা যায়—দিন-রাত্রির অবশিষ্ট সময় সে কী-ভাবে কাটায় আমি তা জানি না, সে আমাকে কী-খবর দেবে কিংবা দেবে না, তা সম্পূর্ণ তারই মর্জির ওপর নির্ভর করছে। ঈর্ষা হানা দিলো আমার মনে—কলকাতায় মিতুদের যারা চেনাশোনা, তার গানের যারা ভক্ত, আর যাদের সঙ্গে এবারে নতুন আলাপ হ'লো তার, তাদের সকলের প্রতি ঈর্ষা ; কত হাসি, আনন্দ, বন্ধুতার বিনিময় হচ্ছে নিরাপদ, সুসভ্য, হাজার আকর্ষণে ভরা কলকাতায়, যার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সংস্রব নেই, যার বদলে আমি পাচ্ছি—শুধু এক টুকরো কাগজ, কয়েকটি শব্দ, কয়েকটি কঙ্কালের মতো অক্ষর। আমার চিঠি থেকে স্বাচ্ছন্দ্য চ'লে গেলো, আকারে ছোটো হ'তে লাগলো দিনে-দিনে, তারপর একদিন (যেহেতু প্রেমে-পড়া অবস্থাতেও মাঝে-মাঝে ভঙ্গিধারণ করার লোভ হয় আমাদের) পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে একটা কৃত্রিম চিঠি লিখলাম, প্রচ্ছন্ন অভিযোগের সুরে, যেন, দাঙ্গা মিটে যাবার পরেও, ইচ্ছে ক'রে, আমার কাছে অপ্রকাশ্য কোনো কারণে, বা আমার প্রতি উদাসীনতা-বশত, সে ফিরতে দেরি করছে। এর উত্তর এলো—'আমরা সামনের বেস্পতিবার পৌচচ্ছি, তখন সব কথা হবে। আপনি কিচ্ছু বোঝেন না !'

ততদিনে, প্রায় তিন সপ্তাহ তাণ্ডবের পর, পুজোর সব ক-টা তারিখ পার ক'রে দিয়ে, এক বিমর্ষ বিস্বাদ থমথমে শান্তি নেমেছে ঢাকায়। এ-রকম সময়ে প্রথম যে বাড়ি ব'য়ে আমার খবর নিতে এলো, সে বুলবুল। আমি খুশি হলুম তাকে দেখে, কিন্তু তার মুখে এমন কিছুই শুনলুম না, যা আমার পক্ষে উৎসাহজনক ; আমি যখন এই দাঙ্গা ব্যাপারটাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করছি, ভাবছি ওটা একটা অপলাপমাত্র, দুঃস্বপ্নের মতো অলীক, যে আসলে সভ্যতাই

আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা, তখন বুলবুল ওটাকে আরো বেশি বাস্তব ক'রে তুললো কতকগুলো বীভৎস ঘটনা শুনিয়ে, যার কিছু-কিছু কায়েৎটুলিতে তার স্বচক্ষে দেখা। 'ভাগ্যিশ ও-রকম কিছু চোখে দেখতে হয়নি আমাকে!' আমার এই কথা শুনে বুলবুলের মুখ কঠোর হ'লো। 'তুমি না-দেখলেই হ'লো বুঝি? তাহ'লেই সব ঠিক আছে?' 'তা বেঠিকটাকে ঠিক করার ক্ষমতা তো নেই আমার, তাই এড়িয়ে চলা ছাড়া উপায় কী?' 'ক্ষমতা নেই কে বললো?' আমি হেসে জবাব দিলাম, 'তোমার থাকতে পারে, আমার নেই।' 'সকলে তা-ই ভাবে ব'লেই তো এই দশা আমাদের।' এর উত্তরে আমি বললাম, 'চলো একটু বাইরে ঘুরে আসি।'

রেল-লাইন পেরিয়ে রমনায় এসে একটা নর্দমার বাঁধের ওপর বসলাম তাকে নিয়ে। কার্তিকের বিকেল, য়ুনিভার্সিটি ছুটি থাকার জন্য পথে লোক নেই, বাতাসে এক নতুন ঠাণ্ডার আমেজ, ঋতু-বদলের ইশারা। এতদিন পরে নির্ভয়ে বেড়ানো যাচ্ছে, দুশ্চিন্তা হচ্ছে না এ-কথা ভেবে যে আমাদের শরীরের একটা পৃষ্ঠদেশ আছে, যা আমাদের নিজেদের পক্ষে অদৃশ্য, যেখানে হঠাৎ কেউ ছোরা বিঁধিয়ে দিলে আমরা ঘুরে দাঁড়াবারও সময় পাবো না। কিন্তু এই নবলব্ধ নিরাপত্তাবোধ, মাঠের ওপরে নুয়ে-পড়া প্রকাণ্ড গোল আকাশ, ঘাসের ওপরে রোদ্দুরের হলুদ—যার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার মনে পড়ছিলো প্রি-র‍্যাফেলাইটদের কবিতা, রসেটির কোনো ছবিতে দেখা গাল-ভাঙা, গর্তে-বসা-চোখ, পিঠে লম্বা-হলুদ-চুল-ছড়ানো মেয়েকে—সে-সবের দিকে মুহূর্তের জন্যও চোখ ফেরালো না বুলবুল, কথা বলতে লাগলো। তার কথা যেন খবর-কাগজের সম্পাদকীয়, যেন জনসভার উদ্দীপক বক্তৃতা—ফুটন্ত কেটলির মতো আবেগে ভরা, কিন্তু বিষয়বস্তু ঠিক তা-ই, যা ছাড়া এ-ক'দিন ধ'রে পাড়ায়-পাড়ায় কেউ কিছু বলেনি। আমি কি ভেবে দেখেছি কী অন্যায়, কী অত্যাচার ঘ'টে গেলো এই শহরে? দাঙ্গা তো কতবারই হয়েছে, কিন্তু এ-রকম হিংস্রতা আর কখনো দেখা যায়নি—যেন পশুর স্তরে নেমে এসেছিলো মানুষগুলো। পুজোটা পর্যন্ত হ'তে পারলো না—যার জন্য কত লোক সারা বছর ধ'রে পথ চেয়ে থাকে, সেই কয়েকটা আনন্দের দিনও বরবাদ হ'য়ে গেলো। দু-মাস পরে ঈদ—এখন থেকেই লোকেরা ভয় পাচ্ছে, পাছে আবার একটা গোলমাল বাধে সেই সময়, পাছে একটা পাল্টা জবাবের চেষ্টা হয়। কিন্তু কার দোষে এ-রকম হচ্ছে

বার-বার? দায়ী কে? হিন্দু? মুসলমান? কেউ না। দায়ী তৃতীয় পক্ষ—ইংরেজ—সেই ধূর্ত শয়তান, যে একের বিরুদ্ধে অন্যকে খেলাচ্ছে, ভুলিয়ে দিচ্ছে আমাদের আসল শত্রু কে। এমনি ক'রে এ-দেশের মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকবে ওরা, আমাদের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নেবে। আমি কি জানি পুলিশ কী করেছে এবার? ঘরে আগুন দেবার পেট্রল জুগিয়েছে, দাঙ্গা জীইয়ে রেখেছে কারো-কারো হাতে বল্লম ছোরা তলোয়ার তুলে দিয়ে, আবার অনেক গৃহস্থের ঘরে ঢুকে কেড়ে নিয়ে গেছে রান্নাঘরের বঁটি থেকে মশারি খাটাবার লাঠি পর্যন্ত, যা-কিছু আত্মরক্ষার জন্য কাজে লাগানো যায়। আর্মানিটোলার দিগেন মজুমদারের দুই ছেলে বাধা দিতে গিয়েছিলো, তাদের চাবুক মেরে অজ্ঞান ক'রে দিয়েছে গোরা সার্জেন্ট। ফরাশগঞ্জের শিবেশ্বর পালের পুত্রবধূ ছিলো অন্তঃসত্ত্বা, তার পেটে লাথি মেরেছে জানোয়ারগুলো। এও কি মুখ বুজে মেনে নিতে হবে? আমরা কি প্রতিশোধ নেবো না? আমরা কি ওদের বুঝতে দেবো না যে আমরাও মানুষ?

বুলবুলের মুখ লাল হ'লো, নিশ্বাস ঘন, তার বুকের দ্রুত ওঠা-পড়া আমি লক্ষ করলাম। একটু পরে নিচু গলায় বললো, 'তোমার কিছু বলার নেই, রণজিৎ? তোমার রক্ত গরম হয় না?' তার কথা শুনে আমি যেন নিজের জন্য লজ্জা পেলাম—লজ্জা, যেহেতু আমি তার উত্তেজনায় অংশ নিতে পারছি না, পারছি না প্রতিহিংসায় গরম হ'য়ে উঠতে: একদিকে তার বর্ণিত বীভৎস ব্যাপারগুলো, আর অন্যদিকে—কী বলবো?—আমার অবাধ্য অন্তর্মুখী মন—এ-দুয়ের মধ্যে প'ড়ে গিয়ে এক অসহায় অবস্থা হ'লো আমার। তবে কি আমারও উচিত অন্য সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ইংরেজের উচ্ছেদের জন্য প্রাণান্ত করা? তাছাড়া আর কি নেই কর্তব্যবোধের, হৃদয়বৃত্তির পরিচয়? কিন্তু আমার হৃদয় যদি অন্য কথা বলে, তাহ'লে? আমার মনে পড়লো সেই যেদিন জোন্সের সঙ্গে কিপলিং নিয়ে তর্ক করেছিলাম। তখনও একটা জ্বালা ছিলো আমার মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে; তখনও, গান্ধী যাকে বলেছেন দাস-মনোভাব, আমাদের জীবনের সর্বত্র আমি তার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। তখনও আমার বন্দী মনে হচ্ছে নিজেকে, এক ক্ষুদ্র মলিন অচল সমাজের গণ্ডির মধ্যে বন্দী। কিন্তু তারপর থেকে—এই মাত্র মাস দুয়েক সময়ের মধ্যে—দেশের অবস্থা যদিও একই আছে, বা আরো খারাপ হয়েছে বলা যায়—কোনো-কোনো বিষয়ে পরিবর্তন

হয়েছে আমার। জোন্সের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে আমার ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রশমিত হয়েছে, ইতিহাসকে একটু অন্যভাবে দেখতে শিখেছি; আমার মনে এই কথাটা উঁকি দিচ্ছে যে ইংরেজ যদি আজ সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট হ'য়ে থাকে তার পেছনে তাদের কিছু যোগ্যতা নেই তা নয়, আর আমাদের এই হতচ্ছাড়া অবস্থা হয়েছে হয়তো আমাদেরও অনেক দোষের জন্য। তাছাড়া আমি জীবনে এখন অন্য এক প্রেরণা পেয়েছি—প্রেম: আমার চোখের সামনে দিগন্ত খুলে গেছে, আমার পক্ষে পানাপুকুর ছেড়ে প্রখর নদীতে নৌকো ভাসানো আর সম্ভব নয়। আমি চাই না এখন ঘৃণা করতে, ক্রুদ্ধ হ'তে, জগতে যেখানে যেটুকু ভালো আছে সেটুকুই দেখতে চাই; আমি জানি না আমাদের দেশের সমস্যার কী ক'রে সমাধান হবে, কিন্তু আমি আমার জীবন নিয়ে কী করতে চাই তা আমি জেনে গিয়েছি, তারই জন্য সবটুকু সময় আমি খাটাতে চাই। আমি বুলবুলকে জিগেস করলাম তাদের স্বদেশী মেলার কী হ'লো।

'আর স্বদেশী মেলা!' নিশ্বাস ছাড়লো বুলবুল, 'এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম—সব পণ্ড হ'লো। কিন্তু এটাও এখন ছোটো কথা হ'য়ে গেছে। বিভা-দি বলছেন মেলাটা বাদ দেবেন এ-বছর, আরো কঠিন কাজ হাতে নেবার সময় হ'লো। বিষাক্ত ঘায়ে মলম লাগিয়ে আর লাভ নেই—অস্ত্রোপচার চাই! ওরা কি এখনো ভাবছে জেলে পুরে, ফাঁসিতে লটকে ঠেকাতে পারবে আমাদের? মেদিনীপুরে তিনটে ম্যাজিস্ট্রেট নিপাত হবার পরেও? ঢাকাতেও একটি ছোট্ট নাটক তৈরি হচ্ছে।' জোরে নিশ্বাস ফেললো বুলবুল, মুহূর্তের জন্য তার চোখ স্থির হ'লো আমার চোখের ওপর। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'বুলবুল, তুমি কী বলছো আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু—' 'কিন্তু তুমি এর মধ্যে নেই—এই তো?' নরম ক'রে হাসলো বুলবুল। 'ভয় নেই, তোমাকে কোনো ফ্যাশাদের মধ্যে জড়াবো না। চারদিকে কী-রকম ধর-পাকড় হচ্ছে দেখছো তো? দাঙ্গার মধ্যেই পঞ্চাশটি ছেলেকে ডেটিন্যু ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছে, কবে কার ঘরে নেকড়ে হানা দেবে কেউ জানে না। আমি বরং আর তোমার কাছে না এলাম।' তার শেষ কথাটায় আমার পৌরুষে আঘাত লাগলো, তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম, 'সে কী? আসবে না কেন? অত ভয় পাবার কী আছে?' এর উত্তরে বুলবুল বললো, 'আমার জন্য কোনো ভয় নেই,

কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তুমি হয়তো আশ্চর্য কোনো বই লিখবে কোনোদিন—মিতুকেই তোমার দরকার, আমাকে নয়।' আমি—মূঢ় যুবক—মনে-মনে একটু খুশি না-হ'য়ে পারলুম না এ-কথা ভেবে যে বুলবুলের কাছেও আমার কিছু মূল্য আছে, আমার সাহিত্যিক উচ্চাশাকে সেও শ্রদ্ধা করে, যদিও আমি তাকে আসলে তেমন পছন্দ করি না।

'চলি এখন,' বুলবুল দ্রুত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো। সূর্য অস্ত যাচ্ছে তখন, অর্ধেক পৃথিবীতে ছায়া, রমনার মাঠ খাঁ-খাঁ করছে চারদিকে, হঠাৎ এক বিষাদ নামলো আমার মনে, এক জগৎ-জোড়া শূন্যতার অনুভূতি যেন, আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে, সন্ধেবেলার ঠাণ্ডা আকাশে মিটমিটে তারার মতো, ফুটে উঠলো অসংলগ্ন কয়েকটা স্মৃতি। 'বুলবুল, একটু বোসো, এসো অন্য কথা বলি।' 'কী, বলো ?' 'ইংরেজ নয়, হিন্দু-মুসলমান নয়—হঠাৎ আমার অন্য সব কথা মনে পড়ছে। তুমি হয়তো হাসবে শুনে, তবু বলি। বুলবুল, কোনো চৈত্রমাসের দুপুরবেলায় শাঁখারিবাজারের মধ্য দিয়ে হেঁটেছো কোনোদিন ? কী আশ্চর্য সেই সরু, ছোট্ট, পুরোনো গলিটি, দু-দিকে গায়ে-গা-ঠেকানো তেতলা-চারতলা চকমিলানো বাড়িগুলি, রোদ কখনো ঢুকতে পায় না সেই গলিতে—পা দেয়ামাত্র কেমন একটা সোঁদা, ভ্যাপসা, স্যাৎসেঁতে গন্ধ, শাঁখের করাতের ধারালো আওয়াজ সব সময়, হয়তো দু-শো বা তিনশো বছর ধ'রে এই একই শাঁখা-তৈরির কাজ ক'রে যাচ্ছে এরা, রোদের অভাবে শিটিয়ে শাদা হ'য়ে গেছে গায়ের রং, ঐ একটি গলির মধ্যে চলছে তাদের বংশানুক্রমে সমস্ত জীবন—জীবিকা—অস্তিত্ব। অবাক লাগে না ভাবতে ? আর ঢোকামাত্র ঐ গন্ধটা ! আর-একটা কথা, বুলবুল। ছেলেবেলায় ঘোড়ার গাড়িতে চড়তে যখন, তোমার অবাক লাগতো না লাল নীল সবুজ কাচের মধ্য দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ? আমি, জানো, মুগ্ধ হ'য়ে দেখতুম সারাক্ষণ—রাস্তা, বাড়ি, লোকজন সব রঙিন হ'য়ে গেছে—অন্য ধরনের রোদ—ভারি নরম ; আকাশ আরো গভীর হ'য়ে আরো কাছে স'রে এসেছে যেন, আর তারই সঙ্গে ঘোড়ার খুরের ঠকঠক শব্দ, গাড়োয়ানের শিস—চাবুক—ঘণ্টা—যে-গদিতে ব'সে আছো তার চামড়ার ঠাণ্ডা গন্ধ—সব মিলিয়ে কেমন নেশার মতো যেন—এ-সব তোমার মনে পড়ে না কখনো ? তুমি কি সব সময় শুধু দেশের কথা ভাবো, সব সময় তোমার বিভা-দির কথামতো কাজ করো শুধু—

তুমি নিজে কি কেউ নও, তুমি কি তোমার নিজের মধ্যে বাঁচো না কখনো? আমার কী মনে হয় বলবো তোমাকে? ওগুলোই যেন সত্যিকার সুখের মুহূর্ত আমাদের জীবনে, সত্যিকার মনে রাখার মতো ব্যাপার—ঐ যে ঢুকেছিলুম দুপুরের রোদ্দুর থেকে শাঁখারিবাজারের স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডায়, দেখেছিলুম রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে এক রূপকথার মতো আকাশ।' বুলবুল চুপ ক'রে শুনলো আমার কথাগুলো, তার মুখের ভাব ঈষৎ যেন করুণ হ'লো মুহূর্তের জন্য, তারপরেই গা-ঝাঁকানি দিয়ে সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো আবার। ক্ষীণ হেসে বললো, 'কিছু মনে কোরো না বন্ধু, তোমার ঐ ভাবলোকে উড়ে বেড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব? আমার জীবনে কাজ ছাড়া আর কিছু নেই।' বুলবুলের কাছে এ-রকম উত্তরই আমি আশা করেছিলাম, কিন্তু কথাগুলো বলতে পেরে আমার নিজের মন হালকা হ'লো; মনে পড়লো মিতু আসছে পর্শু, আমার এই কী-যেন-কী হারিয়ে-ফেলা ভাবটা এখন অনর্থক, আমি আছি পুনর্মিলনের প্রান্তে।

বুলবুলের সঙ্গে আমার আবার দেখা হ'লো বকুল-ভিলায়, মিতুরা সেখানে পৌঁছবার তিন ঘণ্টা পরে। আমার আগেই এসে ব'সে ছিলো সে, আমি যখন গেলুম তখন একতলার বারান্দায় ব'সে সপরিবারে চা খাচ্ছিলেন অনাদিবাবু। বুলবুল একই কথা বলছিলো—দাঙ্গা, পুলিশ, 'তৃতীয় পক্ষ'; আমার মনে হ'লো, স্বাধীনতা আনার শ্রেষ্ঠ উপায় কোনটা তা নিয়ে একটা তর্ক চলছে তার সঙ্গে অনাদিবাবুর; তিনি গান্ধীর পথে চলতে বলছেন, আর বুলবুল বোধহয় আরো দ্রুত এবং কিছুটা ভয়াবহ কোনো উপায়ের পরামর্শ দিচ্ছে। সে-মুহূর্তে যে-স্বাধীনতায় আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিলো—মিতুকে একটু নিরিবিলি পাবার স্বাধীনতা—তাকে যেন সুদূরপরাহত ক'রে তুললো বুলবুল। আমি বুঝলাম আমার মুখের ভাব ক্রমশ কঠিন হ'য়ে উঠছে, আমার রাগ হ'লো—শুধু বুলবুলের নয়, মিতুরও ওপর, যেহেতু ওসব তর্কাতর্কি মন দিয়ে শুনছে সে—অন্তত শোনার ভান করছে—আমার চোখ এড়িয়ে তাকিয়ে আছে অন্য দিকে। অথচ এই তর্কে সে যোগও দিচ্ছে না—তার মুখের ভাব ক্লান্ত, অন্যমনস্ক। বুলবুলের একটি কথা আমার কানে এলো—'গান্ধীজী আসলে ইংরেজ-ভক্ত, নয়তো যুদ্ধের সময় সাহায্য করেছিলেন কেন তাদের? শত্রুকে যে-কোনো উপায়ে উপড়ে ফেলতে হয়, পলিটিক্সে ভালোমানুষির কোনো

জায়গা নেই।' এবারে আমি কথা না-ব'লে পারলাম না—'কিন্তু কে জানে ইংরেজের জন্যই আমরা কি আজ পতিত, না কি আগে থেকেই পতিত ছিলুম ব'লে ইংরেজ অত সহজে কেড়ে নিতে পারলে দেশটা? আমাদের দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা—এ-সবের জন্য আমাদেরও কি দায়িত্ব নেই?' 'নিশ্চয়ই আছে! খুব ভালো কথা বলেছো, রণজিৎ—হয়তো আমরা নিজেদের পাপেই ডুবে যাচ্ছি, আমাদের অস্পৃশ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা, অদৃষ্টবাদ—কী না? রামমোহন থেকে গান্ধী পর্যন্ত এ-সবের বিরুদ্ধে কম চেষ্টা তো হ'লো না, কিন্তু দেশটা কতটুকু বদলেছে?' অনাদিবাবুর কাছে উৎসাহ পেয়ে আমি জোর গলায় বলতে লাগলাম, 'আমরা কী করেছি—গত পাঁচশো বছর, এক হাজার বছরের মধ্যে কী করেছি আমরা, যার জন্য আজ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার দাবি করতে পারি? আমরা কি আটলান্টিক পেরিয়ে আমেরিকার মাটি ছুঁয়েছিলাম, আবিষ্কার করেছিলাম কোনো ক্ষুদ্রতম দ্বীপ, কোনো নতুন ফসল? বাষ্প আর বিদ্যুৎ যে মানুষের এত বড়ো কাজে লাগতে পারে তা কি আমাদের কল্পনাতেও ছিলো কখনো? আমরা কি শিখেছিলাম মাটি খুঁড়ে পেট্রোল বের করতে? বেশি আর কথা কী—আমাদেরই পাহাড়ে জঙ্গলে আগাছার মতো রাশি-রাশি চা গজিয়েছে খুব সম্ভব ঋগ্বেদের সময় থেকেই—তাও আমরা চিনতে পারিনি, এতই আমরা অন্ধ ও নির্বোধ। এই সবই করেছে শাদা চামড়ার মানুষ, তারাই এ-যুগের বীর, অতএব তারা যে পৃথিবীর অধীশ্বর হবে সেটা আর আশ্চর্য কী?' বুলবুল হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলো, 'তাহ'লে তুমি বলছো আমাদেরও বীর হ'তে হবে, ক্ষমতাশালী হ'তে হবে?' তার দিকে তাকিয়ে আমি হঠাৎ থমকে গেলাম, অন্য রকম স্বরে বললাম, 'আমি কিছুই বলছি না। আমি নগণ্য জীব, দেশোদ্ধারের কোনো প্রেস্ক্রিপশন আমার জানা নেই।' অনাদিবাবু বললেন, 'কিন্তু কী-ধরনের বীরত্ব, কী-ধরনের ক্ষমতা সেটা ভেবে দেখা দরকার।' বুলবুল মাথা ঝেঁকে বললো, 'অত ভাবলে কোনো কাজ হয় না, মেসোমশাই!' অনাদিবাবু হেসে বললেন, 'ঐ তো আবার আর-এক তর্ক তুললে, বুলবুল—আমরা যাকে সভ্যতা বলি তা কি ভাবুকের সৃষ্টি, না কর্মীর? দুয়েরই নিশ্চয়ই, কিন্তু—' অনাদিবাবুর চেয়ারের শব্দ হ'লো, 'আজ আমার সময় নেই, আর-একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দেবো যে সব কাজ চিন্তা থেকেই জন্ম নিয়েছে। আমি বেরোচ্ছি,' স্ত্রী আর কন্যার দিকে তাকিয়ে

তিনি বললেন, 'আমার দুই রোগী জরুরি খবর পাঠিয়েছে—গাড়িটা তৈরি হ'লো কিনা দেখি। মিতু, তুই এত চুপচাপ কেন—শরীর খারাপ হয়নি তো?'
'মিতু অন্য কথা ভাবছে—'আমার দিকে একটা কটাক্ষ ক'রে বুলবুলও উঠলো। 'আমিও যাই এখন—মেসোমশাই আমাকে রাস্তার দেউড়িতে নামিয়ে দেবেন?'

মিতু আমাকে নিয়ে দোতলায় এলো—সেই বারান্দাটিতে, যেখানে কয়েক সপ্তাহ আগে অনেক ভরপুর দুপুর আমরা কাটিয়েছি। কিন্তু এই বহু-প্রতীক্ষিত পুনর্মিলনের মুহূর্তটিকে কল্পনায় যে-উচ্চ শিখরে বসিয়েছিলুম, বাস্তব তার অনেক নিচে প'ড়ে রইলো। বেসুরো হ'য়ে আছে আমার মন, আমার আবেগ যেন শুকিয়ে গেছে, নিজেকে তেমনি বিস্বাদ লাগছে যেমন লাগে গ্রীষ্মের দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়ে উঠলে; আজ এক্ষুনি—আর কয়েক দিন আগে রমনায় বেড়াতে বেরিয়ে—বুলবুলের মুখে যে-সব কথা শুনেছিলুম, যা আমার পরমুহূর্তেই ভুলে যাওয়া উচিত ছিলো, আমার রুচিকে যা আহত করে, আমার স্বভাবের যা বিরোধী, আমার সুখের পক্ষে যা হানিকর, সেই কথাগুলোই যেন আটকে আছে আমার মনের তলায়, চিরতার জলের সারাদিন-ধ'রে-জিভে-লেগে-থাকা তেতো স্বাদের মতো, যেন কালো-কালো ছায়া হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার চারদিকে, বা কোনো সূক্ষ্ম বিষ, যা ভুল ক'রে গিলে ফেলে এখন আর উগরে তুলতে পারছি না আমি, থামাতে পারছি না আমার রক্তে তার ছড়িয়ে পড়া। আমি চেয়েছিলাম স্মৃতি দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে বুলবুলকে স্পর্শ করতে—পারিনি; আমার মন তার পক্ষে এক অচেনা দেশ, কিংবা এক নিষিদ্ধ প্রকোষ্ঠ, যেখানে সে কিছুতেই পা বাড়াবে না। আমার কিছু এসে যায় না তাতে; আমি বুলবুলকে ভালোবাসি না; কিন্তু তার জন্য আমার দরদ নেই তাও নয়, হয়তো কোনো বিপদের পথে সে এগিয়ে যাচ্ছে, এমনি একটা আশঙ্কা হানা দিচ্ছে আমাকে। আর আমার পক্ষে সবচেয়ে যা কষ্টের তা এই যে আমার মনের এক গোপন অংশ যেন মেনে নিয়েছে যে বুলবুলের কথাগুলো তেতো হ'লেও সত্য, আর সেখানে মাঝে-মাঝে এমনও একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে যেন ভালোবাসার, ভালোবাসা পাবার, সুখী হবার এই ইচ্ছের জন্য আমি অপরাধী; ছেলেবেলায় ঘোড়ার গাড়ির রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে দেখা আকাশের কথা ভেবে আমি যে আজও উন্মন হ'য়ে যাই, সেটাও আমার অপরাধ। এদিকে মিতুও, হয়তো আমাকে

অন্যমনস্ক দেখেই, কথা বলছে বাধো-বাধোভাবে, কিংবা যেন এক নতুন লজ্জা হেমন্তের সন্ধেবেলার এই কুয়াশার মতো জড়িয়ে আছে তাকে ; আমরা কেউই অন্যজনের কাছে পুরোপুরি উপস্থিত হ'তে পারছি না।

খুচরো বিষয়ে কথা চললো খানিকক্ষণ ; কলকাতায় কেমন কাটলো তাদের, তার নতুন রেকর্ড কবে বেরোবে, দিলদার নওরোজ নতুন আর কী বই লিখলেন, ছাদ-খোলা দোতলা বাস্ কি তুলে দিলো সত্যি ? কিন্তু কলকাতার প্রসঙ্গ শিগগিরই ফুরিয়ে গেলো, কেননা প্রায় সব খবরই চিঠিতে সে লিখেছিলো আমাকে, তাছাড়া মিতু ঢাকায় ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আমার পক্ষে কলকাতার আকর্ষণ তেমন প্রবল নেই আর, সেখানে কী-ভাবে তার সময় কেটেছে সে-বিষয়েও আমি কৌতূহল হারিয়েছি। আর ঢাকার খবর মানেই দাঙ্গা ; সে-প্রসঙ্গ বুলবুল একেবারে চটকে রেখে গেছে। মিতু আমাকে জিগেস করলো আমাদের য়ুনিভার্সিটি কবে খুলবে। 'সামনের সোমবারই খুলে যাচ্ছে।' 'আপনার এম. এ. পরীক্ষা কবে ?' 'দেরি আছে এখনো—সামনের বছর, জুলাই মাসে।' একটু চুপ ক'রে থেকে মিতু বললো, 'এবার কলকাতায়—' 'কী। থামলেন কেন ?' 'বলছি।' হঠাৎ আমার ভেতরকার প্রেমিক-সত্তা জেগে উঠলো, যেন একটা বোবায়-ধরা তন্দ্রার অবস্থাকে দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে আমি তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকালাম। 'এবার কলকাতায় এক ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন তিনি আমাকে বিয়ে করতে চান।' আমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো তার কথা শুনে, শুকনো গলায় বললাম, 'তারপর ?' 'মা-বাবার অমত ছিলো না—ভদ্রলোকটি সব দিক থেকেই চমৎকার।' তার ক্রিয়াপদের অতীত বচন লক্ষ না-ক'রে আমি ব'লে উঠলাম, 'তাহ'লে ঠিক হ'য়ে গেছে ?' 'ঠিক কেন হবে ? কেউ চমৎকার হ'লেই তাকে বিয়ে করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।' 'তুমি রাজি হওনি ?' 'রাজি হবার কথা ওঠে নাকি ?' মিতু একবার তাকালো আমার দিকে, তার চোখে তার মনের ভাষা আমি প'ড়ে নিলাম। 'তোমার মা-বাবা যদি জোর করেন ?' 'তুমি তো জানো, তাঁরা ও-রকম নন। আমি যা বলবো তা-ই হবে।' তারপর নিশ্বাসের স্বরে বললো, 'তুমি একবার বাবার সঙ্গে কথা বলবে নাকি ?' আমি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম, যেন নিশ্বাস পড়ে না, আমার বুকের শব্দে অন্য সব আওয়াজ চাপা প'ড়ে যাচ্ছে। আস্তে আমার হাতের ওপর হাত রাখলো মিতু,

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি অপেক্ষা করবো—তুমি যতদিন বলবে, ততদিন।'

মাথার মধ্যে ঘূর্ণি নিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। প্রেমে পড়া নয়, চিঠি-লেখালেখি নয়, গল্প ক'রে দুপুর কাটানো নয়—বিয়ে। অন্য একজনের সুখদুঃখ ভবিষ্যৎ সব আমার হাতে! আমার সুখদুঃখ ভবিষ্যৎ অন্য কারো হাতে তুলে দেয়া! এত বড়ো দায়িত্ব আমি কি নিতে পারি—আমি, যে এখন পর্যন্ত বলবার মতো কিছুই করিনি, এক দরিদ্র, অনিশ্চিত, পরিচয়হীন, একুশ বছরের যুবক! মিতু—বিখ্যাত অমিতা বর্ধন, কত গুণীমানীর স্নেহের পাত্রী, দিলদার নওরোজ যাকে গানের বই উৎসর্গ করেছেন—সে কিনা এই আমারই জন্য ফিরে তাকাবে না অন্য সব কৃতী পুরুষের দিকে, যারা 'সব দিক থেকেই চমৎকার'! আমার মনে হ'লো আমি যেন আনন্দ আর উৎকণ্ঠার চাপে পিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছি, যেন হঠাৎ আমার ওপর এমন একটা প্রকাণ্ড দাবি এসেছে যা আমি ফেরাতেও পারি না, সহ্য করতেও পারি না; রাত্রে বালিশে মুখ ঘ'ষে-ঘ'ষে নিঃশব্দ চীৎকারে বলতে লাগলাম, 'মিতু, আমাকে তোমার যোগ্য ক'রে নাও, আমাকে তোমার যোগ্য ক'রে নাও।'

দেখছেন, রোদের রং কেমন বদলে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে? হলদে, গোলাপি লালচে: সূর্যদেব পাটে নামছেন। ঐ দুটো পাহাড়ের মধ্যিখানে সূর্য ডোবে আজকাল, আমি ব'সে-ব'সে দেখি, যতক্ষণ না শেষ বিন্দু আলো মিলিয়ে যায়। কিন্তু উটকামণ্ডে সূর্যাস্তের তেমন বাহার নেই, জানেন। মেঘ নেই, তাই রঙের খেলা জমে না; এই গ্রীষ্মেও মাঝে-মাঝে পাৎলা কুয়াশা আঁকড়ে থাকে বাতাসে; এক-একদিন এমন হয় যে আমাদের আকাশের ঐ অগ্নিপিণ্ড, তেজ হারিয়ে, পার্ট ভুলে গিয়ে, কোনো গোলগাল মুখের বোকাশোকা অভিনেতার মতো, শেষ বক্তৃতাটি অসমাপ্ত রেখেই মুখচোরাভাবে নেপথ্যে চ'লে যায়। কিন্তু তবু—এই পড়ন্ত বেলার দিকে তাকিয়ে থাকতে মন্দ লাগে না আমার; ঐ জানলার কাচের বাইরে পৃথিবীটাকে মনে হয় এক সাজানো রঙ্গমঞ্চ, পাহাড়গুলো ফাঁপা হ'য়ে যায়, হালকা, যেন থিয়েটারের পট, আর দূরে-দূরে ছড়ানো ঐ বাড়ি ক-টাও যেন সত্যি নয়, কোনো বাসিন্দা নেই, দৃশ্যটিকে ভ'রে তোলা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই তাদের। নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ করেছেন সকালের চাইতে বিকেলের আলো বেশি উজ্জ্বল? আসলে হয়তো তা নয়, কিন্তু বিকেল এত কোমল হ'য়ে নামে, এমন একটি গোপন দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দেয় তার রোদ্দুরে, এমন সব শান্ত রং বেছে নেয় যে আমাদের চোখের পক্ষে তারই উজ্জ্বলতা অনেক বেশি দর্শনীয় হ'য়ে ওঠে, অনেক বেশি রমণীয়। বিদায়—অবসান—বেদনা: তার মতো সুন্দর আর-কিছু নেই ব'লেই সন্ধ্যা এমন মায়াবিনী। কিন্তু তারপর? তারপরেই ধূসর—কালো—রাত্রি—আমি একা, কেউ কোথাও নেই, আমার ভয় করে তখন, রাত্রে আমার ভয় করে। আমি ঘুমোতে পারি না, মদেও ঘুম নেই, কিছু নেই আমার—অন্ধকারের বুকের মধ্যে অনেক উঁচুতে যে-সব ফুল ফুটে থাকে তাদের সঙ্গে আমার চোখোচোখি হয় না, অত বিরাট রাত্রির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার মতো শক্তি নেই আমার চোখের—আমি চাই ঘন দেয়াল, এই ছোটো ঘর, যেখানে এই সোফাটারই ভাঁজ ভেঙে

দু-জনের মতো বিছানা পেতে নেয় গায়ত্রী—বা বিছানাও পাতে না, মদে চুর হ'য়ে পরস্পরের গায়ে বিনা চেষ্টায় ঢ'লে পড়ি আমরা।

না—আপনার যাবার জন্য ইঙ্গিত নয় এটা। বলেছি তো, স্ত্রীলোকে আমার বিতৃষ্ণা আসলে, শুধু রাত্রে একা ভয় করে ব'লেই আমি চাই তাদের। ভয় কেন? নেলিকে ভয়, কাজলকে ভয়, বাঙালদেশের টেররিস্টদের গুলিকে ভয়। 'সাবধান, রণজিৎ ভুলেও ভেবো না আমাদের প্রতিহিংসা থেকে নিস্তার পাবে,' বলেছিলো বুলবুল কোনো-এক সময়ে—সত্যি কি বলেছিলো, না কি আমি নিজের মনে বানিয়ে নিয়েছি? 'রঞ্জু, আমাকে ভুলো না,' বলেছিলো কাজল কোনো-এক সময়ে—সত্যি কি বলেছিলো, না কি আমি নিজের মনে বানিয়ে নিয়েছি? বলুন তো, যারা ম'রে যায় তারা কি সত্যি ম'রে যায় একেবারে—চিরকালের মতো? আর কখনো—কখনো দেখা হবে না? বলুন তো, মৃত্যু কী? যে ছিলো কোনো-একদিন সবচেয়ে আপন, তারপর যাকে পঁয়ত্রিশ বছর দেখিনি, দেখলেও চিনতে পারবো না, আজ দেখা হ'লে যাকে মনে হবে অত্যন্ত দূর, মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীর মতো, সে-ও কি মৃত নয় আমার কাছে, তার কাছে আমিও কি মৃত নই? আর এই যাকে আমরা 'আমি' বলছি, তাও তো বদলে যাচ্ছে বছরে-বছরে, দিনে-দিনে; যেমন আমাদের শরীরের কোষগুলি অবিরাম ম'রে-ম'রে অবিরাম আবার জন্ম নিচ্ছে, তেমনি আমাদের আমিত্বও কোনো স্থির বস্তু নয়—সাময়িক, আপতিক, চঞ্চল—এই ধরুন না আমার সেই একুশ বছরের 'আমি' আজ ব্যাবিলনের কোনো সম্রাটের মতোই মৃত, টিকে আছে তার উত্তরাধিকারী অন্য একজন, একই নামে, একই শরীর নিয়ে। তাহ'লে দাঁড়ালো এই যে আমরা প্রত্যেকেই আংশিকভাবে অনবরত ম'রে যাচ্ছি, অনেক ছোটো-ছোটো মৃত্যুর সমষ্টির নাম দিয়েছি জীবন, আর যখন অন্যদের সঙ্গে একেবারে সব সম্পর্ক চুকে যাচ্ছে, সেই অবস্থাটাকে মৃত্যু বলছি। কিন্তু আমাদের নিজেদের মৃত্যু আমরা উপলব্ধি করি না, অন্যদেরটাও ভুলে থাকি যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব থাকে; কিন্তু সেই অস্তিত্ব যার যখনই ফুরোয়, তখনই তাকে মৃত ব'লে ঘোষণা করি আমরা, যেহেতু তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কের সম্ভাবনাও আর রইলো না। কিন্তু সেই অর্থে আমিও কি মৃত নই, এই আমি, যে আপনার সামনে ব'সে আছে, কথা বলছে?...আজ্ঞে? আপনি

বলছেন আমারও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, স্মৃতি আছে যেহেতু? তাহ'লে তো যারা ম'রে গেছে তারাও মরেনি, পঁয়ত্রিশ বছর যাদের চোখে দেখিনি তারাও আমার সঙ্গে আছে এখনো, তাহ'লে তো স্মৃতির নামই অমরতা। দেখছি আপনি সবই বোঝেন, আপনি জ্ঞানী—আমারই মতো; জ্ঞানপাপী—আমারই মতো। আমি কৃতার্থ হবো—সত্যি যাকে কৃতার্থ বলে তা-ই—আপনি যদি আজ রাত্রিটা এখানে কাটাতে রাজি হন। এমনি মুখোমুখি ব'সে, সারারাত আমি কথা বলি তাহ'লে। মুখোমুখি, যেন আয়নার সামনে। আপনি আমারই বয়সী, একই সময়ে ঢাকায় ছিলেন, একই পাড়ায়, মুখ দেখে দরদী মনে হয় আপনাকে। বলুন তো, আপনি কি আমাকে চিনতেন না ঢাকায়? হয়তো আপনার জানা কথাই আমি শোনাচ্ছি আবার—শুধু এই তফাৎ, আপনি ভুলে গেছেন, কিন্তু আমি ভুলিনি। ভুলিনি, মিতু যেদিন কলকাতা থেকে ফিরে এলো, তারপর, প্রায় এক মাস ধ'রে, কেমন একটা হাঁপ-ধরা, দম-আটকানো, স্নায়ু-ছেঁড়া অবস্থায় আমি কাটিয়েছিলাম। বহুরূপী সেই যন্ত্রণা, ছলনায় ভরা।…অবাক হচ্ছেন? 'আমি অপেক্ষা করবো, তুমি যতদিন বলবে, ততদিন,' মিতুর মুখে এই কথা শুনে স্বর্গ হাতে পাওয়া উচিত ছিলো আমার? নিশ্চয়ই! তা আমি পাইনি তা তো নয়, আমারও মনে হয়েছে আমি যেন আর আমাতে নেই, যেন এমন কোনো নেশা করেছি যা চিরস্থায়ী, ভেসে বেড়াচ্ছি মেঘে-মেঘে আকাশে-আকাশে, পেয়ে গেছি আমার কল্পনার সোনার খনি, আমার সাহারায় গোলাপের বাগান, সেই আশ্চর্য কিমিয়ার সূত্র যা দিয়ে জগৎটাকে বদলে দেয়া যায়। কিন্তু হাজার হোক, আমরা তো মরণশীল মানুষ মাত্র, স্বর্গ আমাদের সহ্য হবে কেন? একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো আমার মধ্যে; মিতুর সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে পারে, এটা কাজলের কপোলকল্পনা ছাড়িয়ে যখন বাস্তব হ'য়ে উঠলো, এমনকি মনে হ'লো অনিবার্য, তখনই এই পরিণতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেয়া যেন কঠিন হ'য়ে উঠলো আমার পক্ষে। কে যেন প্রতিরোধ করছে আমার ভেতরে ব'সে, প্রতিবাদ করছে। অদ্ভুত, যে এক বছর পরে হোক, পাঁচ বছর পরে হোক, মিতুর হাতে আমি বাঁধা প'ড়ে যাবো, সত্যি বলতে আজ থেকেই সেই বাঁধন শুরু হ'লো। অদ্ভুত, আমার প্রেম, যাকে এতদিন আমি ভেবেছি একটি গানের সুর, সুগন্ধি হাওয়া, স্নায়ুর কম্পন—তাঁকে আজ মেপে

নিতে হচ্ছে সাংসারিক ফিতে দিয়ে, যেন তা দর্জির দোকানের একখানা কাপড়, যা দিয়ে, কালক্রমে, তৈরি হবে ব্যবহারযোগ্য একটি আচ্ছাদন, যার তলায় মিতু আর আমি, একদিন আগেও যারা ছিলো প্রেমিক-প্রেমিকা, স্বাধীন, অনন্ত (কেননা, কোনো তরুণী মায়ের কাছে তার সন্তান যেমন, তেমনি যুবকের কাছেও তার প্রেম অভূতপূর্ব ও অতুলনীয়—এ যে এক চির-পুরোনোর পুনরাবৃত্তি তা তার ধারণার মধ্যে আসে না)—সেই আমরা রাতারাতি সাধারণ স্বামী-স্ত্রীতে রূপান্তরিত হ'য়ে জগতের কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে মিশে যাবো। কোলের শিশু যখন বড়ো হ'য়ে স্কুলে যায়, প্রেমের ওপরে যখন সামাজিক শীলমোহর পড়ে, তখনই অন্যদের সঙ্গে তুলনা আর ঠেকানো যায় না; ছেলে স্কুলের পরীক্ষায় বা স্বামী-স্ত্রী তাদের কর্তব্যপালনে পাছে ফেল হয়, সেই ভাবনা যেন ভালোবাসার বিশুদ্ধ দুধে জল মিশিয়ে দেয়। আপনি অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন আমি মিতুকে সত্যি ভালোবাসিনি, সবই ছিলো ছেলেমানুষি, ভাবোচ্ছ্বাস, গ্যাসে-ভর্তি বেলুন? আমি তর্ক করবো না আপনার সঙ্গে: শুধু এটুকু বলি, মিতুর কথা ভাবতে এখনো আমার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে মাঝে-মাঝে, এখনো আমি জানি যে জীবনে সেই একবারই কোনো মেয়েকে আমি ভালোবেসেছিলাম—একবার, মাত্র কয়েকদিনের জন্য। আর তাই—যেহেতু নিজের মধ্যে টের পাচ্ছি একটা অনুচিত দ্বিধা, একটা অন্যায় অনিশ্চয়তার দোটানা, এমন কোনো দুর্বলতা যার অস্তিত্ব আমার মধ্যে কখনো সন্দেহ করিনি—তাই আমার কষ্ট। কল্পনা নয়, বানানো গল্প নয়—জীবন, সত্যিকার জীবন এগিয়ে এলো আমার দিকে, কিন্তু আমি তাকে দু-হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরতে পারছি না কেন? যে-আমি ঈর্ষা করেছি কলকাতার শহরসুদ্ধু লোকেদের—মিতু ঢাকায় ফেরার আগের দিন পর্যন্ত—সেই আমি কেন এখন ভাবছি যে একটু দূরত্ব, একটু সংশয় না-থাকলে ভালোবাসা সম্পূর্ণ হয় না?

আরো একটা কষ্টের কারণ ছিলো আমার, আরো বেশি লজ্জার সেটা। মিতু আমারই সঙ্গে থাকবে—একই বাড়িতে—সারাক্ষণ, এই কথাটা মাথায় ঢোকামাত্র যেন দ্বিগুণ বেগে উদ্ধত হ'য়ে উঠলো আমার সত্তার সেই অংশ, যা অতি স্থূল রক্তমাংস দিয়ে তৈরি। মিতু, নিজে না-জেনে, হয়তো কিছু না-বুঝে, আমাকে দীক্ষিত করলো কামনায়, অচরিতার্থ কামনার দহনে। এই আমার প্রথম চোখে পড়লো তার স্তনের বোঁটা দুটি কেমন ফুটে ওঠে মাঝে-

মাঝে ;—তার ব্লাউজ আর বার-বার টেনে-দেয়া আঁচল যতই চাপা দিক, তারা যেন, কৌতুকে আর কৌতূহলে মেশা ভঙ্গিতে, জগতের কাছে জানান না-দিয়ে পারে না যে তারা আছে, তারা প্রস্তুত। এই যেন আমি প্রথম বুঝলাম যে নারীর রূপের উপাদান শুধু মুখ নয়, তার শরীরও। মিতুর সজল ঠোঁটের নড়াচড়ার দিকে তাকিয়ে তার কথার জবাব দিতে আমি ভুলে যাই ; সে যখন তার বসার ভঙ্গি বদল করে বা উঠে দাঁড়ায়, বা হেঁটে যায় এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, তখন আমার মনে হয় তার শরীর যেন আঁকাবাঁকা চঞ্চল কয়েকটা রেখার সমষ্টি, যা কখনো-কখনো তার চারদিকে ছিটিয়ে যাচ্ছে, ছুটে আসছে আমারই দিকে, যেন আমার কাছে কোনো উত্তর দাবি ক'রে। তার স্তন দুটি যেখানে পৃথক হ'য়ে গেছে, সেই রেখাটি মুগ্ধ করে আমাকে ; আমি তার উপমা খুঁজি দ্বিতীয়ার চাঁদে, জলের স্রোতে ভেঙে-যাওয়া জ্যোছনায়, কিন্তু পারি না তাকে পুরোপুরি কবিতায় রূপান্তরিত করতে, স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি পাই না। মনে হয় চোখের দেখা অনেক হ'লো, সব কথা ফুরিয়ে গেছে—শরীর দিয়ে শরীরকে জানতে হবে এবার। আমার মধ্যে যে কামনার অস্তিত্ব আছে এই উপলব্ধি অবশ্য নতুন নয় আমার পক্ষে, কিন্তু এতদিন তাকে সৌন্দর্যবোধের ঢাকনার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলাম ; কাজলের গলার নেকলেসের উজ্জ্বলতা, সবুজ শাড়িতে জলজ উদ্ভিদের মতো মিতু—এই সব ছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ এক-একটি অভিজ্ঞতা, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে, উন্মন করেছে, কিন্তু উত্তাল করেনি। হায় সেই সুন্দর ভাবনা আমার, স্বপ্নের বিলাসিতা, তা কেন আজ ইন্দ্রিয়ের কাম্য হ'য়ে উঠলো ? এক-এক সময় অসহ্য লাগে আমার, যখন তীব্র হ'য়ে ওঠে ইচ্ছে—মিতুকে ছুঁতে, বুকে জড়াতে, চুমু খেতে ; এমনকি এই পাপিষ্ঠ চিন্তাও মাঝে-মাঝে আমার মনের তলায় ন'ড়ে ওঠে যে সে, মিতু, এখনই আমাকে দেহ দান ক'রে তার ভালোবাসা প্রমাণ করুক। কিন্তু আমি জানি মিতু কত পবিত্র, কত স্পর্শভীরু, সুকুমার, কী মর্মান্তিক আহত হবে সে, যদি কখনো কোনো রূঢ় ভঙ্গি দেখতে পায় আমার মধ্যে। 'বাবার সঙ্গে কথা বলবে নাকি একদিন ?' তার মানে—মন্ত্রপূত মিলন, অন্তত তার প্রতিশ্রুতি : 'আগে বিয়ে হোক, তারপরে সব, কিন্তু তা না-হওয়া পর্যন্ত আমরা দু-জনেই উপোসি থাকবো—' এই সংস্কারের প্রাচীন ডালেই তার ভালোবাসার সুন্দর ফুল ফুটে

আছে, সেখানটায় ঝাঁকুনি দেবার মতো সাহস আমার নেই, না-দেবার মতো বিবেক এখনো অবশিষ্ট আছে। কিন্তু, তার এই মনোভাব—যা তার বয়স, সময় ও অবস্থার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক—তা আমাকে পীড়া দেয় গোপনে, মনে হয় সে পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না আমাকে, তার এই ধৈর্যকে আমার মনে হয় সাংসারিক সুবুদ্ধি, এমনকি ভালোবাসার অভাব। আবার, এই কামাতুর অবস্থার জন্য নিজেকেও আমি ক্ষমা কররত পারি না, মনে হয় আমি মিতুর অযোগ্য, দিনে-দিনে ছোটো হ'য়ে যাচ্ছি, আর মিতুকেও নামিয়ে আনছি আমার আবেগের প্রকাণ্ড আকাশ থেকে একটা ছোট্ট হাঁপ-ধরা কুঠুরির মধ্যে। এমনি ক'রে, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের ঝাপটে, এক-একটি দিন কেটে যায়, আমি পায়ের তলায় মাটি পাই না, পাই না সেই প্রত্যয়ের মুহূর্ত যার অনুকূল হাওয়ায় জীবনটাকে অন্য তীরের দিকে ভাসিয়ে দিতে পারি। রোজ যাওয়া-আসা করছি, কিন্তু অনাদিবাবুকে বলা হয় না যা বলতে চাই, যা আমাকে বলতেই হবে—যা তাঁরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, কোন না একদিন, আমাদের দেশের প্রথা অনুসারে, এবং আমাকে লজ্জা দিয়ে, তাঁরাই উত্থাপন করেন প্রসঙ্গটা। মিতুকে বলি, 'যাক না কিছুদিন, তাড়া কিসের, তুমি আমি নিজের মনে তো নিশ্চিন্ত—' সে জবাব দেয় না, শুধু চোখে চোখ রাখে, আর সেই দৃষ্টির সামনে আমার মাথা যেন নিচু হ'য়ে যায়।

আমার কষ্টের একটি প্রতিষেধক আমাকে জুগিয়ে যাচ্ছিলো বুলবুল। প্রতিষেধক—চিকিৎসা—কিন্তু সেই চিকিৎসাই আবার অন্য একটা অসুখ। বিচক্ষণ ডাক্তার যেমন এক অসুখ সারাবার জন্য রোগীর দেহে অন্য অসুখ উৎপন্ন করেন—পাগলের নাড়িতে একশো-তিন ডিগ্রি জ্বর, বা হাঁপানির কষ্ট ঠেকাতে গিয়ে একজীমা—কিংবা যেমন দুই বিপরীত বিষয়ের প্রতিক্রিয়ায় শরীর মাঝে-মাঝে এক ধরনের ভারসাম্য খুঁজে পায়, আট পাত্র হুইস্কির পর দু-পেয়ালা কালো কফি গলায় ঢাললে নিজে গাড়ি চালিয়ে নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছবার বাধা হয় না—তেমনি দুই উল্টো রকমের ব্যামোতে যেন ভুগছিলাম আমি—কখনো এটা, কখনো ওটা, দুটোই সমান ক্ষতিকর, কিন্তু যে-ক্ষতি একটার দ্বারা হচ্ছে তারই পরিপূরণ করছে অন্যটা। বুলবুল মাঝে-মাঝে আসে আমার কাছে; ঢাকেশ্বরী বাড়ির পেছনকার সেই আমবাগানটা সে বেছে নিয়েছে আমার সঙ্গে

কথা বলার জন্য; তার সঙ্গে দেখা হ'লে আমার ভালো লাগেই যেহেতু আমার প্রণয়ের পাত্রী নয় সে, তার কাছে কোনো অবৈধ বা বৈধ চাহিদাও নেই আমার; আমার পক্ষে সে মিতুর মতো প্রয়োজনীয় নয়, বা এমনও নয় যে একমাস তাকে না-দেখলেও তার খোঁজ নেবার জন্য কোনো তাগিদ জাগবে আমার মনে। বুলবুল, একজন মেয়ে, তরুণী (হ'লোই বা সচেতনভাবে নারীত্ব-বর্জিত)—সে যে আমার প্রতি মনোযোগী (দু-জনের স্বভাবের গরমিল সত্ত্বেও), এটা আমার আত্মসম্মানের পক্ষে চাটুকারী; তার সঙ্গে একা রাস্তায় বেড়াতে পারছি আমি (যে-স্বাধীনতা মিতুর সঙ্গে সম্ভব নয়), পারছি সহজভাবে ঢিলে-ঢোলাভাবে কথা বলতে, এগুলোও নেহাৎ মন্দ লাগে না আমার। তবু—বুলবুলের সংসর্গে আমি যা পাই তা সুখ নয়, শুধু আমার কষ্ট থেকে, আবেগের চাপ থেকে নিষ্কৃতি—তাও ক্ষণিকের জন্য; যেমন রোগশয্যায় পাশ ফিরে হঠাৎ মনে হয় বেশ লাগছে, কিন্তু পরক্ষণেই একইভাবে তেতে ওঠে বিছানা, টের পাওয়া যায় গাঁটে-গাঁটে ব্যথা, তেমনি বুলবুলের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হ'লেই আমার মেজাজ বিগড়োতে দেরি হয় না, পদে-পদে ধরা পড়ে যে তাকে আমাকে এক দেবতা তৈরি করেননি। একদিন—মিতুরা তখন সবে ফিরেছে কলকাতা থেকে—বুলবুল হঠাৎ আর্থার জোন্সের কথা তুললো। জোন্সের সঙ্গে আমার কি দেখা হয়েছে শিগগির? আমি বললাম, 'জোন্স তো দার্জিলিঙে।' 'ফিরে এসেছে জানো না?' 'এসেছে বুঝি? তাহ'লে তো যেতে হয় একদিন। তার কয়েকটা বই অনেকদিন ধ'রে প'ড়ে আছে আমার কাছে।' একটু চুপ ক'রে থেকে বুলবুল খুব নিচু গলায় বললো, 'তোমাকে একটা কথা বলি, রণজিৎ। জোন্সের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দাও। ওর বইগুলো ফেরৎ দিয়ে আসতে পারো, কিন্তু আর কখনো যেয়ো না।' আমি হেসে বললাম, 'বুলবুল, কী ক'রে তুমি এমন কথা ভাবতে পারলে যে তোমার কথামতো আমি কিছু করবো বা করবো না?' 'তোমারই ভালোর জন্য বলছি।' আমার মনে প'ড়ে গেলো বকুল-ভিলায় অমূল্য আমাকে যে-পাঁচালি শুনিয়েছিলো জোন্সের বিষয়ে, আর পরমুহূর্তেই তেলতেলে গলায় বলেছিলো, 'আমাকে একটা সুপারিশ জোগাড় ক'রে দেবে?' বললাম, 'থাক, জোন্সের কথা থাক। আমার একটা আর্জি আছে তোমার কাছে।' 'আর্জি? তোমার? আমার কাছে?' বুলবুলের গলার আওয়াজ অন্য রকম শোনালো, যেন মুহূর্তের

অন্যমনস্কতায় তার নারীত্বকে সে প্রকাশ ক'রে ফেললো। 'বাস্টার কীটনের একটা ফিল্ম চলছে এখন—আমার ইচ্ছে তোমাকে আর মিতুকে নিয়ে দেখতে যাই। তুমি রাজি?' 'মিতুকে নিয়ে যেতে চাও—এই তো? তাকে তার বাড়ি থেকে তোমার সঙ্গে একা যেতে দেবে না, তাই একজন শিখণ্ডী দরকার? তা কাজল-মামিকে নিয়ে যাও না।' আমি রূঢ়ভাবে জবাব দিলাম, 'কাজল-মামিকে নিয়ে যেতে হ'লে তোমার অনুমতি দরকার নাকি?' একটু ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো বুলবুল, তারপরেই যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'তুমি মিতুকে নিয়ে যেতে চাইলে আমার সাহায্য দরকার তাও তো আমি নতুন শুনলাম।' ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো সে, তার চোখে একটা অস্বাভাবিক হলদে আভা দপ ক'রে জ'লে উঠলো। হঠাৎ অন্য একটা কথা ঝিলিক দিলো আমার মগজে, যা এর আগে কখনো ভাবিনি, কিন্তু সে-মুহূর্তে তার চোখের দিকে তাকিয়ে যা নির্ভুল ব'লে জানলাম: মিতুকে সে হিংসে করে, আমি তাকে ভালোবাসি ব'লে হিংসে করে। আমি একটা টোপ ছুঁড়ে দিলাম বুলবুলকে, 'তুমি কি বিশ্বাস করতে পারো না যে তুমি গেলে আমার ভালো লাগবে?' আমার কথাটায় কপটতা ছিলো, আসলে বুলবুল ঠিক ধরেছিলো আমার অভিসন্ধি, 'শিখণ্ডী' হিসেবেই তাকে আমি চাচ্ছিলাম, কিন্তু ধরা প'ড়ে গিয়ে আমাকে এমন ভাব দেখাতেই হ'লো যেন বুলবুল না-গেলে আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু আরো বেশী ধরা প'ড়ে গেলো বুলবুল, যখন বললো 'আমি একা গেলেও?' আমার কপটতা আর-এক ডিগ্রি চ'ড়ে গেলো এর উত্তরে, 'মিতু তোমার বন্ধু, আমি ভাবলাম সে থাকলে তুমিও খুশি হবে।' আস্তে মাথা নাড়লো বুলবুল—আর তার চোখে আর গলার আওয়াজে তার অভ্যস্ত নীরব নারীত্বহীনতা সে-মুহূর্তে ফিরে এলো—'না রণজিৎ, সিনেমায় আমি যাবো না, আমার সময় নেই। সময় যদি বা থাকে, কোথাও গিয়ে আমোদ করার মতো মনের অবস্থা নেই। তুমি জানো না, আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে।' 'তাই তো বলছিলাম, বাস্টার কীটনকে দেখে খুব খানিকটা হাসলে তোমার মন ভালো হ'য়ে যাবে।' 'আমার মন অত সহজে ভালো হবার নয়।' 'তাই বুঝি অন্যদেরও মন-খারাপ ক'রে দাও?' এর উত্তরে কঠিন গলায় বুলবুল বললো, 'এ-দেশে কারো সুখী হবার অধিকার নেই—' তারপর, হঠাৎ নরম স্বরে—'তুমি ছাড়া।'

মাঝে অনেকগুলো দিন কেটে গেলো। য়ুনিভার্সিটি খুলে গেছে, দিন ছোটো হ'য়ে এলো, শীত আসতে দেরি নেই। কলেজ, বকুল-ভিলা, কখনো বা জোন্সের সঙ্গে বিকেল কাটানো, মাঝে-মাঝে বুলবুল, মাঝে-মাঝে বাড়িতে কাজলের সঙ্গে গালগল্প—সেই একইভাবে কাটছে আমার সময়, অন্ততপক্ষে বাইরে থেকে দেখলে। কিন্তু একদিন একটা ছোটো ঘটনায় আমাকে চমকে উঠতে হ'লো। বিকেলবেলা বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়েই দেখি, বুলবুল। সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে বললো, 'তোমাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখবো না, জানি তুমি মিতুর কাছে যাচ্ছো। শুধু একটা কথা বলতে এলাম।' 'কী, বলো?' 'তুমি কাল আবার জোন্সের কাছে গিয়েছিলে?' 'কী ক'রে জানলে?' আমার প্রশ্নের জবাব না-দিয়ে বললো, 'এখনো সময় আছে, এখনো আমার কথাটা রাখো, রণজিৎ, জোন্সের বাড়িতে আর যেয়ো না।' 'তুমি কোনো অন্যায় অনুরোধ করলে তা রাখি কী ক'রে?' 'কিন্তু কেন এ-কথা বলছি তা কি তুমি জানো?' 'অনুমান করতে পারি হয়তো—কিন্তু, বুলবুল, আজ আর তর্ক করবো না তোমার সঙ্গে, সত্যি আজ ব্যস্ত আছি।' 'আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারো—দু-মিনিট?' তার দিকে তাকিয়ে আমার করুণ মনে হ'লো তাকে, উশকোখুশকো চুল, আধ-ময়লা আটপৌরে জামা-কাপড়, কোনো জৌলুশ নেই চেহারায়; আমার মনে হলো তার ভেতরে কোনো উত্তেজনা চলছে, আমাকে তার অংশ দিয়ে হালকা হ'তে চায়। 'কী হয়েছে?' 'নতুন কিছু হয়নি, রণজিৎ। আমার খুব কষ্ট হয় যখন ভাবি আমাদের দেশের এক শত্রুর সঙ্গে ব'সে তুমি চা-বিস্কুট খাও।' আমি বাঁকা ঠোঁটে বললাম, 'ও-সব বুলি আমার কাছে আউড়িয়ো না।' 'এত অহংকার কেন তোমার, যে যা-কিছু তোমার মনোমতো নয় তাকেই "বুলি" ব'লে উড়িয়ে দাও? তুমি কি ভেবে দেখেছো জোন্স কেন এত মেলামেশা করে বাঙালি-মহলে? কেন বাংলা শিখছে, বাংলা বই পড়ছে, আসে য়ুনিভার্সিটিতে ডীবেট করতে, বকুল-ভিলায় গানের আসরে? না—আমি জানি তুমি কী বলবে, আমাকে একটু বলতে দাও। হ'তে পারে সে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, হ'তে পারে সে গান ভালোবাসে, হ'তে পারে সে চটপট বিদেশী ভাষা শিখতে পারে, কিন্তু এই সব গুণ সে কোন কাজে লাগাচ্ছে তা কি ভাববে না তুমি? অমনি ক'রে সে ঘরে-ঘরে ঢুকে হাঁড়ির খবর টেনে বের করছে, সর্বনাশ করছে আমাদের! তুমি কি ভুলে

থাকবে যে জোন্সই এই দাঙ্গা বাধিয়েছিলো ঢাকায়, তারপর হাওয়া খেতে দার্জিলিঙে চ'লে গিয়েছিলো, তারই জালে আটকে যাচ্ছে আমাদের ছেলেগুলো—সাপের মুখে ব্যাঙের মতো কপ্‌কপ্‌ ধরা প'ড়ে চালান হ'য়ে যাচ্ছে হিজলিতে বক্সারে? স্পাই—সাংঘাতিক স্পাই—ধূর্ত, জাহাঁবাজ শয়তান—এ-ই হ'লো তোমার আর্থার জোন্স!' আমি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলাম, 'বিশ্বাস করি না।' 'আমরা জানি—আমরা প্রমাণ পেয়েছি।' ঠাণ্ডা গলায় কথাটা বললো বুলবুল, কিন্তু আমি তার চোখে-মুখে রাগের আগুন দেখতে পেলাম। জবাব দিলাম, '"আমরা" বলতে তুমি কী বোঝো জানি না। আমার কাছে কেউ "আমরা" নেই—সকলেই এক-একটি "আমি"।' '"আমরা" মানে আমরা—দেশের লোক।' 'তাহ'লে তো আমিও তার মধ্যে পড়ি ব'লে মনে হচ্ছে। সেই আমি বা "আমরা" তোমাকে বলছি যে "তোমাদের" সব প্রমাণ একেবারে ভুয়ো, আর তোমার এই ধারণা একেবারে মিথ্যে। জোন্স অত্যন্ত খাঁটি মানুষ—আমি জানি—ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের জন্য সে মনে-মনে লজ্জিত, সে যে এই চাকরি নিয়েছে তাও দেশটাকে জানার জন্য, বোঝার জন্য, সে সজ্ঞানে এমন কিছু করতেই পারে না যাতে এ-দেশের কোনো ক্ষতি হবে। ইংরেজ শাসন একটা যন্ত্র, আর জোন্স একজন মানুষ, একজন ব্যক্তি—এ-দুটোর তফাৎ বোঝার মতো বুদ্ধি কি তোমার নেই?' হাসলো বুলবুল আমার কথা শুনে। 'তুমি নিজে ভালো, তাই সকলকে ভালো দ্যাখো। কতটুকু চেনো তুমি জোন্সকে? দু-চারটে বইয়ের কথা বলে আর তাইতে তুমি গ'লে যাও। তুমি ভাবের জগতে ভেসে বেড়াও, তাই ভাবতেই পারো না যার মুখে মধু তার মন গরলে ভরা হ'তে পারে! কিন্তু দোহাই তোমার, জোন্সের সঙ্গে মেলামেশা আর কোরো না তুমি, রমনার ঐ নির্জন পথে কবে কী হ'য়ে যায় বলা যায় না, আমি তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি।' আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললাম, 'আমাকে ভয় দেখাচ্ছো?' 'ভয়ের কারণ নেই কী ক'রে বলি? জোন্স তোমাকে ব্যবহার করছে না, অন্যেরা যদি তা বিশ্বাস না করে?' 'বলতে চাচ্ছো আমি তাকে খবর জোগাচ্ছি—অর্থাৎ, আমিও স্পাই!' হেসে উঠলাম আমি, বুলবুল চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। আবার বললাম, 'তুমি কি পাগল হ'য়ে যাচ্ছো, বুলবুল? তোমার হয়েছে কী?' নিশ্বাস ফেলে বললো, 'তাহ'লে আমার এই কথাটা রাখবে না

তুমি ?' আমি আর জবাব দিলাম না, বুলবুলও কথা বললো না, চুপচাপ কাটলো অনেকক্ষণ। বৃথা তর্ক ; যা-কিছু আমার কাছে জোন্সের ভালোত্বের প্রমাণ সেগুলোই তাকে অপরাধী করেছে বুলবুলের চোখে। জোন্স সাহিত্য-প্রেমিক, ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করছে, এটা বুলবুলের মতে তার 'মুখোশ'। সে যে স্বচ্ছন্দে সহজভাবে চলাফেরা ক'রে বেড়ায়, বন্ধু খোঁজে বাঙালিদের মধ্যে—আর তাও এই বিখ্যাত ও কুখ্যাত ঢাকায়, যেখানে এক বছর আগে লোম্যান লোপাট হ'য়ে গিয়েছিলো, ষণ্ডামার্কা হডসনও নিস্তার পায়নি—এটা, বুলবুলের ভাষায়, তার 'সবচেয়ে কুটিল চালাকি'—অমনি ক'রেই সে ধাপ্পা দিচ্ছে আমার মতো, অনাদিবাবুর মতো ভালো মানুষদের। সে নাকি দেখাতে চাচ্ছে সে অন্য ইংরেজদের মতো নয়—বডিগার্ড নিয়ে পথে বেরোয় না, একজন 'ভারত-বন্ধু'র ভেক ধ'রে নিজের কাজ হাসিল ক'রে নেবে, এই তার আসল মৎলব।—কিন্তু সত্যি কি আমাকেও সন্দেহ করে বুলবুল ? না—তা অসম্ভব, সে যা কিছু বলছে সবই যেন শেখানো কথা, বানানো কথা—প্রাণপণে সে আঁকড়ে আছে এই কথাগুলোকে যেন এ-ই তার জীবনের সর্বস্ব। 'বুলবুল,' আমি হঠাৎ অন্য একটা যুক্তি খুঁজে পেলাম, 'তুমি বলছো জোন্সের কারসাজিতে ঢাকার ছেলেরা সব ধরা পড়ছে। কিন্তু তুমি যে এখনো জেলের বাইরে আছো তাতেই কি প্রমাণ হয় না যে জোন্স নির্দোষ ?' একটু চুপ ক'রে থেকে বুলবুল খুব নিচু গলায় বললো, 'আর বেশিদিন বাইরে থাকবো না। সেইজন্যেই, তোমার চোখের বাইরে চ'লে যাবার আগে, এই কথাগুলো তোমাকে বলতে এলাম। রণজিৎ, তুমি মিতুকে এত ভালোবাসো, আর তোমার দেশের এই মানুষগুলো, যারা ইংরেজের বুটের তলায় গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে, তাদের কি একটুও ভালোবাসতে পারো না ?' আমি জ্ব'লে উঠে বললাম, 'আর যা-ই করো, মিতুকে টেনে এনো না এর মধ্যে !' 'কী ! আমার মুখে মিতুর নামও তোমার সহ্য হয় না ?' আমি আর্তভাবে ব'লে উঠলাম, 'বুলবুল, তোমার সঙ্গে কিছুই মেলে না আমার, তুমি আমাকে রেহাই দাও।' 'রেহাই ? মানে—আমাকে আসতে বারণ করছো ?' আমি কঠিন হ'য়ে বললাম, 'যদি দেখা হ'লে শুধু ঝগড়া বেধে যায়, তাহ'লে তো দূরে-দূরে থাকাই ভালো।' 'ও ! এই তোমার মনের কথা ?' নিশ্বাস ছাড়লো বুলবুল। 'বেশ, তা-ই হবে।' স্তব্ধতা নামলো আমবাগানে (আমরা প্রায় অচেতনভাবেই অভ্যস্ত স্থানটিতে চ'লে এসেছিলাম)

—পাশাপাশি, কেউ কারো দিকে না-তাকিয়ে, রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আর একটিও কথা বললাম না কেউ, আমার বাড়ির মোড়ে এসে আমি বুলবুলের কাছে বিদায় নেবার জন্য দাঁড়ালাম না।

তারপর—আধ ঘণ্টার মধ্যে—আমি বকুল-ভিলায়। লগ্ন আমার অনুকূল ছিলো; মিতুকে পেলাম দোতলার বারান্দায় তার মা-বাবার সঙ্গে, কাছাকাছি আর-কেউ নেই। আমি দেরি করলাম না, আমার সব দ্বিধা ঝ'রে প'ড়ে গেলো, সেই বহুজল্পিত কয়েকটি শব্দ খুব সহজে বের ক'রে দিলাম মুখ দিয়ে: 'আমি মিতুকে বিয়ে করতে চাই।' ধরা দিলাম সেই বন্ধনে যা আমার মুক্তি, যা আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না কোনোদিন। আমার মন শান্ত হ'লো; সে-রাত্রে অঘোরে ঘুমোলাম।

১৫

আপনার হাতের কাছে ঐ বোতামটা টিপবেন একবার?—ঐ যে, আপনার বাঁ দিকে। থ্যাঙ্কস। সন্ধে হ'য়ে এলো—আমার হুইস্কি-সন্ধ্যা। ব্যেরা, ড্রিঙ্কস। আপনার? কিছু না? না, না, তা কী ক'রে হয়, একটু কিছু নিন, এক ফোঁটা মিষ্টি শেরি অন্তত।...চীয়র্স। আঃ, গলাটা ভিজিয়ে বেশ লাগছে। আসুন তাহ'লে এই সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনা জানাই, মদের গ্রাশ নিশেনের মতো তুলে ধ'রে, নির্ভয়ে। রোজ এই সন্ধেবেলাটাকে আপনার কি মনে হয় না একটা জন্মান্তরের মতো? দিন থেকে রাত্রি, আবার রাত্রি থেকে দিন—কী বিরাট এই বদলগুলো, অথচ কী সহজে মেনে নেয় লোকেরা, হনুমানের মতো এক লাফে সমুদ্রলঙ্ঘন ক'রেও ক্লান্ত হয় না। কিন্তু আমার মনে হয় বড্ড খাটুনি, যেন অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক চেষ্টা ক'রে তবে পেরোতে পারি এক-একটা সন্ধিক্ষণ, পারি উঠে আসতে রাত্রি থেকে দিনে, তলিয়ে যেতে দিন থেকে রাত্রিতে। শেষরাত্রে ঘুম পায় আমার, কিন্তু ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও টের পাই যে ঘুমুচ্ছি, টের পাই ভোর হ'লো, গায়ত্রী উঠে গেলো ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে, আমি পাশ ফিরি, আর হঠাৎ আমাকে অতল ঘুম টেনে নেয়, কিন্তু যতক্ষণ ঘুমোই তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে জেগে উঠতে। মনে হয় যেন সাঁতার কাটছি, ডুবে যাচ্ছি, মাথা তুলে নিশ্বাস নিচ্ছি মাঝে-মাঝে। চোখ মেলে বুঝতে পারি না কোথায় আছি, যে-সব আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখছিলুম সেগুলি যেন আঁশের মতো জড়িয়ে থাকে চোখে; কখনো মনে হয় বক্সিবাজারের বাড়িতে শুয়ে আছি (পাশের ঘরে কাজল তাও মনে পড়ে), কখনো আথেন্সের জর্জ দি ফিফ্‌থ্ হোটেলে আধো-ঘুমে মিতুর চুলের গন্ধ, জানলার বাইরে পার্থেনন, মনে পড়ে, কিন্তু চোখ মেলে দেখি যাকে মিতু ভেবেছিলাম সে নেলি। কখনো শুয়ে-শুয়ে ভাবি, এটা কান্, আমি দু-দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি, আমার এখনই ভূমধ্যসাগরের নীলিমার সঙ্গে চোখাচোখি করা উচিত। না—সকাল নয়, গভীর, গভীর রাত্রি, কেউ কোথাও জেগে নেই,

আমার মাথার মধ্যে সমুদ্রের তোলপাড়, অন্ধকারে তারার মতো মিতুর চোখ, ফেনায় ভেজা জলকন্যার মতো কাজলের শরীর। কিন্তু ঐ টুংটাং আওয়াজটা কিসের? জব্বলপুর, নেলির পিয়ানো, আমার কি কোর্টে যাবার সময় হ'লো, ঘড়িটায় কি অনন্তকাল ধ'রে আটটা বাজবে?—এমনি লুকোচুরি খেলে এই ঘরটা সকালবেলায়, আমার মনে হয় আমার জীবনটা যেন হাজার জায়গায় টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, সেগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে জোড়া দিতে চাচ্ছে এই জেগে ওঠার মুহূর্ত—বড়ো পরিশ্রম—আমি ক্লান্ত—নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পাবার চেষ্টায় আমি যেন নতুন ক'রে খানখান হ'য়ে যাচ্ছি। কী এসে যায় আর যদি না জাগি, আমার ঘুমের এখনো যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাইতে গুটিসুটি মুড়ি দিয়ে যদি চ'লে যাই এক অন্ধকার থেকে আর-এক অন্ধকারে? কিন্তু না—যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ সময় থেকে নিষ্কৃতি নেই; আমাকে কফি খেতে হয়, বাথরুমে যেতে হয়, দাড়ি না-কামালেও চলে না, তারিপর ঐ পুবের বারান্দায় ব'সে মনে হয় আলো ভালো, আমি আলো চাই, প্রাঞ্জল দিন আমাকে ফিরিয়ে দেয় আমার বেঁচে থাকার সাহস; আমি কে, কোথায় আছি, আজকের তারিখ কত, ক-টা বাজলো, এ-সব বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। আর সেইজন্যেই সন্ধেবেলা আর-এক দফা যুদ্ধ চালাতে হয় আমাকে; অনেকগুলো ঘণ্টা আলোয় কাটাবার পরে অচেনা মনে হয় অন্ধকারকে; জীবনের যে-টুকরোগুলোকে গুছিয়ে নিয়েছিলাম সেগুলি আবার আলগা হ'য়ে যায়, যেন গ'লে যায় রাত্রির জোয়ারে—চিরকালের মতো নয় (তাহ'লে কোনো ভাবনাই ছিলো না), মাত্র বারো ঘণ্টার জন্য। তাই আমার ঘুমিয়ে পড়া নিয়ে এত সতর্কতা, আমি জানি একেবারে হারিয়ে গেলে চলবে না, কোনো-একটা কুটো আঁকড়ে থাকতে হবে এমনকি ঘুমের মধ্যেও, যাতে জেগে উঠে, হাৎড়ে-হাৎড়ে, সেই কুটো থেকেই আবার তৈরি ক'রে নিতে পারি এই বাড়ি, উটকামণ্ড শহর, এই জগৎ—আর আমার আমিত্বকে। বলুন তো, জীবনটা এমন কী মনোরম যার জন্য এত খাটুনি খাটা যায়?

কিন্তু না—এ-সব পরিশ্রমের কোনো পুরস্কার নেই তাও নয়। ঐ দুটি সময় আমাদের জীবনে, ঘুমিয়ে পড়া আর জেগে ওঠার আগেকার মুহূর্ত, যখন আমরা প্রায় অলৌকিক ক্ষমতা পাই, প্রায় হাতের মুঠোয় ধরতে পারি অতীতকে—জলবিন্দুর মতো ভঙ্গুর সেই মুহূর্ত, আমরা যার নাম দিয়েছি স্বপ্ন,

কিন্তু আসলে যা আমাদেরই স্বরচিত—কোনো আহ্বান, কোনো উত্তর, কোনো সংলাপ, কোনো পুনরভিনয়। আমাদের হৃদয় স্বচ্ছ চোখে তাকিয়ে থাকে তখন—সব বোঝে, সব ক্ষমা করে। তখন ফিরে আসে তারই একটি সোনালি দিন যখন আমি নিশ্চিত জানি মিতুর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তার মা-বাবা শিগগিরই আসবেন আমার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে—আমি সুখী, কিন্তু অধৈর্যহীন, শান্ত, দীর্ঘ, সুদীর্ঘ বছর ভ'রে আমি অপেক্ষা করতে পারি মিতুর জন্য, আমার জীবনের লক্ষ্য আমি পেয়ে গিয়েছি, আর আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে হবে না। বাতাস আমার বন্ধু, রোদ আর নক্ষত্র আমার সহায়, আমি নির্ভয়, আমি নিরাপদ। বাড়িতেও একটি বন্ধু আছে আমার, শুধু তাকেই আমি বলেছি সেই কথাটি—না-ব'লে পারিনি—যাতে আমি ভরপুর হ'য়ে আছি আজকাল—এই হেমন্তের সকালে আকাশ যেমন আলোয় ভ'রে যায়। 'কাজল-মামি, অন্য কাউকে বোলো না কিন্তু, আমি মিতুকে…' শোনামাত্র এক আশ্চর্য সুখ ছড়িয়ে পড়লো কাজলের মুখে, তার চোখ আরো উজ্জ্বল আর গাল আরো লাল দেখালো; আমার গালে হাত বুলিয়ে, চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে, তবু যেন তৃপ্তি হ'লো না তার, দু-হাতে আমার দু-হাত ধ'রে চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো একটুক্ষণ। সে-মুহূর্তে এই স্বার্থপর যুবকটিও বুঝেছিলো কাজল তাকে কত ভালোবাসে; বুঝেছিলো, নিজে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হ'য়েও অন্যের সুখে এতদূর পর্যন্ত সুখী হ'তে যে পারে, সে-মানুষ কত ভালো, কত নির্মল; হয়তো সেও তখন কাজলকে ভালোবেসেছিলো। সেই ক-টি দিন, সেই ক-টি সোনালি দিন আমার জীবনের! 'কাজল বোকা, কাজলের হালচাল নেই, ব্যক্তিত্ব নেই'—এ-রকম কথাই বাড়িতে শুনে এসেছি বরাবর; আমিও, বকুল-ভিলার সেই সন্ধ্যার উন্মোচনের পরেও, দাঙ্গার মধ্যে বাধ্য হ'য়ে তার কিছুটা কাছে আসার পরেও—তার বিষয়ে অবজ্ঞা-আর-করুণা-মেশানো মনোভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি; তাকে আর ফটিক-মামাকে ঘিরে আমার যে-একটি স্বপ্ন ছিলো, তাও স্বার্থপর কারণে। কিন্তু সেই সময়ে কাজল আমার কাছে তার নিজেরই জন্য মূল্যবান হ'য়ে উঠেছে, একটি নতুন সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে তার সঙ্গে আমার, সে আমার সুখ অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে, হ'য়ে উঠেছে আমার অন্তরঙ্গ। রোজ রাত্রে, বকুল-ভিলা থেকে ফিরে, খাওয়া-দাওয়ার পরে মা-বাবা যখন শুয়ে পড়েন, তখন কাজলের সঙ্গে কিছুক্ষণ

গালগল্প করি আমি—হালকা, ছেলেমানুষি কথা, আমার সুখের উচ্ছ্বাস, যা কাজল তার নিজের ক'রে নিয়েছে, যার মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে আমার মনে-মনে ছোঁয়াছুঁয়ি চলে, কোনো তুচ্ছ কথায়, কখনো বা একসঙ্গে শব্দ ক'রে হেসে ওঠায়। আমি ভুলে গিয়েছি কাজলের পক্ষে এগুলো তার দুঃখী জীবনের ইচ্ছাপূরণ মাত্র, যেন প্রক্সিতে প্রেমের সুখ ভোগ করা, হয়তো কাজলও সে-কথা ভুলে গিয়েছে, এমনভাবে সে মিশিয়ে দিয়েছে নিজেকে আমার জীবনের এই সুন্দর মুহূর্তটির সঙ্গে, মিতুর আর আমার যৌথ ভবিষ্যতের সঙ্গে। তার সেই আধো-ঘুমন্ত শিথিল চেহারা এখন আর মনে পড়ে না আমার, সে যেন পেয়েছে এক নতুন সত্তা, যেন এইমাত্র পুরোপুরি জেগে উঠলো তার অন্তরের নারী—যাকে এর আগে চকিতে দেখেছিলাম একবার মাত্র, সেই বকুল-ভিলার সন্ধ্যায়, প্রথমে সূর্যাস্তের, তারপর ইলেকট্রিক আলোয়। কিন্তু তখন সে ছিলো অন্য তিনটি নারীর সঙ্গে মিলে-মিশে, তার স্বাতন্ত্র্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি—কিন্তু আজ সে অন্য কারো সংলগ্ন আর নেই ; তার সঙ্গে আমার একটি নিভৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে যে আমি তাকে মনে-মনে আমার ভবিষ্যতের অংশিদার না-ক'রে পারছি না। সেই হেশাম রোডের গোলাপি রঙের বাড়িটাকে নিয়ে এখনো খেলা করে আমার কল্পনা, কিন্তু সেখানকার বাসিন্দা এখন আমি আর মিতু—আর আমার পূর্বতন ভূমিকাটি এখন আমি দিয়েছি কাজলকে, সে আসে মাঝে-মাঝে আমাদের কাছে বেড়াতে, হয় আমাদের নর্মসখী, আনন্দের সঙ্গিনী। সেই শহরেই যে ফটিক-মামা বাস করেন, সেই ভবানীপুরেই, কাজল যে ফটিক-মামার স্ত্রী, আপাতত আমার মা-বাবার অধীন, এ-সব কিছুই মনে পড়ে না আমার, তার সব সামাজিক পরিবেশ থেকে আমি কাজলকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছি—তার স্নেহে, তার মনোযোগে যেন আমারই অধিকার সকলের আগে—আমার, আর মিতুর। যেমন সূর্যোদয়ের সময়, শুধু দিগন্ত নয়, অনেকখানি পুবের আকাশ লাল হ'য়ে যায়, এমনকি, বায়ুমণ্ডলের কোনো চাতুরীর ফলে, পশ্চিমেও রঙিন আভা ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি মিতুর জন্য আমার ভালোবাসা মিতুকে পেরিয়ে কাজল পর্যন্ত পৌঁচেছিলো সেই সময় ; আর কাজলও, তার দিক থেকে, মিতুর মাড়ানো পথ বেয়ে-বেয়ে, আমার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছিলো। তাই আমি এখনো মাঝে-মাঝে দেখতে পাই কাজলকে, আমার আধো-ঘুমের চঞ্চল জলের তলায়,

কোনো সিক্ত কোমল জলকন্যার মতো, একটি রুপোলি রেখা যেন অন্ধকারকে ফুটো ক'রে দিয়ে, তক্ষুনি—কোনো জাল-ছিঁড়ে-পালিয়ে-যাওয়া বিদ্যুৎগতি মাছের মতো—আবার ডুবে যায় আরো অন্ধকারে, দূরতম, গূঢ়তম পাতালে। আবার মাঝে-মাঝে সেই আলোর মধ্যিখানে কালো একটি বিন্দু ফুটে ওঠে, কালো বড়ো হয় ক্রমশ, ছড়িয়ে পড়ে; আমি দেখতে পাই বুলবুলকে, আমাদের বাড়ির বাইরে, রাস্তায়। 'আমি আবার এলাম—আসতেই হ'লো।' আমি কিছু না-ব'লে তাকালাম তার দিকে, মুহূর্তকাল দেরি ক'রে সে বললো, 'বিয়ে করছো? মিতুকে?' আমার মাথা নিচু হ'লো, হঠাৎ যেন লজ্জা পেলাম। 'ভাবছো আমি কী ক'রে জানলাম? তোমাকে দেখেই বুঝেছি—তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। আর তাছাড়া—এটাই তো আশা করা যাচ্ছিলো কিছুদিন ধ'রে, আমিই তো প্রথম বলেছিলাম মিতুর সঙ্গে ঠিক মিলবে তোমার।' আমি বললাম, 'তোমার কী খবর?' 'খবর?' ঠোঁটের কোণে হেসে বললো, 'একটু বেড়াবে আমার সঙ্গে? কয়েক মিনিট?' আমি ভদ্রতা ক'রে বললাম, 'চলো।'

হেমন্তের রোগা-হ'য়ে-যাওয়া সন্ধ্যা ছিলো সেদিন, পাৎলা শিশিরে ভেজা ঘাস ছিলো পায়ের তলায়, ছিলো আমবাগানে নিথর নির্জনতা, আর গাছগুলির ফাঁকে-ফাঁকে ফালি-ফালি আকাশ—হলদে, নীল, মলিন। বুলবুল আলগোছে কথা আরম্ভ করলো, 'কার্জন হল-এ আর্থার জোন্সের বক্তৃতা হচ্ছে কাল, তুমি যাবে না?' 'বক্তৃতা শুনতে ভালো লাগে না আমার।' 'আমি যাবো, ভারতীয় সভ্যতা বিষয়ে জোন্স কী বলে শুনতে চাই। তুমিও এসো না—ভারি একটা তামাশা হবে কাল।' 'তামাশা কেন?' 'জোন্স যদি আজ ভারতবর্ষের স্তবগান করে সেটা তামাশা ছাড়া আর কী?' আমি বললাম, 'শোনো বুলবুল, আবার যদি ও-সব বাজে কথা তোলো তাহ'লে আমি আর এক দণ্ড দাঁড়াবো না এখানে।' একটু সময় নীরব রইলো বুলবুল, মাথা নিচু ক'রে; আমি দু-একটা পাখির ডাক শুনলাম। তারপর দ্রুত ভঙ্গিতে মুখ তুলে খড়খড়ে গলায় ব'লে উঠলো, 'না—আর কথা নয়, এবার কাজ! দেখবে একটা জিনিশ?' হঠাৎ তার ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বুলবুল বের করলো একটা—একটা—আমি সারা শরীরে কেঁপে উঠলাম, আমার চোখ ঝাপসা হ'লো, যখন দেখলাম সে তার ছোট্ট রোগা হাতের মুঠোয় একটা পিস্তল ধ'রে দাঁড়িয়ে

আছে। ফিশফিশ ক'রে বললাম, 'বুলবুল, খেলনা দিয়ে ভয় দেখাচ্ছো আমাকে?' 'বীরের খেলনা, জর্মানিতে প্রস্তুত। দেখছো? এটা জোন্সের জন্য।' আমার গলা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো, 'বুলবুল! কী বলছো তুমি!' 'চুপ! চেঁচিয়ো না!' আমার মুখে হাত চাপা দিলো সে, আমি তার কব্জি মুচড়ে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিলাম। বুলবুল ব'লে উঠলো, 'সাবধান! কার্তুজ পোরা আছে।' কিন্তু আমি কথা বলার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলেছি, আমার গলা দিয়ে যেন নিজেরই অজান্তে শুধু একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে, 'না! না! না! না! না! না! না, বুলবুল! জোন্স না! তুমি না!' হাসি ছড়িয়ে পড়লো বুলবুলের মুখে, বিজয়ের হাসি—উদ্ধত, উজ্জ্বল। 'এখন তো বুঝতে পারছো কেন আমি আবার এসেছি—তুমি বারণ করা সত্ত্বেও। এসেছি বিদায় নিতে। জোন্স ভালো হ'তে পারে, সাধু হ'তে পারে, কিন্তু সে ইংরেজ, ভারতবর্ষকে যারা শ্মশান ক'রে দিচ্ছে তাদেরই প্রতিনিধি, সেইজন্য—শুধু সেইজন্যই এটা দরকার। ওদের আর-একবার বুঝিয়ে দেয়া যে আমরা ওদের চাই না—ওরা যে-ভাষা বোঝে সেই ভাষাতেই। প্রতিমা দেবতা নয় কিন্তু আমরা প্রতিমা পুজো করি—এও তেমনি। ছবি মানুষ নয়, কিন্তু ছবিতেও মাইকেল ও' ডায়ারকে দেখলে আমাদের মধ্যে কার না ইচ্ছে করে থুতু ছিটোতে, লাথি মারতে? এও তেমনি। আর জোন্স যদি সত্যি নিরপরাধ হয় সেটা বরং আরো ভালো, তাহ'লে বোঝানো হবে ওরা ভালো হ'লেও ভুলবো না আমরা, আমরা দয়া চাই না, উপকার চাই না, ওদের তাড়াতে চাই, তাড়াতে চাই!' পাথরে ছুরি শান দেবার মতো আওয়াজ বেরোলো বুলবুলের গলা দিয়ে, কোনো আহত জন্তুর মতো তার নিশ্বাস। ঝাঁকে-ঝাঁকে কথা উড়ে এসে পোকার মতো আমার মগজের মধ্যে আটকে রইলো, মুখে শব্দ নেই—স্তব্ধ—সমস্ত শরীর-মন দিয়ে অনুভব করছি এমন এক উত্তেজনা যা আমার কল্পনাতেও ছিলো না কখনো, আমার রক্তে যেন আগুন, লোমকূপে জ্বালা, আমার চোখ আটকে আছে পিস্তলটাতে, যা আমি হাতে ধ'রে আছি—ঠাণ্ডা ইস্পাত, কিন্তু বুলবুলের বুকের তাপে এখনো উষ্ণ, ভেতরেও আগুন পোরা, ঐ যুগ্ম তাপ ছড়িয়ে পড়ছে আমার শিরায়, কোন-এক মায়াবী স্পর্শে আমি জগৎসংসার ভুলে যাচ্ছি। ছোঁয়া দূরে থাক, পিস্তল আমি চোখেও দেখিনি কোনদিন—সিনেমায় ছাড়া—

খুব সম্ভব আমার সাত পুরুষে কেউ ছাখেনি—সেইটে আমার মুঠোর মধ্যে এখন, আশ্চর্য যন্ত্র, কী সুন্দর, কী নিটোল গড়ন, সুন্দর চোখা নল বসানো যার মধ্য দিয়ে মারাত্মক বেগে বেরিয়ে আসে বীরের বীর্য, অবরুদ্ধ তেজ, আক্রমণ, লুণ্ঠন, জয়। আমি যেন মাতাল হ'য়ে উঠলাম এ-কথা ভেবে যে অতখানি শক্তিকে ভ'রে দেয়া যায় ঐটুকু একটা জিনিশের মধ্যে, যা একটি ছোটোখাটো রোগা মেয়ে ব্লাউজের তলায় লুকিয়ে ব'য়ে বেড়াতে পারে, আর যা দিয়ে নিমেষের মধ্যে, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে, একটা পুরোপুরি জীবন্ত মানুষকে পুরোপুরি মেরে ফেলা যায়। আশ্চর্য যে, আমাদের এই জগতে, যেখানে ভালোবাসা এত দুর্লভ, এত কষ্টসাধ্য, এত রকম জটিলতার কাঁটায় ঘেরা, সেখানে হিংসা এমন অসাধারণ সরল, আর এত সহজ সেই হিংসার চরিতার্থতা। আমার যে-চোখ পিস্তল দেখে ধাঁধিয়ে গিয়েছে, তা দিয়ে বুলবুলের দিকে তাকালাম একবার ; আধো-অন্ধকারে তার চোখের মণি জলজল ক'রে উঠলো। সে-মুহূর্তে আমি অন্য রকম দেখলাম তাকে, আরো লম্বা, তার মুখে এক অদ্ভুত, দুর্বার আকর্ষণ, মাটিতে পা রেখে তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি এমন যেন তারই হাতে কর্তৃত্ব, দণ্ডনীতি, বিচারের বিধান।

'তুমি কাঁপছো, রণজিৎ, ওটা আমাকে দিয়ে দাও।' আমি এগিয়ে গেলাম তার দিকে, খুব কাছে দাঁড়িয়ে নিশ্বাসের স্বরে বললাম, 'সত্যি ?...সত্যি পারবে তুমি ?' 'তোমাকে কাল আসতে বলছি তো সেইজন্যেই। দেখবে।' নিজের অজান্তেই তার ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে জিগেস করলাম, 'আর-কেউ নেই ?' 'তাদের ধ'রে নিয়ে গেছে, রণজিৎ, কেউ-কেউ ফেরার। তাছাড়া—আমি চাই এটা—এটা আমারই কাজ—আমাকেই করতে হবে। এতেই সার্থকতা আমার জীবনের। আমি কারো স্ত্রী হবো না কোনোদিন, কারো মা হবো না, অন্য কিছুই হবে না আমাকে দিয়ে—আমার স্বাদ স্বপ্ন আশা ধ্যান যা-ই বলো তা শুধু এই—একটি ইংরেজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলা : "এই নাও তোমার ন্যায্য পাওনা চুকিয়ে দিচ্ছি।" মুখের কথায় নয়, তার বুকটাকে ফুটো ক'রে দিয়ে।' 'যদি না পারো ? যদি ফসকে যায় ?' 'তবু—চেষ্টা তো করা যাক ; তা-ই বা কম কী ? তবু তো জানানো হবে কী চেয়েছিলাম।' 'আর যদি—যদি—' 'আন্দামান ? ফাঁসি ? ও-সব তো বাঁধা গৎ। কী বা মূল্য আমার জীবনের যার জন্য তা পুষে-পুষে রাখতেই হবে।' ঝাপসা হাসলো বুলবুল, আমি

মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম। তার কথাগুলো যেন আশ্চর্য মধুর কোনো মর্ফিয়া, আমি অবশ হ'য়ে যাচ্ছি, আমার যেন কিছুই বলার নেই এর উত্তরে।— বুদ্ধির, নীতির, বিবেকের যা-কিছু অতি স্পষ্ট পরামর্শ, সব মনে হ'লো অর্থহীন, অবান্তর; রোদ ওঠার পরে লণ্ঠনের মতো আমার সব যুক্তি এখন ফ্যাকাশে। আস্তে আমার হাত থেকে পিস্তলটি নিয়ে নিলো বুলবুল, ব্লাউজের মধ্যে ফিরিয়ে রেখে আঁটো ক'রে আঁচল গুঁজে দিলো। 'আমার যা বলার ছিলো বললাম। এবার তোমার ছুটি। কেন তোমাকে বললাম জানি না—কিন্তু ইচ্ছে করলো, ভীষণ ইচ্ছে করলো।—রণজিৎ, চলি তাহ'লে?' আমবাগান থেকে বেরিয়ে এসে বললো, 'তুমি আর এসো না আমার সঙ্গে। আমি চলি।' একটু সময় তাকিয়ে রইলো আমার দিকে; আমার মনে হ'লো তার দৃষ্টি আমার রক্তমজ্জা শুষে নিচ্ছে। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো, আমি তাকে বড়ো রাস্তার মোড়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখলাম।

কিন্তু সে অদৃশ্য হওয়ামাত্র যেন মূর্ছা থেকে জেগে উঠলাম আমি। এ আমি কী করলাম, তাকে চ'লে যেতে দিলাম? পারতাম না কি আমি তাকে ফেরাতে, এখনো কি পারি না? আমার বুক ফেটে একটা নিঃশব্দ চীৎকার বেরিয়ে আসতে চাইলো, কুলকুল ক'রে ঘাম নামলো আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। না—এ আমি ঘটতে দেবো না, এ অসম্ভব! আমি বাড়ি এসে সাইকেল নিলাম, পুরো দমে চালিয়ে প্রথমে গেলাম কায়েৎটুলিতে বুলবুলের বাড়িতে— না, সে ফেরেনি। তারপর রাজার দেউড়িতে বিভাবতীর বাড়িতে। বিভাবতী কলকাতায় গেছেন, বুলবুল সারাদিনের মধ্যে সেখানে আসেনি। সে কি কোনো গোপন জায়গায় কাটাবে আজ রাত্রিটা, কালকেও সন্ধে পর্যন্ত সারাদিন—আমি কি আর তাকে খুঁজে পাবো না? তাহ'লে আমি কী করি এখন? থানায় খবর দিয়ে আসবো?—ছি! জোন্সের কাছে যাবো?— তাও অসম্ভব। আমাকে বাঁচাতে হবে—শুধু জোন্সকে নয়, বুলবুলকেও। কী তার উপায় তা কে আমাকে ব'লে দেবে? মুহূর্তে আমার সব-কিছু কী-রকম ওলোটপালট ক'রে দিয়ে গেলো বুলবুল। এটা কোন জায়গা? ঐ তো কলেজিয়েট স্কুলের মোটা-মোটা থামগুলো, সামনে ঘড়ি-বসানো হলদে রঙের গির্জে—ঐ ঘড়ির পড়ন্ত-রোদে-জ্বলা মুখের দিকে, স্কুলে যখন পড়তাম, বিকেলের ক্লাশে ব'সে-ব'সে কতবার গলা বাড়িয়ে তাকিয়েছি চারটে কখন

বাজবে সেই আশায়—কেন আর ছেলেমানুষ নেই আমি, কেন বড়ো হলাম, কেন এই যন্ত্রণা আজ, কেন এই বিরাট দায়িত্ব বুলবুল চাপিয়ে গেলো আমার ওপর? আমি অন্ধের মতো সাইকেল চালালাম খানিকক্ষণ, এলোপাথাড়ি দিগবাজার বাংলাবাজার সদরঘাট ঘুরে আবার সামনে দেখলাম কলেজিয়েট স্কুল, ভিক্টরিয়া পার্ক—নেমে পড়লাম সাইকেল থেকে, পার্কের বেড়ার ওপর দিয়ে তুলে আনলাম সাইকেলটা, ঘাসের ওপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লাম। ভেজা ঘাস, টুপটাপ ঝ'রে পড়ছে শিশির, আর আকাশে—হঠাৎ চমকে উঠলাম আমি—চাঁদ, ডিমের মতো, হালকা-সোনালি, শান্ত। সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বক ক'রে উঠলো আমার বুকের মধ্যে, যাকে এতক্ষণ একেবারে ভুলে ছিলাম, সেই মিতুকে মনে পড়লো।

রাত বেশ এগিয়ে গেছে তখন, লার্মিনি স্ট্রিট নির্জন। পাৎলা কুয়াশায় মেশা জ্যোছনা ছড়ানো চারদিকে, ঠাণ্ডা চাঁদ, ম্লান আকাশ, গাছগুলি চাঁদের আলোয় অবয়ব হারিয়ে কালো ও ঝাপসা—সব শান্ত ও সুন্দর, বিষাদে আর স্তব্ধতায় ভরা। এ-রকম জ্যোছনা দেখলে নিজের মধ্যে খুব গভীরভাবে ডুবে যেতে ইচ্ছে করে আমার, কিন্তু আজ যেন আমাকে নিজের মধ্য থেকে বের ক'রে নিয়ে আসা হয়েছে, আমি যেন আমার নিজেরই কাছে অনুপস্থিত। পার্কের ঘাসে শুয়ে চাঁদ দেখে মুহূর্তের জন্য যে-সান্ত্বনা পেয়েছিলাম, তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে এই জগৎসংসার—আমি যার কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না; চাঁদের আলো যেন আমার পক্ষে এখন অবান্তর, আমার বরং অবাক লাগছে যে আজ রাত্রে, যখন মানুষের জগতে একটি ভীষণ ঘটনা তৈরি হচ্ছে, তখনও চাঁদ আর কুয়াশা এমন নির্বিকার, এমন গতানুগতিকভাবে সুন্দর। আমি ব্যাকুলভাবে ছুটে গেলাম না বকুল-ভিলার দিকে, বরং সাইকেলের বেগ কমিয়ে দিলাম, যেন মিতুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর নিটোল নেই, তার কাছে যাবার আমি যোগ্য কিনা সে-বিষয়ে আমি নিজেই সন্দিহান। দু-দিকে বাড়ি, ঘরে-ঘরে নিশ্চিন্ত লোকজন, কেউ কিছু জানে না—কিন্তু আমি—আমাকেই জানতে হ'লো কেন, কেন এই ভীষণ ভার আমারই ওপর নেমে এলো, কেন এই অসহায় কষ্টের মধ্যে আমাকে ফেলে গেলো বুলবুল? সত্যি কি আমার সুখী হবার অধিকার আছে, যখন আমারই জীবনের প্রান্ত ঘিরে-ঘিরে জ'মে উঠতে পারে এত বড়ো বিরাট বিষাক্ত বেদনা,

ফেটে যেতে পারে অমানুষিক বিস্ফোরণে? প্রাণ—দু-জন মানুষের প্রাণ, আর এমন দু-জন, যারা আমার কাছে অতি বাস্তব, জাজ্বল্যমান—সেই প্রাণ আজ বিপন্ন, এ আমি কেমন ক'রে ভুলে থাকবো? হত্যা—ভয়াবহ শব্দ, অকথ্য, অনুচ্চারণীয়! আর তাতে উদ্যত হয়েছে—অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য—কোনো গুণ্ডা নয়, ডাকাত নয়, লোভে বা আক্রোশে উন্মত্ত কোনো মানুষও নয়, একটি মেয়ে, তরুণী, মিতুর বন্ধু, নিঃস্বার্থ কর্মিষ্ঠ দেশপ্রেমিক বুলবুল। অথচ এমনও নয় যে তাকে দোষী ব'লে শাব্যস্ত ক'রে নিজের দায়িত্ব এড়ানো যায়—সে তো তার নিজের জীবনও বিকিয়ে দিচ্ছে; চরম পাপ, চরম ত্যাগ—এই দুটোকে নিজের মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে সে সমালোচনার উর্ধ্বে উঠে গেছে। ন্যায়-অন্যায়ের কোনো কথাই নেই এখানে;—আমি কষ্ট পাচ্ছি, বুলবুলের জন্য, জোন্সের জন্য সমান কষ্ট—আমি যদি তাদের বাঁচাতে না পারি তাহ'লে কোন মুখে আবার দাঁড়াবো মিতুর কাছে, ভালোবাসবো, বিয়ে করবো?

বকুল-ভিলায় বসার ঘরে ঢুকেই মা-মেয়েকে দেখলাম। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছে দু-জনে, মুখ থমথমে। আমাকে দেখামাত্র মিতুর মা ব'লে উঠলেন, 'একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে, রণজিৎ। ওঁর পিস্তলটি চুরি গেছে।' আমার গলা দিয়ে যেন বমি উঠে এলো কথাটা শুনে, অস্ফুটে বললাম, 'কী বললেন?' 'ওঁর শিকারের বন্দুক-টন্দুক অনেক আগেই বেচে দিয়েছিলেন, শুধু একটি জর্মান পিস্তল হাতছাড়া করেননি—ওঁর বাবার খুব শখের জিনিশ ছিলো ওটা, তাঁরই স্মৃতি হিশেবে রেখেছিলেন। আমি কতবার বলেছি দিনকাল ভালো না, ও-সব আপদ বিদেয় করো, অন্তত ট্রেজারিতে জমা দিয়ে দাও, কিন্তু—' মিতুর মা-র গলা ধ'রে এলো, কথা শেষ হ'লো না। আমি জিগেস করলাম, 'সত্যি চুরি হ'য়ে গেছে? কোথাও নেই বাড়িতে?' 'কোথাও নেই। থাকতো ওঁর শিয়রে লোহার সিন্দুকে, চাবি নিজের কাছে রাখতেন, কিন্তু উনি তো একটু ভুলো মানুষ, কখনো হয়তো অসাবধানে রেখেছিলেন—কী ক'রে হলো কে জানে।' 'উনি শেষ কবে দেখেছিলেন পিস্তলটা?' 'শেষ কবে…? তা তো ঠিক জানি না আমি—ও প'ড়েই থাকে সিন্দুকে মাসের পর মাস, হঠাৎ খেয়াল হ'লো তো একদিন খুলে পরিষ্কার করলেন—ঐটুকু তো সম্পর্ক।' 'শিগগির বের করেছিলেন কি—পরিষ্কার করতে?' 'হ্যাঁ, দিন দশেক আগে বের করেছিলেন বাবা,' জবাব দিলো মিতু। 'আজই ধরা পড়লো যে নেই?'

'আজই। এই খানিক আগে—সিন্দুক থেকে অন্য একটা জিনিশ বের করতে গিয়ে। উনি গেছেন থানায় রিপোর্ট করতে—ওঁকে নিয়েই না পুলিশে টানাটানি করে এখন।' 'মিতু, এক গ্লাশ জল দেবে?' ব'লে আমি তার পেছন-পেছন উঠে এলাম। ঢকঢক ক'রে জলের গ্লাশ খালি ক'রে বললাম, 'এসো এই সিঁড়িতে একটু বসি।' সেই বারান্দা—যেখানে আমার জীবনে প্রথম নারী-সত্তার উপলব্ধি। সেই বাগান, যার গাছপালার ফাঁক দিয়ে মিতুর মুখে সূর্যাস্তের আলো এসে পড়েছিলো। চাঁদের আলোয় এখন অচেনা দেখালো গাছগুলোকে, যেন অনাত্মীয়, মানুষের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, কুয়াশায় মোড়া কোমল রাত্রিটি যেন কোনো নাটকহীন, নায়কহীন মঞ্চের অবাস্তব দৃশ্যপট মাত্র। আর মিতু, আমার ভাবী স্ত্রী, যাকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি, যে আমার পাশে ব'সে আছে—তাকে মনে হচ্ছে দূরের কোনো মানুষ, যেহেতু তাকে বলতে পারছি না যা আমি জানি, বলতে পারছি না তার বাবার পিস্তলটি আমি দেখেছিলাম, ছুঁয়েছিলাম—মাত্র ঘণ্টা তিনেক আগে। সুখ, তুমি কি কখনো ফিরে আসবে আবার? সে কোন সোনালি দেশ, স্বপ্নের দেশ, যেখানে ভালোবাসা সহজ? মিতু বললো, 'আমার ভয় করছে, রঞ্জু। বাবাকে কিছু করবে না তো ওরা?' চেষ্টা ক'রে বললাম, 'কী আশ্চর্য! যাঁর জিনিশ চুরি গেছে, তাঁকে কিছু করবে কেন? শোনো—বুলবুল এসেছিলো নাকি আজ?' 'আমাদের এখানে? না তো। অনেকদিন দেখা নেই বুলবুলের।' 'অনেকদিন? ক-দিন?' 'তা আট-দশ দিন হবে। মাঝে একদিন এসেছিলো, আমরা কেউ বাড়ি ছিলাম না তখন।' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'ও।' 'কী বললে? তুমি কী ভাবছো বলো তো?' 'না, কিছু না। মিতু—' 'কী?' আমার মনের মধ্যে একটি সংকল্প গ'ড়ে উঠছিলো ধীরে-ধীরে, প্রথমে ঐ জোছনা-মাখা কুয়াশার মতো ঝাপসা, তারপর—যেমন কোনো নামহীন অস্বস্তি থেকে হঠাৎ একটি ছন্দে-বাঁধা সুন্দর পঙক্তি লাফিয়ে ওঠে কবির মনে, আর তখন তিনি জানতে পারেন যে একটি কবিতাকে তিনি 'পেয়ে গেছেন'—তেমনি আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমাকে এখন কী করতে হবে। আমি তাকালাম মিতুর দিকে, আমার বুকের মধ্যে চীৎকার উঠলো, 'মিতু, এসো আমরা অনেক দূরে কোথাও চ'লে যাই, এখানে বুলবুল আমাদের বাঁচতে দেবে না।' কিন্তু না—

কিছু বলার উপায় নেই—একটি ছাড়া সব রাস্তা বন্ধ—আমি বোধহয় দম আটকে ম'রে যাবো। মিতু বললো, 'তুমি যেন কী বলতে গিয়ে থেমে গেলে?' 'না—অমনি ডাকলাম তোমাকে, ডাকতে ভালো লাগলো।' আমি মিতুর একটু কাছে স'রে এলাম, তার চুলের সূক্ষ্ম সুবাস মুহূর্তের জন্য উড়ে এলো। আবার বললাম, 'মিতু! কী সুন্দর নাম, কী সুন্দর তুমি!' বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ হ'লো, আমরা বসার ঘরে এলাম। অনাদিবাবু ঘরে ঢোকামাত্র মা-মেয়ে একসঙ্গে ব'লে উঠলো, 'কী হ'লো?' 'কী আবার হবে। থানায় ডায়েরি ক'রে এলাম।' 'তারপর? কোনো হাঙ্গামা হবে না তো এ নিয়ে?' 'হাঙ্গামা হবে কেন? কে না চেনে আমাকে ঢাকায়? বন্দুকের লাইসেন্স আমাকে আর দেবে না অবশ্য—তা ভালোই, ও-সব পাপ আর পুষতে চাই না আমি। ছিলো একটা পুরোনো জিনিশ—গেলো।' মিতুর মা খুঁটে-খুঁটে জিগেস করলেন পুলিশের লোকের সঙ্গে কী কথাবার্তা হ'লো তাঁর, কিন্তু অনাদিবাবু হাত নেড়ে বললেন, 'থাক এ-সব কথা। এই যে রঞ্জু, কতক্ষণ? তোমরা অত গম্ভীর হ'য়ে আছো কেন সবাই? এবারে একদিন লোকজন ডাকতে হয় বাড়িতে, এখনই কাউকে কিছু বলা হবে না অবশ্য—' একবার মেয়ের দিকে, একবার আমার দিকে চোখ ফেললেন তিনি—'তবে উৎসব এখন থেকেই শুরু হ'তে পারে। জানিস মিতু, কানাই বসাকের চোদ্দ বছরের ছেলেটির নাকি আশ্চর্য তবলার হাত, তোর সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য তাকে ডাকবো একদিন।' মা-মেয়ের মন হালকা ক'রে দেবার চেষ্টা করলেন অনাদিবাবু, কিন্তু থেকে-থেকে একটি মেঘ ভেসে যেতে লাগলো তাঁর মুখের ওপর দিয়ে। আমি তাঁর লুকোনো উৎকণ্ঠা টের পেলাম; তিনি—গান্ধীভক্ত, অহিংসবাদী, পরোপকারী হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, তাঁরই পিস্তল দিয়ে কোনো হত্যাকাণ্ড সাধিত হ'তে পারে, এই আশঙ্কা তিনি কাটাতে পারছেন না। ঢাকায় আজকের দিনে পিস্তল চুরি হওয়ার আর তো কোনো অর্থ নেই। আমার দুরন্ত লোভ হ'লো তাঁকে আলাদা ডেকে নিয়ে একটা কথা বলি—কিন্তু না, তিনি, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের নিরুপমা, প্রিয়তমা কন্যা—এঁরা অন্তত শান্তিতে ঘুমোন আজ রাত্রিতে, সব জ্বালা আমার, সব কষ্ট আমার হোক। মুহূর্তের জন্য নিজেকে আমার মনে হ'লো দেবতার মতো শক্তিশালী—অন্যদের ভাগ্য আমার হাতে, অন্যদের সুখশান্তি জীবন মৃত্যুর আমি অধীশ্বর—অন্তত

কয়েক ঘণ্টার জন্য, আগামীকালের সন্ধ্যা পর্যন্ত। যারা পিস্তল হাতে ইংরেজ-হত্যায় এগিয়ে যায়, তাদের ত্যাগ ও দম্ভের উন্মাদনা অনুভব করলাম সেই মুহূর্তে; মনে হ'লো কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে পারলে, নীতি, ধর্ম, বিবেক, এমনকি মৃত্যুভয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলে, কে না রাজি হবে এই জীবনটাকে জঞ্জালের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে? কিন্তু তারপরেই মিতুর চোখে চোখ পড়লো আমার; আমি দেখলাম তার মুখ ফ্যাকাশে, ঠোঁট শুকনো—আমার শরীর, আমার মন, আমার আত্মা, যা-কিছু দিয়ে তৈরি এই আমি—সব যেন উন্মাদ বেগে তার দিকে ছুটে গেলো; আমি চোখ সরিয়ে নিলাম অন্যদিকে, আমার হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দন অনবরত আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে লাগলো, 'মিতু, তুমি ভালো থেকো। তুমি ভালো থেকো।' অনাদিবাবু আমাকে খেয়ে যেতে বললেন, আমি রাজি হলাম—শুধু মিতুর সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ থাকার জন্য। কিছু খাওয়ার অভিনয় করতে হ'লো আমাকে, কথাও বলতে হলো। তারপর—বকুল-ভিলার কম্পাউণ্ড, কুয়াশা-মাখা জ্যোছনা, মিতু আর আমি পাশাপাশি হাঁটছি, সে আমাকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছে। একটু দাঁড়ালাম বেরিয়ে আসার আগে। মিতু বললো, 'কাল এসো কিন্তু।' আর-একবার তাকালাম আমি তার দিকে—আমার স্বপ্ন, আমার আশ্রয়, আমার যৌবন, নিরপরাধ পুণ্যময় জীবন আমার—সেই সব-কিছুকে পেছনে ফেলে এক ঝটকায় উঠে পড়লাম সাইকেলে।

বাড়ি এলাম, রাত বাড়লো, ঘরে-ঘরে ঘুমিয়ে পড়লো সবাই। কিন্তু ঘুম আমাকে ছেড়ে চ'লে গেছে, ক্লান্তি আমাকে ছেড়ে চ'লে গেছে। আমি শুধু ভাবছি কালকের সন্ধের কথা—যখন আমি কার্জন হল-এ যাবো, চোখে-চোখে রাখবো বুলবুলকে, ঠিক মুহূর্তটিতে বাধা দেবো তাকে। সহজ—এর চেয়ে সহজ আর কী? ফলাফল? যা হয় হোক। অদৃষ্টের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, নয়তো এ কাজ আমাকেই কেন করতে হবে, যে-আমি এর সবচেয়ে অযোগ্য? বার-বার দৃশ্যটিকে সাজাচ্ছি মনে-মনে—এই শুই, এই উঠে বসি, এই পাইচারি করি মেঝেতে; অন্য যা-কিছু ভাবার চেষ্টা করি তাসের বাড়ির মতো ধ্ব'সে পড়ে সব। মনে পড়ে আর্থার জোন্সকে—তার সুশ্রী চেহারা, লাজুক ভঙ্গি, নরম কথা বলার ধরন। মনে পড়ে ছোট্ট রোগা বুলবুলকে, কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্ট হ'য়ে তার মিলিয়ে যাওয়া। ফেরার পথে আর-একবার থেমেছিলাম

বুলবুলের বাড়িতে, শুনলাম সে কুর্মিটোলায় মাসির কাছে বেড়াতে গেছে, কাল ফিরবে। অর্থাৎ—সকলের নাগালের বাইরে সে লুকিয়ে থাকবে, কাল সন্ধে পর্যন্ত। কালকেই আমি মুখোমুখি হবো তার সঙ্গে। কিন্তু—সত্যি কি আমি পারবো এ-কাজ? নিশ্চয়ই—পারতেই হবে। তারপর? যদি কোনো বোঝার ভুল হয়, যদি আমাকেও দাঁড়াতে হয় কাঠগড়ায়, যদি আইনের প্যাঁচে প্রমাণ হ'য়ে যায় আমিও অপরাধী? যদি এমন হয় যে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পিস্তলের গুলি ছুটে গিয়ে ঠিক জোন্সকেই বিঁধলো? আমি তখন কী ক'রে প্রমাণ করবো যে আমিই খুনে নই? জেল? আন্দামান? ফাঁসি? না—না—আমি পারবো না, আমি পারবো না। আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, বুলবুল—আমি মিতুকে চাই, আমি মিতুকে ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি কবিতা, ভালোবাসি আকাশ—মেঘ—বইয়ের বন্ধ। আমি বাঁচতে চাই—তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, বুলবুল। বলো, আমি কি তোমার কোনো কাজে লাগতে পারি, যার বিনিময়ে অনাদিবাবুর পিস্তলটি তুমি ফিরিয়ে দেবে আমাকে? বুলবুল, তোমার কি ইচ্ছে করে না সুখী হ'তে, অন্যকে সুখী করতে—তুমি কি কাউকে কোনোদিন ভালোবাসোনি? আমি তো কোনো ক্ষতি করিনি তোমার, আমাকে এই শাস্তি দিলে কেন?···আমি টেবিলে লণ্ঠনটা জ্বেলে রেখেছিলাম, উস্কে দিয়ে একটা বই খুলে বসলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রেও একটি কথারও মানে বুঝতে পারলাম না। এখনো কি আছে সেই জগৎ, যেখানে লোকেরা কবিতা পড়ে, গান শোনে, কবিতা লেখে, গান গায়? যদি পিস্তলের গুলি আমাকেই ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, ঠিক এখানটায়, আমার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাচ্ছে যেখানে? আমি কি ম'রে যাবো? এ-ই কি শেষ রাত্রি আমার জীবনে? আমি ঠেলে দিলাম বইটাকে, চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলাম, হঠাৎ মনে হ'লো এখনো অনেক সময় আছে, এখনো অনেক-গুলো, অনেকগুলো ঘণ্টা আমি বেঁচে আছি। আমার কি দু-একটা চিঠি লিখে রাখা উচিত—একটা মিতুর, আর-একটা আমার মা-বাবার জন্য? পরে যদি আর সময় না হয়? শোনো—আমি সব বুঝিয়ে বলছি—আমার উপায় ছিলো না, আর-কোনো উপায় ছিলো না। না—আমি বোধহয় বড্ড বাড়িয়ে তুলছি ব্যাপারটাকে; ইচ্ছে করলে—শুধু ইচ্ছে করলেই আমি তো বেরিয়ে আসতে পারি এই আগুনের বেড়া থেকে। কাল বাড়ি ব'সে কাটিয়ে দেবো সারাদিন?

চ'লে যাবো সকালের প্রথম লঞ্চে পিসিমার কাছে মুন্সীগঞ্জে? আমার স্নায়ুতন্ত্রী মুচড়ে-মুচড়ে কেউ যেন বার-বার বলতে লাগলো, 'বুলবুল—আর্থার জোন্স—এদের নিয়ে এত ভাবছো কেন তুমি? তারা কি তোমার মা-বাবার চেয়ে বেশি? মিতুর চেয়ে বেশি? মিতু, তোমার মিতু, যাকে তুমি কথা দিয়েছো, যে অপেক্ষা করবে তোমার জন্য যতদিন তুমি বলবে, যার সুখ, জীবন, ভবিষ্যৎ সব নির্ভর করছে তোমার ওপর—তুমি কি তাকে বলি দেবে একটা গোঁয়ার মেয়ের খেয়ালের কাছে, তোমার জীবনে যার কোনো অর্থ নেই, যার ধ্যান-ধারণা ক্রিয়াকর্ম সবই তোমার একেবারে উল্টো? কোনো উন্মাদ যদি কোনো নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে, তুমি কী করতে পারো? খুব সম্ভব বুলবুলের হাত কেঁপে গুলি ফশকে যাবে, জোন্সের গায়ে আঁচড়ও লাগবে না, বা হয়তো শেষ পর্যন্ত সাহস পাবে না বুলবুল, বা জেগে উঠবে তার মনুষ্যোচিত দয়া, নিজের জীবনের প্রতি মমতা—হয়তো বা তার ধুম জ্বর আসবে কাল, বা তার বাবা হঠাৎ মারা যাবেন—কত কিছু হ'য়ে যেতে পারে এখন থেকে কাল সন্ধের মধ্যে। তুমি শান্ত হও, ঘুমোও, মিতুকে ভাবো—যদি তুমি আর মিতু সুখী হও, যদি তুমি কখনো কিছু ভালো কবিতা লিখে উঠতে পারো, তাতেই কি সত্যিকার লাভবান হবে না এই জগৎ, বুলবুলের এই ভারতবর্ষ?'...বুদ্বুদ—বুদ্বুদের মতো ভাবনা এ-সব, ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়; জেলখানার কয়েদি যেমন স্বপ্নে তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায়, এও তেমনি; আমি বাধ্য, কে আমাকে বাধ্য করেছে জানি না; আমি আর স্বাধীন নেই, আমার ইচ্ছেগুলো পাথরের তলায় চাপা প'ড়ে গেছে। যতবার যেদিক থেকেই ভাবি, সেই একই জায়গায় পৌঁছে যাই শেষ পর্যন্ত—কার্জন হল, বুলবুল, আর্থার জোন্স। না—পারি না, আর ভাববো না আমি, আর ভাবতে পারি না—ভগবান, আমাকে দয়া করো!

একটা খশখশে শব্দ হ'লো আমার পেছনে, চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি—দরজার কাছে কাজল। মনে পড়লো কাজল শুতে যাবার আগে একবার আমার ঘরে এসেছিলো—রোজকার মতো গল্প করার জন্য—আমি বলেছিলুম আমার জরুরি পড়া আছে আজ। এতক্ষণ একেবারে ভুলে ছিলুম তাকে, দেখে অবাক লাগলো—মনে হ'লো কোনো প্রেতলোকে জীবিত মানুষের আবির্ভাব। কাজল এগিয়ে এসে বললো, 'কী হয়েছে রঞ্জু, তুমি এখনো ঘুমোওনি?' 'এই শুতে যাচ্ছিলাম, তুমি উঠে এলে কেন?' 'হঠাৎ আমার

ঘুম ভেঙে গেলো, তুমি কি পাইচারি করছিলে একটু আগে? এক্ষুনি একটা গোঙানির মতো শুনলাম যেন।' আমি জবাব না-দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম; কাজল বললো, 'এ কী চেহারা হয়েছে তোমার! অসুখ করেনি তো? দেখি—' আমার কপালে, গালে হাত রেখে তাপ অনুভব করলো সে। 'না—জ্বর ব'লে তো মনে হচ্ছে না—কিন্তু কিছু-একটা হয়েছে আমি বুঝতে পারছি। কী ভাবছো—কী ভাবছিলে—এত রাত অবধি জেগে ব'সে আছো কেন?' আমি তাকালাম কাজলের দিকে—ঘুম-ভাঙা ফোলা-ফোলা চোখ তার, তার ভরপুর শরীরটিকে ঢাকতে গিয়ে ফুলে উঠেছে তার শাড়ির আঁচল; আমি তার মধ্যে দেখলাম যা-কিছু আমি হারাতে বসেছি—স্বাস্থ্য, স্বাভাবিকতা, জীবন, জীবনের স্বাদ; আমার জন্য উৎকণ্ঠা, স্নেহ, মমতা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে, কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ সৈনিকের হাতে স্বদেশের নিশান যেন তার গায়ের আঁচল, বা যেন ডুবন্ত নৌকো থেকে দেখা কোনো আলোকস্তম্ভ সে, বা যেন, আমি যখন অগাধ জলে হাবুডুবু খাচ্ছি, কেউ নৌকো থেকে রশি বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে। একটা পাগল ইচ্ছার ঢেউ উঠলো আমার মনে, পাথর ফেটে বেরিয়ে এলো স্রোত: বলবো, তাকে আমি সব বলবো, আমার কষ্টের একজন সাক্ষী রাখবো অন্তত, অন্তত একজনের সঙ্গে ভাগ ক'রে নেবো এই মর্মান্তিক রাত্রিটিকে। নির্বোধ অসহায় শিশুর মতো আমি হ'য়ে গেলাম সেই মুহূর্তে, বিহ্বল কোনো মাতালের মতো; আমি দুই হাতে কাজলকে জাপটে ধ'রে তার কাঁধের ওপর মাথা রাখলাম, কেঁপে উঠলাম সারা শরীরে থরথর ক'রে, কথা বলতে গিয়ে আটকে গেলো গলা, তারপর আমার চোখ ফেটে বুক ফেটে গলা ছিঁড়ে কান্না নেমে এলো। আরাম—আমি বেঁচে গিয়েছি—নৌকাডুবির পরে সাঁৎরে-সাঁৎরে বিধ্বস্ত হ'য়ে পায়ের তলায় মাটি পেয়েছি এতক্ষণে। কাজলের আঙুলগুলি আমার চুলের মধ্যে, আমার কানের কাছে ফড়িঙের পাখার মতো তার গলার আওয়াজ—'কী? কী? কী হয়েছে, রঞ্জু? কী হয়েছে?' আমার কান্নার বেগ ক'মে এলো, আমি মুখ তুললাম, সে হাত দিয়ে আমার চোখের জল মুছে দিলো। 'বলো। আমাকে বলবে না?' কিন্তু ততক্ষণে অন্য এক পিস্তলের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে আমার রক্তে, আমি কাজলকে আর দেখতে পাচ্ছি না, শুধু অনুভব করছি এক স্পর্শময়ীকে, আমার গলার ওপরে তার নিশ্বাস, আমার শূন্যতা ভ'রে তার শরীর। যদি

তা-ই হয়, যদি কালকের পরে হারিয়ে যায় আমার চেনা পৃথিবী, যদি আমাকে কালকেই মরতে হয়, তাহ'লে কি আমি কখনো জানবো না নারীর স্বাদ—প্রেমের স্বাদ—ঐ আমার গভীরতম এক বাসনাকে অপূর্ণ রেখেই কি বিদায় নিতে হবে? আমার এতদিনের রুদ্ধ কামনা অদম্য হ'য়ে উঠলো, আমি কাজলকে টেনে নিয়ে এলিয়ে পড়লাম বিছানায়। 'রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জু—' দুর্বলভাবে সে বাধা দিলো আমাকে, তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, ঝড়ের মতো তার নিশ্বাস, হাতুড়ির মতো বুকের শব্দ, আমার মুখের মধ্যে এক অলৌকিক ফেনিল আগুনের শিখার মতো তার জিভ, আমার ঠোঁটের ওপর তার সজল দাঁত থেকে ঝ'রে পড়ছে এক বিশাল মূর্ছা, আমি তার বুকের মধ্যে বৈদ্যুতিক পরমাণুতে বিচূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছি। কিছু নেই—জগৎ নেই, দায়িত্ব নেই, যন্ত্রণা নেই—সে আর আমি শুধু—না, আমরাও নেই আর : এরই নাম মুক্তি, নির্বাণ, মৃত্যু।

১৬

দেখলেন, এরই মধ্যে রাত ভারি হ'লো, অন্ধকার। অচেনা এক জগৎ বাইরে। কিন্তু—আমি নিশ্চিন্ত। দেখুন কেমন ছোটো আমার ঘর। দেয়ালে ঘেরা, আলো জ্বলছে, ভারি পর্দা জানলায়। প্রচুর মদ আছে আমার, গায়ত্রী আছে। আমার ভয় নেই। গুর্খা দরোয়ান, অ্যালসেশান দুটো সারা রাত টহল দেয়। আমার ভয় নেই।...আজ্ঞে? আমার মদ্যপানের ক্ষমতা দেখে অবাক হচ্ছেন? থ্যাঙ্কিউ, ও-বিষয়ে সত্যি আমি ছোটোখাটো একটি চ্যাম্পিয়ান। আপনি চিন্তিত হবেন না তাই ব'লে। কিছু হয় না আমার। দেখুন, পরীক্ষা ক'রে দেখুন, যে-কোনো কঠিন শব্দ উচ্চারণ করতে বলুন, জিগেস করুন বানান, ভূগোলের প্রশ্ন, ইতিহাসের তারিখ—যা আপনার ইচ্ছে। কী? এই ফিকিরে জেনে নিতে চাচ্ছেন পুরোনো কথা, গোপন কথা? আপনি তো ভারি চালাক লোক, মশাই; যা জানেন, বহুদিন ধ'রে জানেন, তা-ই আবার বলিয়ে নিতে চান আমাকে দিয়ে? কেন, আপনি কি ছিলেন না সেদিন কার্জন হল্-এ, দূর থেকে কি দেখছিলেন না আমাকে, বুলবুলকে—এতক্ষণে সব কি আপনার মনে প'ড়ে যায়নি? একেবারে সামনের সারিতে ব'সে আছে বুলবুল, আমি দাঁড়িয়ে থামের আড়ালে করিডরে, বুলবুল আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, তার চোখে একমাত্র দৃশ্য এখন আর্থার জোন্স, যেমন আমার চোখে—সে। আমি আমার চোখ দুটোকে আটকে রেখেছি বুলবুলের ওপর—ভীষণ, ভীষণ মনোযোগে। ঝাপসা আওয়াজ—জোন্সের বক্তৃতা—হাওয়ার শব্দ, পাতার শব্দ, অর্থহীন। ঝাপসা অন্য সব মুখ, অস্তিত্বহীন। পাখির মুণ্ডটি ছাড়া আর-কিছু দেখতে পাননি অর্জুন, তেমনি খেলা বুলবুলের সঙ্গে জোন্সের, আবার আমার সঙ্গে বুলবুলের। আমার চোখ ফেটে যাচ্ছে, এক-একটি মিনিটকে মনে হচ্ছে অনন্তকাল। তারপর—ঐ বুলবুল উঠলো, তার হাত নেমে এলো তার ব্লাউজের দিকে—আমি ছুটে গিয়ে তাকে জাপটে ধরেছি। একটা প্রচণ্ড শব্দ, ধোঁয়া, বারুদের গন্ধ, লোকজনের চীৎকার।

আচ্ছা, আমি কয়েকদিন হাজতে ছিলাম—তা-ই না? ঠিক মনে আছে আপনার? তারপর?…ও, হ্যাঁ। বেরিয়ে এসে শুনলাম, জোন্স অনেক ধরাধরি করেছিলো আমার হ'য়ে, কিন্তু তার চেষ্টাও মিতুকে বাঁচাতে পারেনি। মিতু এখন ডেটিন্যু, আপাতত আছে ঢাকা জেলে, শিগগিরই বদলি হবে অন্য কোথাও। দেখা করার অনুমতি চাইলাম, পেলাম না। তারই বাবার পিস্তল, তারই বন্ধু বুলবুল; অতএব তাকে আটকে না-রাখলে পঞ্চম জর্জের সাম্রাজ্য নাকি টেকে না। বিভাবতী ধরা পড়লেন কলকাতায়; জোন্স বদলি হ'লো রাজসাহীতে। আমি দু-মাস পরে চাঁদপাল ঘাটে 'সিটি অব ক্যালকাটা' জাহাজে উঠলাম। বিলেতে আমাকে যেতেই হ'লো। দেশে থাকলে পুলিশের দৃষ্টি এড়ানো যাবে না। অবিলম্বে আমাকে বিলেতে পাঠিয়ে দিলে আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে—এমনি একটা আশ্বাস নাকি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েছিলেন আমার বাবাকে। তাছাড়া—বেনামী চিঠিও পাচ্ছিলাম মাঝে-মাঝে: 'আর্থার জোন্সকে তুমি বাঁচালে, কিন্তু ভেবো না আমাদের প্রতিহিংসা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে।' 'বুলবুল তোমারই জন্য ধরা পড়লো, আমরা তোমাকে নিস্তার দেবো না।' একদিকে পুলিশ, আর-একদিকে বুলবুলের 'আমরা'। কোথাও সুবিচার নেই, মশাই। কাজল তার যে-সব গয়না স্বামীর জন্য হাতছাড়া করেনি, সেগুলি সে বন্ধক দিলে আমার জন্য; সেই টাকায় এক হাড়-কাঁপানো শীতের রাত্তিরে ইংলণ্ডের মাটি ছুঁলাম।

আমার কি কষ্ট হয়েছিলো দেশ ছেড়ে যখন চ'লে আসি? একটুও না। জাহাজ ছেড়ে দিলো, আমার চোখ থেকে মিলিয়ে গেলো বাংলাদেশের মাটি, আমি অবাক হ'য়ে দেখলাম আমার মনে কোনো কষ্ট নেই—বুলবুল, কাজল, মিতু—এমনকি মিতু—সব যেন ছায়া হ'য়ে গেছে এরই মধ্যে। কাজলও এসেছিলো মা-বাবার সঙ্গে জাহাজ-ঘাটায়, কিন্তু তার কান্নায়-লাল-হ'য়ে-যাওয়া চোখ সেই দুপুরবেলার আকাশে কোনো ছায়া ফেললো না; আর—সেই রাত্রিটি, যখন দুই স্রোতের মতো সে আর আমি মিলিয়ে গিয়েছিলাম পরস্পরে—তাও যেন একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেছে আমার জীবন থেকে, কোনো চিহ্ন, কোনো অনুরণন না-রেখে। যে-তীর ছেড়ে যাচ্ছি তার জন্য কোনো খেদ নেই; যে-দেশে যাচ্ছি তার জন্যও কোনো ঔৎসুক্য নেই; যদি বঙ্গোপসাগরে

লাফিয়ে পড়ি তাতেই বা কী এসে যায়। কিন্তু সে-রকম কিছু করার মতো উদ্যমও আর অবশিষ্ট নেই আমার; আমি নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছি, বিধ্বস্ত। কত ভাগ্যে কেউ জখম হয়নি, কোনো শারীরিক মৃত্যু ঘটেনি, শুধু কার্জন হল-এর জমকালো সীলিঙ থেকে চাক-চাক সীমেণ্ট চুন খ'সে পড়েছিলো। কিন্তু আমি ম'রে গিয়েছিলাম একুশ বছর বয়সে—সেদিনের সেই সন্ধেবেলায়। আমার স্বভাবের যেটা প্রাণকেন্দ্র, যাকে ঘিরে-ঘিরে গ'ড়ে উঠছিলো আমার জীবন, সেই কেন্দ্র থেকে ছিটকে খ'সে পড়েছি; আমাদের পৃথিবী যদি সৌর-মণ্ডল থেকে বেরিয়ে যায় তাহ'লে যেমন এক ফালি ঘাসও আর জন্মাবে না, আমার সত্তার পক্ষে এও যেন তেমনি। যেদিন পা রাখলাম আমার 'স্বপ্নে'র ইংলণ্ডের মাটিতে, দেখলাম, বৃটিশ ম্যুজিয়মে ব্লেকের মূল পাণ্ডুলিপি, বডলিয়ানে শেলির কবিতার খাতা, সিব্‌ল্‌ থর্নডাইক-এর অভিনয়ে বর্নার্ড শ-র 'সেইণ্ট জোন'—সে-সব দিনেও কোনো রোমাঞ্চ আমি টের পেলাম না; আমার মনে হ'লো যেখানেই মানুষ আছে সেখানেই হাঁ ক'রে আছে পাতাল, নানা রূপ ও নানা নাম নিয়ে মৃত্যু—অতএব এক দেশের সঙ্গে আর-এক দেশের কোনো তফাৎ নেই। মনে হ'লো আমার পুরোনো জীবন ফুরিয়ে গেছে, অথচ কোনো নতুন জীবনও শুরু হ'লো না—শুধু, কোনো ভুতুড়ে কণ্ঠস্বরের মতো, কোনো আধো-চেনা আঁধার মহাদেশের বার্তার মতো, মাঝে-মাঝে মা-র চিঠি পৌঁছয়। একদিন দুটো চিঠি এলো একসঙ্গে: একটা মা-র, আর-একটাতে হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পের ছাপ মারা। মিতু—মিতুর চিঠি। বকুল-ভিলার মিতু। সোনালিকণ্ঠী গায়িকা। হোমিওপ্যাথ অনাদিবাবুর কন্যা। আমার প্রেমিকা। আমার ভাবী স্ত্রী। শেষ কথা লিখেছে, 'দুঃখ কোরো না, আবার দেখা হবে।' বৃষ্টির শব্দে, বা ভোরের হাওয়ায়, বা কোনো নতুন ওষুধের অস্থায়ী প্রভাবে, মুমূর্ষুরও যেমন মনে হয় সে সেরে উঠছে, তেমনি, মিতুর চিঠি প'ড়ে আমিও মুহূর্তের জন্য ফিরে পেয়েছিলাম আমার বাঁচার ইচ্ছা, মনে হয়েছিলো আবার জীবন নতুন ক'রে শুরু হ'তে পারে। কিন্তু মা-র চিঠি প'ড়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না কী লেখা আছে তাতে। 'হতভাগিনী তার পাপের বোঝা নিয়ে আমাদের ছেড়ে চ'লে গিয়েছে।' কে?···কী পাপ?···কোথায় চ'লে গিয়েছে? ভীষণ শীত, ছুরির মতো হাওয়া, বেগে বরফ পড়ছে, এক তুষারে-মোড়া অস্পষ্ট নৈশ লণ্ডন, যাকে দখল ক'রে নিয়েছে বেশ্যা, লম্পট,

মাতাল আর নিঃসঙ্গেরা—আমি বেরিয়ে এসেছি রাস্তায়, মাইলের পর মাইল হাঁটছি, হাঁটছি আর মনে-মনে বলছি, 'কাজল ম'রে গেছে, তার গর্ভে সন্তান ছিলো—স্বামী কাছে নেই তবু সন্তান—তাই গলায় দড়ি দিয়েছিলো কাজল।' বিরাট শহর, কাউকে চিনি না; বিরাট পৃথিবী, কাউকে চিনি না; শবের মতো ঠাণ্ডা এই রাত্রি, আমার হাত-পা অসাড় হ'য়ে যাচ্ছে। আমি গরম হবার জন্য একটা শুঁড়িখানায় ঢুকে পড়লাম—সেই আমার মদের সঙ্গে প্রথম মোকাবিলা—সে-রাত্রে কেমন ক'রে বাড়ি ফিরে এলাম, ঘুমিয়েছিলাম কিনা, কিছু মনে নেই।

আপনার কি কষ্ট হচ্ছে কাজলের জন্য? চেপে যান, ও-সবের কোনো মানে হয় না। আমাকে দোষ দিচ্ছেন? কী আশ্চর্য, আমি কি কাজলকে ম'রে যেতে বলেছিলাম?…জানেন, একবার খুব ইচ্ছে হয়েছিলো মা-কে সব খুলে বলি, লম্বা চিঠি লিখি একটা—ভাগ্যিশ শেষ মুহূর্তে সামলে যাবার মতো সুবুদ্ধি হ'লো। কাজলকে ভালোবাসতেন আমার মা, শোকার্ত আছেন, তার ওপর আবার আর-এক দুঃখ কেন চাপাই। কাজলের নাম আর কখনো বেরোয়নি তাঁর কলম থেকে, কি মুখ থেকে—আমিও ছিলাম নিঃশব্দ। কেউ জানে না কাজলকে ঐ ভ্রূণটি কে উপহার দিয়েছিলো—জানবে না কোনোদিন—আমি ছাড়া—আর আপনি ছাড়া। আপনি তো জানেন কেমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় ওটা ঘ'টে গিয়েছিলো—হঠাৎ এক বিপুল আবেগের ঝোঁকে—পাঁচ মিনিট আগেও ভাবিনি আমি—আমার সেই মুহূর্তের অশান্তিকে করুণা করেছিলো কাজল, চেয়েছিলো তার ক্ষুধিত নারীত্বের হৃদয়মন্থন মমতা দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখতে, আর তাই সে হারিয়ে ফেলেছিলো কাণ্ডজ্ঞান, অত সহজে সাড়া দিয়েছিলো আমার কামনায়। কেনই বা দেবে না বলুন—কী পেয়েছিলো সে জীবনে, কী পেয়েছিলো তার স্বামীর কাছে নির্লজ্জ অবহেলা ছাড়া—সে কি মানুষ নয়, তারও কি মন নেই, শরীর নেই, অধিকার নেই জীবনের কাছে একবার অন্তত ক্ষতিপূরণ ছিনিয়ে নেবার? আর আমি—আমিও তার মরুভূমিতে বৃষ্টি নামিয়েছিলাম; পারস্পরিক সান্ত্বনার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলাম দু-জনে সেই রাত্রে। আপনি তো সব জানেন, সব বুঝে নিয়েছেন এতক্ষণে: আপনি কি বলবেন এটা অপরাধ?

সত্যি যদি কেউ দোষী থাকে সে কে জানেন? বুলবুল। সে মেয়ে

ব'লে, আর বয়স অত অল্প ব'লে, হাইকোর্টের জজেরা তাকে দয়া করেছিলেন, চোদ্দ থেকে আট বছরে নেমে এসেছিলো তার কারাদণ্ড। কিন্তু তার সত্যিকার বিচার কখনো হ'লো না—একমাত্র আমারই মনের মধ্যে ছাড়া। 'মিতুকে তুমি এত ভালোবাসো, আর তোমার দেশের লোককে তুমি একটুও ভালোবাসতে পারো না?'—এই কথাটার অর্থ বুঝতে কি এক মিনিটও সময় লাগে আপনার কি আমার মতো অভিজ্ঞ লোকের? বুলবুল ভালোবেসেছিলো আমাকে, কিন্তু নিজের কাছে তা কিছুতেই স্বীকার করেনি, তাই চালিয়ে দিয়েছিলো তার আবেগটাকে অন্য এক ভয়াবহ রাস্তায়। চেয়েছিলো হত্যা করতে—জোন্সকে নয়, আমার ভালোবাসাকে; প্রতিশোধ নিতে, ইংরেজের নয়, মিতুর আর আমার ওপর, যেহেতু আমরা পরস্পরকে ভালোবেসেছিলাম। তার আসল লক্ষ্যে নির্ভুলভাবে তার হিংসার গুলি সে বিঁধিয়েছিলো—একেবারে বুল্'স্ আই! তা-ই যদি না হবে, তাহলে কেন সে আমার কাছে ফাঁস করেছিলো তার ভীষণ অভিসন্ধি? ও-রকম কাজে যে এগিয়ে যায় সে কি তার প্রাণের বন্ধুকেও বলে সে-কথা? না কি কোনো বন্ধুই কখনো থাকে তার, থাকতে পারে? কী ক'রে থাকবে—সে যে এক মহামান্য ও ভয়াবহ 'আমরা'র মধ্যে বিকিয়ে দিয়েছে নিজেকে। 'দ্যাখো এবার—কেমন তোমার স্বপ্নের বেলুন ফুটো ক'রে দিলাম, আর কি তুমি তোমার ভাবের জগতে, প্রেমের জগতে বুঁদ হ'য়ে থাকতে পারবে!' আপনিই বলুন, এ কি নয় জুলুম, ব্ল্যাকমেইল, নিষ্ঠুরতা, মানুষের হৃদয়ের ওপর, বিবেকের ওপর অত্যাচার? দুঃখের মতো অত্যাচারী আর কী আছে বলুন, আর কিসের অমন দুর্ধর্ষ ক্ষমতা আছে নির্দোষকে দোষী ক'রে তোলার—এমন ভোগী, সুখান্বেষী, স্বার্থপর মানুষ আপনি কোথায় খুঁজে পাবেন যে কুঁকড়ে যাবে না কোনো মুমূর্ষুর চোখের সামনে, ক্ষুধিতের কান্নার সামনে, কোনো শান্তি-প্রীতি-শৃঙ্খলা-ভাঙা অমানুষিক বীরত্বের দৃশ্যে?...আজ্ঞে? আমি ভুল বলছি, আপনার মনে হয়? বুলবুলের দেশপ্রেম? তার মৃত্যুপণ? আরে মশাই, আমার কথাই আমাকে শোনাচ্ছেন কেন? আমি তো মানছি আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিলো তার হাতে পিস্তল দেখে, আমি অভিভূত হয়েছিলাম ঐ রোগা মেয়েটির ত্যাগে ও দুঃসাহসে, মুহূর্তের জন্য নিজেকে ছোটো মনে হয়েছিলো তার তুলনায়, মুহূর্তের জন্য প্রায় একমত হয়েছিলাম তার সঙ্গে যে আর্থার জোন্স এই পৃথিবীর বাতাসে

নিশ্বাস নেবার যোগ্য নয়। না—বুলবুলকে দোষ দিয়ে কী হবে, আমারই দোষ; বোকামি—বোকামি—যাকে বলে ডাহা বোকামি, তা-ই। বুঝিনি আমি, কত সহজ হ'তো আমার পক্ষে তাকে ফেরানো, শুধু একটি কথা তাকে বলতাম যদি—'বুলবুল, তোমার জীবন আমারও কাছে মূল্যবান, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' যদি সেই আমবাগানের নির্জনতায়, যখন ফোঁটা-ফোঁটা সূর্যাস্তের আলো চুঁইয়ে পড়ছে ডালপালার ফাঁক দিয়ে, আর আমি হাতে ধ'রে আছি বুলবুলের বুকের তাপে উষ্ণ-হ'য়ে-ওঠা মারণাস্ত্র, যদি তখনই আমি অন্য হাতে তার হাত ধ'রে বলতাম, 'না বুলবুল, এ আমি হ'তে দেবো না, তুমি চলো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলছি।' বা যদি তারই কথা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলতাম, 'বুলবুল, তুমি এই দেশের তেত্রিশ কোটিকে এত ভালোবাসো, আর আমাকে কি একটুও ভালোবাসো না?' কিন্তু না, আমি তা কী ক'রে বলি, আমি যে সাধু, সত্যবাদী, আমি যে মিতুকে ভালোবাসি—বুলবুলকে নয়। আমি যে ভান করতে পারি না, আমি যে ভণ্ড হ'তে শিখিনি; আমি যে পুরোপুরি আমার মূর্খ হৃদয়ের দ্বারা চালিত। ঐ একটি ছোটো মিথ্যে ব'লে আমি পিস্তলটি রেখে দিতে পারতাম আমার কাছে, পারতাম না অনাদিবাবুকে ফিরিয়ে দিতে—কী অগাধ সুখের না সমাপ্তি হ'তে পারতো এই কাহিনীর। আর, যদি তা নাও করেছিলাম, তবু পরে ঐ হিমালয়তুল্য বোকামির ভূত কেন নামাতে পারলাম না কাঁধ থেকে—কেন ছুটে গেলাম পরোপকার করতে, প্রাণ বাঁচাতে? ফোঁপরদালালি, অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো, অনধিকারচর্চা! কী-দায় পড়েছিলো আমার—বুলবুল, আর্থার জোন্স—এরা আমার কে? কেউ নয়—মিতুর তুলনায় কেউ নয়। কেন ভাবতে পারিনি: যে যার পথে যাক না, আমার কী এসে যায়? ওদের বাঁচাতে গিয়ে কাজলকে আমি মেরে ফেললাম। ধ্বংস ক'রে দিলাম আমার জীবন, মিতুর জীবন।

কিন্তু, জানেন, ঠিক এই সময়েই, ঠাণ্ডা লণ্ডনে ব'সে, আমি টের পেলাম আমার বুদ্ধি বেশ খটখটে শুকনো আর ধারালো হ'য়ে উঠছে—ব্যারিস্টারি পড়ছি, এদিকে তৈরি হচ্ছি আই. সি. এস.-এর জন্য, ক'ষে প্রেম চালাচ্ছি ইকনমিক্স, পলিটিক্‌ল্ সায়ান্স (হা ভগবান, ও-সব লম্বা-চওড়া সম্পূর্ণ অকেজো বোলবোলাও থিওরিকেও কিনা 'সায়ান্স' বলে!) আর আইনের সঙ্গে, মাঝে-মাঝে

পার্লামেণ্টে গিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুনছি; উত্তরোত্তর অধিকতর তারিফ করছি মানুষের বুদ্ধিকে—সেই শয়তান বুদ্ধি, যার জোরে রক্তাক্ত খুনেকে বেকসুর খালাস পাইয়ে দেয় উকিল; জোয়ালো জাতিরা হেসে-খেলে জবাই করে ছোটোদের, তারপর সাজে তাদেরই উদ্ধারকর্তা; যার ওপর নির্ভর ক'রে বিভাবতী বুলবুলকে শিখিয়েছিলেন যে আসলে সত্য ব'লে কিছু নেই, যখন যেটাতে আমাদের সুবিধে সেটাকেই সত্য ব'লে ধ'রে নিতে হবে; যা আমিও পরে করাতের মতো চালিয়ে গিয়েছিলুম আমার পত্নী শ্রীমতী নলিনীর ওপর, যা আজও আমার অস্তিত্বের সাফাই ও অবলম্বন, কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা আর তাল-তাল নারীমাংসের ওপর আমি যার বিজয়ধ্বজা উড়িয়েছি—সেই বুদ্ধি। জানেন, আমি ক্রমশ নিষ্কলঙ্ক ক'রে তুলছিলুম নিজেকে—প্রায় বলতে পারেন নিরঞ্জন—ইংলণ্ডে কৃতী ছাত্র, ভারতভূমিতে ব্রিলিয়েণ্ট অফিসার, চাল-চলন আদবকায়দায় অতুলনীয়—কিন্তু আসলে কিছু নই, একটা যন্ত্র, কতগুলো অঙ্গভঙ্গির সমষ্টি, যার ভেতরটা একেবারে শূন্য।—কিন্তু আসলে তো শূন্য ব'লে কিছু নেই, সবচেয়ে ছোটো পূর্ণসংখ্যা যে-এক, সেটাকে অবিরল ভগ্নাংশে ভাগ ক'রে চললে যেমন কোনোকালেও শেষ হবে না, তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও লুকিয়ে আছে কোনো-এক অমর অজেয় অফুরন্ত দশমিক, রক্তে-মিশে-থাকা মৃত হৃদয়ের বীজাণু—হয়তো তারই নাম স্মৃতি, তারই নাম মহাকাল— সেই যোগসূত্র, যা কখনো লুপ্ত হ'তে দেয় না অতীতকে, যা হ'য়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনে, ভুলতে দেয় না।

না, মিতুর সেই চিঠির আমি জবাব দিইনি, আমার আবেগের সর্বশেষ স্ফুলিঙ্গ হরণ ক'রে নিয়েছিলো কাজল। দেশে ফিরেও মিতুর খোঁজ করিনি আর। মাঝে-মাঝে তার খবর পাই আমার মা-র মুখে—নিঃশব্দে শুনে যাই, কোনো মন্তব্য না-ক'রে। চার বছর পরে ছাড়া পেয়েছিলো মিতু, বাড়ি ফিরে তার মা-কে দেখতে পায়নি। মনের কষ্টে ভেঙে পড়েছিলেন ভদ্র-মহিলা, খেতেন না, পেটে ট্যুমার হ'লো। হয়তো অপারেশন করলে বাঁচানো যেতো, কিন্তু অনাদিবাবুর জেদে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক মতে মারা গেলেন—মিতু ফিরে আসার মাত্র মাসখানেক আগে। অনাদিবাবু প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন, তাঁর জীবনের ভিৎ ফেটে গেলো। মিতু, অতি যত্নে লালিত, মা-বাবার একমাত্র সন্তান, নিভৃত, লাজুক, কোমল স্বভাবের মেয়ে, রোদে বেরোলে যার

মাথা ধরতো, রাত্রে মা-র সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোতো যে, সেই মিতু তার রূপ যৌবন গানের গলা হারিয়ে ফিরে এলো এক নিষ্ক্রিয় নির্জীব বুড়ো-হ'য়ে-যাওয়া নিঃশব্দ বাবার কাছে। তার প্রাক্তন গৌরবের সম্মান রেখে তাকে বিয়ে করলো—কে জানেন। বলিষ্ঠ, বোকাসোকা, বদ রসিকতায় ওস্তাদ সেই অমূল্য। সে-ও ধরা পড়েছিলো মিতুর সঙ্গে একই সময়ে; প্রায় চেষ্টা ক'রে ধরা পড়েছিলো, বিভাবতীকে একটা আগড়ুম-বাগড়ুম চিঠি লেখার ফলে—সে-চিঠি পুলিশের হাতে পড়বে, তা নিশ্চিত জেনেই লিখেছিলো—এমনি ক'রে কেটে পড়েছিলো বাবার শাসন, পড়াশুনোর জুলুম, আর বেকার হবার দুর্নাম থেকে, তার চেয়ে অনেক উন্নত লোকদের 'সমকক্ষ' ব'লে ভাবতে পেরেছিলো নিজেকে। বন্দী অবস্থায় সে কোনো উপন্যাস লেখেনি; হেগেল, মার্ক্স, ইয়ুং অথবা আধুনিক কবিতা পড়েনি; কপালে হাত রেখে ইজি-চেয়ারে ব'সে নিশ্বাস ফ্যালেনি আকাশের দিকে তাকিয়ে; হাসিতে গানে গল্পে-গুজবে 'মাতিয়ে রেখেছিলো' সারা বক্সার ক্যাম্প; প্রচুর খেয়ে, প্রচুর ঘুমিয়ে, তাস খেলে, ভলি-বল খেলে, স্বাস্থ্য আরো ভালো ক'রে বাক্স-ভর্তি তাঁতের ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো।··· আপনি অবাক হচ্ছেন যে মিতু তাকে···কেন? এতে অবাক হবার কী আছে? মা নেই, বাবা অথর্ব, বিয়ে না-ক'রে উপায় কী মিতুর? আমি? আরে মশাই আমি যে এতদিনে রতনদাসের জামাই হয়েছি, তা কি আর জানতে বাকি ছিলো কারো? তা ভাববেন না অমূল্য একটা ফ্যালনা লোক। কলকাতায় 'কবি অমূল্যচরণে'র নাম শোনেননি? 'আধুনিক' গানের নক্ষত্র, রবীন্দ্রনাথের গায়ের উকুন হ'য়ে যে 'গান রচনা' করে? যার কণ্ঠনিঃসৃত ন্যাকামির বন্যায় বাংলাদেশের চিরন্তন বালকবালিকারা হাবুডুবু খাচ্ছে? সেই অমূল্য। গাড়ি-হাঁকানো, 'ফাঙ্কশন'-জমানো, তরুণী-মজানো অমূল্যচরণ, ফিল্মের প্লে-ব্যাকে নামজাদা মধুক্ষরা মজুমদারের সঙ্গে যার বিয়ের খবর শুনে অনেকেই খুশি হয়েছিলো কলকাতায়। তার প্রথম স্ত্রী নাকি যোগ্য ছিলো না তার, বড্ড সাধারণ ছিলো। সময়ের জারিজুরি আশ্চর্য: মাত্র দশ বছর, বারো বছর—তারই মধ্যে সবাই ভুলে গেছে এককালের বিখ্যাত গায়িকা অমিতা বর্ধনকে, যার রেকর্ড থেকে দিলদার নওরোজের গান প্রথম সারা দেশে ছড়িয়েছিলো, যার সঙ্গে চিঠি-লেখালেখি চলতো

কলকাতা লক্ষ্ণৌ পণ্ডিচেরি-বাসী মনীষীদের, আর এখন যে গানের বিষয়ে এতদূর পর্যন্ত উৎসাহ হারিয়েছে যে তার হৃষ্টপুষ্ট জমকালো স্বামীর সঙ্গে কোনো আসরে পর্যন্ত যায় না !···আজ্ঞে ? না, বিপত্নীক হবার মতো সৌভাগ্য হয়নি অমূল্যর ;—কী হয়েছিলো, আদালতে ডিভোর্স, না এমনি ছাড়াছাড়ি, অমূল্য কি যোগ্যতর স্ত্রী ঘরে আনার জন্য পাকে-প্রকারে তাড়িয়েছিলো তাকে, না কি সে-ই একদিন বেরিয়ে এসেছিলো তার দশ বছরের ছেলের হাত ধ'রে, সে-সব ঠিক জানি না আমি। না, কিছুই জানি না, কোনো বাতাসে মিতুর নাম আর ভেসে আসেনি আমার কানে—তবু মন, আমার মন, আমার সর্বস্ব-লুঠ-হ'য়ে-যাওয়া তহবিল !

বেশ মজার ব্যাপার—তা-ই না ? যে-আবর্তে অনেক জীবন ডুবে গেলো, তা-ই থেকে লক্ষ্মী উঠে এলেন অমূল্যর জন্য। আর আমার ফটিক-মামা, তাকে মনে আছে তো আপনার ? যে তার স্ত্রীকে ঠেলে দিয়েছিলো অন্য পুরুষের আলিঙ্গনে, আত্মহত্যায়—সেও পুরস্কৃত হ'লো। বিলেতে আমার প্রথম বছর পোরার আগেই আমাকে একটি সুখবর দিয়েছিলেন আমার মা। ফটিকের ব্যাবসা জ'মে উঠছে এতদিনে, তার জর্মান বৌকে আর মেয়েকে সে আনিয়ে নিয়েছে কলকাতায়, ভাল আছে, বৌটির চুল কালো, চোখ কালো, সুশ্রী। হঠাৎ একটা গরম হলকা ব'য়ে গিয়েছিলো আমার বুকের মধ্যে, তারপরেই ভাবলাম : এই যে অন্তত একজন ইহুদি নাৎসিদের কবল থেকে মুক্তি পেলো, তার ভারতীয় স্বামীর সৌজন্যে ছেড়ে আসতে পারলো ভয়াবহ জর্মানি, অনেক উদ্বেগের পরে নিশ্চিন্ত হ'লো কন্যাকে নিয়ে, ধরা যাক বাকি জীবনের মতো—এই ব্যাপারে আমারও একটু অংশ আছে বইকি। কাজলের মৃত্যু না-হ'লে চক্ষুলজ্জার দায়ে হয়তো আরো কিছু দেরি করতেন ফটিক-মামা, আর ততদিনে তাঁর জর্মান বৌকে যে গ্যাসের চুল্লিতে সেঁধিয়ে দেয়া হ'তো না, তার নিশ্চয়তা কী ? বা হয়তো ফটিক-মামারই তাত জুড়িয়ে যেতো ; আগের দুই স্ত্রীকেই অদৃষ্টের হাতে সমর্পণ ক'রে তিনি আবার তৃতীয় পক্ষ ক'রে বসতেন। অন্তত এটুকু সুখের ব্যাপার হ'লো—পৃথিবীতে অবিমিশ্র অমঙ্গল ব'লে কিছু নেই।

আপনি উঠতে চান ? একটু, আর-একটু বসুন। বড্ড নিঝুম এই উটকামণ্ডের রাত্রি—শীত বাইরে, সন্ধের পরে কারোরই কিছু করার থাকে না, যে যার গর্তে ঢুকে পড়ে। শুনছেন স্তব্ধতার আওয়াজ, কানের মধ্যে,

ঝিঁঝিঁর মতো? অসহ্য লাগে আমার—আসুন আমরা কথা ব'লে-ব'লে স্তব্ধতার ঝিঁঝিঁগুলোকে ডুবিয়ে দিই। ভাবছেন আমার কথা শেষ হয়েছে? না। আমি সারারাত ধ'রে বলতে পারি, চিরকাল ধ'রে বলতে পারি। কিন্তু আপনি কিছু বলুন এবার, কিছু বলুন। আমার কাছে জবাবদিহি চাইবেন না? জিগেস করবেন না কেন আমি মিতুর কাছে ফিরে যাইনি? কেন তার দুঃখের দিনে আমি দাঁড়াইনি তার পাশে গিয়ে? কেন অমূল্যর স্ত্রী হ'তে তাকে বাধ্য করেছিলাম? দেশে ফিরে কেন অপেক্ষা করিনি তার মুক্তির জন্য, কোনো যোগাযোগ করিনি, তার শেষ কথা—'দুঃখ কোরো না, আবার দেখা হবে'—তা কি আমি ভুলে গিয়েছিলাম? আপনাকে আর বলতে হবে না, আমি সবই জানি। জানি, আমি পারতাম তাকে জীইয়ে রাখতে, জীইয়ে তুলতে—যদি বিলেত থেকে চিঠি লিখতাম নিয়মিত, ফিরে এসেই চ'লে যেতাম তার কাছে—যদি—যদি—যদি—সবই তবে অন্য রকম হ'তো, অন্য এক জীবন হ'তো আমার। কিন্তু কেন তা হয়নি তাও কি আমাকে ব'লে দিতে হবে? আপনি বোঝেন না? বাধা ছিলো: প্রকাণ্ড বাধা, অনতিক্রম্য—কাজল। কোন মুখে দাঁড়াবো আবার মিতুর কাছে—বিশ্বাসে ভরা সোনালি হৃদয়ের মিতু? নলিনী ব্রোকার আমার কেউ নয়, তাকে আমি যেমন খুশি ঠকাতে পারি—কিন্তু তাই বলে মিতুকে? অসম্ভব তাকে কাজলের কথা খুলে বলা, তা গোপন রেখে তার চোখের দিকে তাকানো তেমনি অসম্ভব। অতএব—এই তো দেখছেন আমাকে। আর তাছাড়া, ততদিনে আমি সেই আমিও আর ছিলাম না; দিনে-দিনে, চেষ্টা ক'রে, সচেতনভাবে, আমি নিজেকে অন্য এক চেহারা দিয়েছি, অন্যভাবে তৈরি ক'রে নিয়েছি। আবেগে আমার ঘেন্না, ভালোবাসায় আমার ঘেন্না; মহত্ব, বীরত্ব, আদর্শ—এই বিখ্যাত কথাগুলোে আমার ঘেন্না। আমি বুঝে নিয়েছি, ওগুলো এক-একটা রঙিন মোড়ক, য তলায় লুকিয়ে আছে বিষ, ছোরা, আগুন, সর্বনাশ। বুঝে নিয়েছি, তারাই ধ যারা শুধু নিজের জন্য বেঁচে থাকে। তারাই জ্ঞানী, যারা ভালোবাসে করুণা করে না, মাথা ঠাণ্ডা রাখে সব সময়, যে-কোনো অবস্থায়। আমি সেইভাবেই জীবন কাটাতে চেয়েছিলাম—প্রাণপণ, প্রাণপণ চেষ্টায়। তা জন্য তিলে-তিলে মেরে ফেললাম আমার স্ত্রীকে, হ'য়ে উঠলাম নারীমাংসের বনেদি খদ্দের; আমার অপ্রেমকে, প্রতিশোধকে চরমে টেনে নিয়ে গেলাম।

তবু—পারলাম কই? তবু ভোলা গেলো না, জানেন। ফিরে যাইনি, কিন্তু ফিরে যে যাইনি তা এখনো ভুলতে পারি না কেন? কাজল কেন ফিরে-ফিরে আসে? এই কি আমার শাস্তি তাহ'লে? শাস্তি কেন? আমি তো কোনো দোষ করিনি, শুধু ভালো করতে চেয়েছিলাম, ভালোবাসতে চেয়েছিলাম। সেটাই অপরাধ? না কি যথেষ্ট ভালোবাসতে পারিনি, তাই কষ্ট? বলুন, যাবার আগে কিছু ব'লে যান আমাকে। আমি দোষী? আমি দুর্ভাগা? কোনটা? আমি ঘৃণ্য? আমি প্রেমিক? কোনটা? আমি হত্যাকারী? না কি শহীদ? কোনটা? আসামির জবানবন্দি শুনলেন, এবারে একটা রায় দেবেন না?···আচ্ছা, জোর করবো না, এখনই রায় দিতে হবে না আপনাকে, আরো কিছুদিন চলুক না এই মামলা—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, আপনার আর আমার মধ্যে—জেরা, তর্ক, যুক্তির প্যাঁচ, ছিঁড়ে-খুঁড়ে উল্টে-পাল্টে নাড়িভুঁড়ি বের ক'রে আনা—তবু শেষ নেই, শেষ কথা বলার মতো কেউ নেই। আচ্ছা তাহ'লে, আর আপনাকে আটকে রাখবো না, আমার ড্রাইভার আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে। নমস্কার। কাল আবার আসবেন।